Peace

নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়

আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়

নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়

মূল

আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)

অনুবাদ

মোহাম্মদ নুরুল হুদা (দিল্লী)

নারী ও পুরুষ

ভুল করে

কোথায়

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট, কলকাতা

বাংলাদেশ সংস্করণ : আগস্ট – ২০১২ ইং

প্রকাশক

নারী প্রকাশনী

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা – ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peacerafiq@yahoo.com

মূল্য : ২১০.০০ টাকা।

ISBN-978-984-8885-25-3

অনুবাদকের কথা

নারীর যথার্থ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মানবতার পথপ্রদর্শক ও মুক্তিদূত মহামানব মুহাম্মদ ﷺ সর্বপ্রথম নারীজাতির পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা রূপদান করেন। আর ইসলামের সর্বজনীন মহান আদর্শে সবার আগে বিশ্বাস ও আস্থাভাজনের পরম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন একজন নারী। আর তিনি হলেন উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাতুল-কোবরা (রা)। এরপর থেকে ইসলামের গোটা ইতিহাসে মুসলিম নারী তার নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রে সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

ইসলামী আদর্শে উদ্বেলিত মুসলিম পরিবার ও মুসলিম সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সেখানে অমুসলিম পরিবার ও সমাজের নারীদের মতো হাজার অপমান, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা গঞ্জনা ও নিরাপত্তাহীনতার কথা ভাবারও অবকাশ থাকে । তাই আজ দেখতে পাওয়া যায় যে, সমগ্র বিশ্বে অমুসলিম নারী সমাজ যখন তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে সোচ্চার ও তা আদায়ের জন্য রাস্তায় নেমেছে তখন মুসলিম মহিলা সমাজ তাদের যথার্থ মুক্তির জন্যে ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা নারীকে ভোগবিলাসের নিষ্প্রাণ পণ্যে পরিণত করে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। নির্লজ্জ, বেহায়াপনার নামে নারীকে অসম্মান অবহেলিত করে তুলেছে পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য বলুন, বা সমাজতান্ত্রিক পাশ্চাত্য, উভয় ক্ষেত্রেই নারী-সমাজ দারুণভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত। উভয় সমাজেই নারীকে পুরুষের মনোরঞ্জন এবং পুরুষালী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয়ই নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রে বিঘ্নিত করেছে, বিশেষ অধিকার এবং স্বাতন্ত্র্য মর্যাদাকে অস্বীকার করে পদদলিত করে। আর উভয় গোষ্ঠীর প্রভাব বলয়ে নারী সমাজের সাথে একই দুর্ব্যবহারের প্রতিনিয়ত মহড়া চলছে। অন্যদিকে তথাকথিত ধর্মগুলো তো যেন নারীকে মানুষ হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

কোনো কোনো ধর্ম নারীকে 'সকল পাপের উৎস' বলে ঘোষণা করেছে। কোনো কোনো ধর্ম নারীর আত্মা আছে বলে স্বীকার করে না, আবার এমন ধর্মও আছে যা নারীকে মানুষ বলে বিবেচনা করতেও চায় না। খ্রিস্টানদের বাইবেল, ইহুদিদের তৌরাত, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক, পারসিকদের জিন্দাবেস্তা, শিখদের গ্রন্থ সাহেব আর

হিন্দুদের বেদ-ঋগবেদ বা গীতার কোথাও নারীদের অধিকার ও মর্যাদাসংক্রান্ত কোন আইনবিধির অস্তিত্ব নেই, এমনকি নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকাটুকুও নেই। এর পরিবর্তে নারী-নির্যাতন ও নারীর অবমাননা এবং নারী লাঞ্ছনার অনেক লোমহর্ষক কাহিনী, কিংবা যৌন ব্যভিচারের অশ্লীল আলোচনাই পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়।

সমাজে নারী নির্যাতনের অপরাধ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এভাবে আধুনিক পুঁজিবাদ, সমাজবাদ বলুন বা তথাকথিত ধর্মগুলোর কথা বলুন– কোথাও নারীকে তার স্বাভাবিক অধিকার ও আত্ম মর্যাদা দেয়া হয়নি। সর্বত্র সব সময় নারীকে ভোগের সামগ্রী এবং পুরুষের সেবাদাসী হিসেবেই বিবেচনা করে তাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে।

নারী সমাজের সাথে প্রাচীন ও আধুনিক শোষক গোষ্ঠীর নিষ্ঠুর নির্মম দুর্ব্যবহার ইসলামের দৃষ্টিতে এক জঘন্য এবং অমার্জনীয় অপরাধ। ইসলাম নারী ও পুরুষকে মানব অস্তিত্বের দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি পা আর দুটি হাতের মতোই সমগুরুত্বের অধিকারী বলে অভিহিত করেছে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা, সমগুরুত্ব ও সম-অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান দিয়েছে। শারীরিক ও মানসিক গুণবৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জন্য ইসলাম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে যাতে কেউ কারো ওপর অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার বা শোষণের ষ্টিম রোলার প্রয়োগ করতে না পারে।

জীবনের অন্যান্য বিষয়-বিভাগ ও ক্ষেত্রের মতো এ সম্পর্কেও ইসলাম শুধু নীতি নির্ধারণই করেনি, বরং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-সমাজের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তার সকল কার্যকারিতাও প্রমাণ করেছে।

পবিত্র কুরআনে নারীদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, আইনবিধি ও গুরুত্বপূর্ণ আদেশ উচ্চারিত হয়েছে। কুরআন শরীফের পূর্ণ একটি সূরার নামই হচ্ছে 'নিসা' অর্থাৎ "নারীগণ"। এছাড়া কুরআনের অন্যান্য সূরাতেও নারীসংক্রান্ত অসংখ্য আইন-কানুন বর্ণিত হয়েছে। এসব কুরআনী আইন ও আদেশে নারীদের যাবতীয় স্বাভাবিক অধিকার ও চাহিদার আলোকে সব রকমের সমস্যাবলির সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ সমাধান উপস্থাপন করা হয়েছে। নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত কোনো বিষয়ই কুরআনের আলোচনা ও বিধিবিধান থেকে বিন্দু পরিমাণ বাদ পড়েনি। নারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয়েছে।

ইসলাম ও বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের এক একটি আইন-বিধিকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেন। মহিলাদের ন্যায্য অধিকার এবং প্রকৃত মর্যাদা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তিনি নিজেই তার বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। নবী করীম ﷺ ব্যক্তিগতভাবেও মহিলাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীলের পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন। মহিলাদের জান-মাল ও মর্যাদার নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি যে কত বেশি সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন তাঁর বাণী ও ভূমিকাতে অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত তাঁর অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি নারীদের জন্যেও স্থায়ী মুক্তি সনদ ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের অন্যায় কর্তৃত্ব, নির্যাতন ও শোষণের হাত থেকে নারী জাতিকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দান করেন।

তিনি নারীদের সাথে কৃত সব রকমের বিভেদ-বৈষম্যেরও স্থায়ী অবসান ঘটান। নারীরাও যে আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং পুরুষের মতোই স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীণী, একথা বিশ্বের মানুষ প্রথমবার প্রিয় নবীর কাছেই শুনতে পেয়েছে। নারীদের সার্বিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও তাঁদের ভালোবাসার পুরুষের সমান অধিকার তুলে ধরেছেন। তিনি স্বামী, পিতা ও সন্তানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই মাতৃত্বের মর্যাদায় ভূষিত করে ঘোষণা করলেন যে, "মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।" তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যে শিক্ষা অর্জনকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেন এবং নিজ কর্মক্ষেত্রে নারীদের আয়-উপার্জনের অধিকারও দান করেন।

এভাবে জীবনের সর্বাধিক দিক ও বিভাগে নারী ও পুরুষেরা অধিকার, মর্যাদা এবং দায়িত্বের স্পষ্ট পন্থা নির্দেশ করে ইসলাম একটি সুখী-সুন্দর ও শান্তি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে। জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোথাও কারো গুরুত্বকে অবহেলা ও হেয় করা হয়নি, বরং পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহাবস্থানের আস্থার বন্ধনকে করা হয়েছে দৃঢ় মজবুত, স্থিতিশীল ও শৃঙ্খলাপূর্ণ। একবিংশ শতাব্দীর এ জড়বাদী যুগে, যেখানে জীবনের সর্বত্র অশান্তি, অসন্তোষ, বৈষম্য, ভেদাভেদ আর বিশৃঙ্খলার জয়জয়কার– সেখানে সামগ্রিকভাবে ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন করে সঠিক সমস্যাবলির সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান করা যেতে পারে।

বিশেষ দূরীভূত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আলোকে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিভেদ-বৈষম্য দূর করে দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, জাতীয় জীবন এবং তার আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বত্র সম-মর্যাদা, সম অধিকার ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে। সকল প্রকার কলহ বিভেদ, হানাহানী, রেষারেষি, দ্বন্দ্ব, বৈষম্যের প্রতি কুঠারাঘাত করে সুন্দর জীবন বিনির্মাণ করা যায়।

এ উদ্দেশ্যে নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রসার এবং ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে নারীদের সংঘবদ্ধ হওয়া একান্তই অপরিহার্য। এ ব্যাপারে সচেতন ভাই-বোনেরা নিজ নিজ স্থানে থেকে ভূমিকা পালন করবেন– এটাই সবার প্রত্যাশা।

বর্তমান গ্রন্থটিতে প্রখ্যাত মিশরীয় চিন্তাবিদ জনাব আল-বাহি আল-খাওলি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা এবং নারী সংক্রান্ত ইসলামের যাবতীয় আইন-বিধি ব্যাখ্যাসহ সহজ-সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

গ্রন্থটি নারী-সমস্যা সংক্রান্ত ইসলামী নীতি সম্পর্কে যাবতীয় ভুল ভ্রান্তি ধারণা ও বিভ্রান্তির অপনোদন এবং নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা প্রচারে বিরাট অবদান রাখবে বলেই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

নূরুল হুদা
দিল্লী

ভূমিকা

"অগণিত প্রশংসা সেই রাব্বুল আলামীনের যার দয়ার দৃষ্টিতে যাবতীয় মহৎকাজ সুসম্পন্ন হয় এবং অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি– যিনি হেদায়াত ও কল্যাণময় পথের পথ-প্রদর্শক হিসেবে মুক্তির আলো নিয়ে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবাবৃন্দ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ তাঁকে অনুসরণ অনুকরণ করবে– তাঁদের প্রত্যেকের ওপর বর্ষিত হোক রহমত-বরকত, শান্তির অফুরন্ত অমীয় ধারা।"

উনিশ বছর আগে ১৯৫১ সালে আমি আমার "আল মারয়াতু বাইনাল বাইতে ওয়াল মুজতামা" গ্রন্থটি সম্পাদনা করি। তাতে আমি বিক্ষিপ্ত সমস্যাবলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরি। তার ভূমিকায় আমি আমার চিন্তা-চেতনার দৃষ্টিকোণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলাম। আজ আমি পাঠক-পাঠিকাদের সামনে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী উপস্থাপন করছি। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু রচনার উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের গ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্বের গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদান এবং কিছু সংখ্যক যুবকের সমস্যা ও সংকটের নিরসন করা। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থ রচনার যে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা শিরোনামেই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে– নারীর সমস্যা সংক্রান্ত মৌলিক সমস্যা ও প্রশ্নের ইসলামী সমাধান পেশ করা।

সাধারণভাবে আমাদের মাঝে অনেকে মনে করেন যে, এর জন্যে এখনো পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হয়নি এবং এটা অনুকূল নয়, কারণ আধুনিক যুগের নারী এখন সবরকমের সেকেলে ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্তি নিয়ে পাশ্চাত্য জীবনদর্শনকে অনুসরণ করে তারা নিজেদের অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ছুটছে। ওখানে তারা সব রকমের ধরাবাধা বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত; কিন্তু এখানে তার সম্পর্ক অতীতের সাথে সম্পৃক্ত যা তাদের নৈরাশ্য ও স্থবিরতার দিকে প্রতিনিয়ত ঠেলে দেয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সমস্যার সমাধানের জন্যে এ ধরনের চিকিৎসা অর্থহীন, বরং মূল কথা হলো, আমরা যখন নারী-স্বাধীনতা ও তার ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করি তখন সেই

চিন্তাধারাকে সর্বপ্রথম আমরা নিজেরাই নিজেদের মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করি।

আর কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ঐ কথা স্বীকার করবেন যে, এ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সব রকমের দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ এবং পূর্ব বৈষম্যমূলক চিন্তাধারা পর্যালোচনার পরিবর্তন অতি জরুরি এবং শুধু বুদ্ধিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করি যে, প্রকৃতির কোন সেই আইনাবলী ও উদ্দেশ্য রয়েছে যার ভিত্তিতে নারীকে জীবন সংগ্রামে সীমিত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ যে নারীকে শুধু সৌন্দর্য ও ভোগের সামগ্রী হিসেবেই সৃষ্টি করেননি তা বলাই বাহুল্য, বরং এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেই সামনে রেখে তাকে সৃষ্টি করেছেন।

এখন যদি আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারীরা সেই সত্য ও বাস্তবতাকে না মানেন এবং অস্বীকার করেন তাহলে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করার জন্য আমাদের নিকট একটিমাত্র পথই খোলা রয়েছে, আর তা হলো, আমরা নারীত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী সমস্যার আলোকপাত করব– নারীকে পুরুষ ভেবে নয়। বস্তুত, এটাই হচ্ছে এ ব্যাপারে আলোচনার স্বাভাবিক ও উত্তম পন্থা, এছাড়া অন্য কোন পন্থাই প্রভাবশালী বা বাস্তবানুগ হতে পারে না। তাই অন্য সব মত এবং পথই ভ্রান্ত, বাতিল, বুদ্ধি-বিরুদ্ধ, বাস্তবতাবিমুখ ও যুক্তিহীন হতে বাধ্য।

বর্তমান গ্রন্থে আমরা সেই স্বাভাবিক পন্থারই অনুসরণ অনুকরণ করছি। কারণ প্রকৃতির পন্থা-নির্দেশনা এবং স্বভাবের অভিমত সবদিক থেকেই গ্রহণযোগ্য হয় এবং সরাসরি আসল সত্য পর্যন্ত উপনীত করে। সত্যানুসন্ধানীর জন্যে এছাড়া আর কোনো বিকল্প পথই অনুসরণযোগ্য হতে পারে না।

–আল বাহি আল-খাওলি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

"হে মহানজাতি! আপন প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই প্রাণ থেকেই তার জোড়া তৈরি করেছেন এবং দু'জন থেকেই অনেক অনেক পুরুষ ও নারী দুনিয়াতে বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন।

সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজের অধিকার দাবি কর। আর আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাক।

নিশ্চিত জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধান করছেন।"

(সূরা নিসা : আয়াত-১)

প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারী

আমরা যখন প্রাচীন মানব ইতিহাস এবং তার সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করি তখন এমন কয়েকটি তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করি, যাতে তাদের সরলতার সাথে সাথে অজ্ঞতা, মূর্খতা, দুঃখ-দুর্দশা, ভীতি, দাম্ভিকতা এবং অন্যের সামনে নিজেকে বড়ত্ব প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা যায়। আর যখন হিংস্র বন্য জন্তুদের সাথে লড়াইয়ের যুগ শেষ হয় তখন আমাদের সামনে মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়, যাতে রক্তক্ষয়ী, যুদ্ধবিগ্রহ, দস্যুবৃত্তি, চুরি, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, অন্যের সম্পত্তিতে জবরদখল বিস্তার, ক্রীতদাস প্রথা এবং শিশু ও নারী নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনাবলির বিশদ বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। আর এসব দুষ্কর্ম শুধু এ জন্যেই সংঘটিত হতো যেন অন্য মানুষেরা তার অধীনস্ত হয়ে তার ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার, গৃহপালিত পশু এবং অন্যান্য বিষয়-আশয়ের রক্ষণা-বেক্ষণ করে।

আমরা এ সম্পর্কে গভীর আলোচনায় না গিয়ে এবং আরো তিক্ত তথ্যাবলির উল্লেখ না করে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, প্রাচীন যুগের মানুষ কি এজন্যে নিন্দার উপযুক্ত? তারা তো তখন সভ্যযুগের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করেছিল মাত্র। আর সে যুগের অবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ পরস্পরকে অধীনস্ত দাস-দাসী বানিয়ে রাখার প্রয়োজন কি অধিক অপরিহার্য ছিল?

এ ছাড়া এটাও বিবেচ্য বিষয় যে, প্রাচীন কালের মানুষ নিজের কোনো সন্তানের ওপর আনন্দিত হবে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছেলের বা সেই মেয়ের, যে নিজের নিরাপত্তা তো দূরের কথা বরং যোদ্ধাদের জন্যে এক আলাদা বোঝা বলেই প্রমাণিত হয়? আর যাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যেই যতসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

মূলকথা, প্রাচীনতম যুগে নারীর মর্যাদা খর্ব করার পেছনে দুটি বিরাট কারণ বিদ্যমান ছিল।

প্রথম কারণ এই যে, নারীদের কর্মক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবেই সীমিত ও নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল। আর দ্বিতীয় কারণ ছিল– যে যুগের দাবি অনুযায়ী কাজ শুরু এটাই ছিল যে পুরুষদের মনে নানা প্রকার কামনা-বাসনার উদয় হওয়া এবং যুদ্ধের জন্যে তাদের উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করা। বিজয় লাভ করলে তাদের প্রশংসা করা এবং বিজয় ও সাফল্যের আবেগময় স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখা।

প্রাচীনতম সমাজে নারীদের মান ও মর্যাদা নির্ধারণে এ দুটি কারণ ছিল অন্যতম। পরবর্তীতে যুগের বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির সাথে সাথে সরকারি ও প্রশাসনিক আইনবিধি এবং যুদ্ধ ও সন্ধির জন্য কিছু কিছু নীতিমালা নির্ধারিত হতে থাকে। এসব আইনবিধি ও নীতিমালার প্রণয়ন ছিল সেই বর্বর যুগের প্রত্যক্ষ চাহিদা অনুযায়ী। এভাবে নারী সামাজিক এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়, এছাড়া যাবতীয় উন্নতি অর্থহীন থেকে যায়। ক্রমবিকাশের এ পর্যায়ে নারীর যে সামাজিক অবস্থান ছিল তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা সামনে অগ্রসর হচ্ছি।

প্রাচীন সমাজে নারীর অবস্থান

চীন : চীনে নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। চীনারা তাদের নারীদের অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত। উচ্চপর্যায়ের এক চীনা মহিলা নিজ সমাজে নারীর অবস্থান নির্ধারণ প্রসঙ্গে লেখেন-

"আমাদের নারীদের স্থান হচ্ছে মানবতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান এবং এজন্যেই আমাদের অংশে এসেছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্ম।"

তারই এক নীতিকথা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে–

"নারী কতো হতভাগিনী! পৃথিবীতে তার মতো মূল্যহীন দ্রব্য আর কিছু নেই। ছেলেরা দোরমুখো এমনভাবে দাঁড়ায় যেন তারা আকাশ থেকে আগত কোনো দেবতা কিন্তু মেয়েদের জন্মমুহূর্তেও আনন্দের কখনো সানাই বেজে উঠে না। যখন তারা বড় হয়ে উঠে তখন আবদ্ধ করে বন্দী করে রাখা হয়। তখন তার জন্যে দুফোঁটা অশ্রু ফেলার মতো কেউ থাকে না।" (কিস্‌সাতুল হামারার চীন সভ্যতা শীর্ষক অধ্যায় থেকে গৃহীত। পৃষ্ঠা ২৮৩, লেখক– V. V. KAMT অনুবাদ– Mohammad Badran.

ভারত : প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মনু স্মৃতির অধ্যায়নে জানা যায় যে, মনু যখন নারী সৃষ্টি করেছিল তখন সে নারীকে পুরুষের প্রতি প্রেম, রূপচর্চা, যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা এবং ক্রোধের প্রবণতা দানকারিণীরূপে সৃষ্টি করে এবং মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে নারীকে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করে। কাজেই হিন্দু সমাজে এ ধারণা খ্যাতি অর্জন করে যে, নারী হচ্ছে নোংরামীর জড় এবং তার অস্তিত্ব হচ্ছে আগাগোড়া নরক। (বিশ্ব ইতিহাস–৩৯৪, বলাবাহুল্য হিন্দু সমাজে আজও নারীকে সকল পাপের উৎস মনে করা হয় এবং হিন্দু ধর্মমতে নারীর কোনো অধিকার বা মর্যাদা নেই।)

মনু শাস্ত্রে এও বলা হয়েছে যে–

"অনুগত স্ত্রী হলো সে, যে তার স্বামীর সেবা এভাবে করে যেন সে তার প্রভু। তার ব্যাপারে এমন কোনো কথা না বলে যা তার জন্য দুঃখজনক হয়, তা তার স্বামী যত বড়ই লম্পট আর বদমাশই হোক না কেন। কেননা, কেবল সে জন্যেই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যখন সে তার স্বামীকে আহ্বান করবে তখন অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে 'হে আমার উপাস্য' বলে আহ্বান করবে। কিছু দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু চলতে এবং স্বামী তার সাথে বেশি থেকে বেশি একটি মাত্র কথা বলবে। নারী স্বামীর সাথে খাবার গ্রহণ করবে না, বরং স্বামীর উচ্ছিষ্ট খাবার সে খাবে।' (হামরাতুল হিন্দ, পৃষ্ঠা-১৭৯)

গ্রিস : প্রাচীন গ্রিক সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে নারীর কোনো ভূমিকা ছিল না এবং নারী ছিল সম্পূর্ণরূপে সমাজ থেকে অবহেলিত ও বিচ্ছিন্ন। নারীকে একান্ত অর্থহীন দ্রব্যের মতো ঘরের অন্ধকার কুঠরে বন্দী করে রাখা হতো। এমনকি বিখ্যাত গ্রিস দার্শনিক ও চিন্তাবিদরাও মনে করতেন যে, নারীর অস্তিত্বের মতো নারী নামটাকেও যেন বদ্ধঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। (গ্রিক ইতিহাস ১১৪-১১৭ পৃষ্ঠা)

তারা নারীকে নিছক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করত। এছাড়া নারীর অন্য কোনো কাজ থেকেই থাকে তাহলে তা এই যে, সে স্বামী এবং অন্যান্য পুরুষদের সেবা যত্ন করবে। 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা' এ কথাটি ছিল গ্রিকদের জন্যে অতি দুর্বোধ্যও নিরর্থক কথা। তবে প্রেম ভালোবাসার জন্যে তাদের ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। এ সম্পর্কে চমৎকার উপস্থাপন করেছেন প্রখ্যাত গ্রিক চিন্তাবিদ ডেমোস্তিন।

তিনি বলেন–

"আমরা যৌনতৃপ্তি অর্জনের জন্যে বেশ্যালয়ে গমন করি এবং আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচি তৈরি করে থাকে বালিকা বন্ধুরাই। আর আমরা কেবল আইনগতভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্যেই স্ত্রী গ্রহণ করি।"

এজন্যে বিয়ের পর মেয়েরা পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে আসে। কিন্তু তা এজন্যে নয় যে, সে স্বামীর ঘরের কর্ত্রী হবে। তা নয় বরং স্বামীর ঘরে তাকে আসতে হয় শুধু সে সেবিকার দায়িত্ব পালন এবং সন্তান উৎপাদন ও তার লালন পালনের জন্যেই।

রোম : রোমান সভ্যতাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতির গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়ে থাকে। সেখানে পরিবারের প্রাচীন পুরুষই ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরু; সব সম্পদ, ক্ষমতা এবং অধিকারের একচ্ছত্র মালিক হতো সেই। সব ধরনের বেচা-কেনা, মামলা, চুক্তি, ইত্যাদি তারই ইখতিয়ারাধীন ছিল।

রোমান সমাজেও নারীর কোনো গুরুত্ব, অধিকার বা মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না। নারীরা ছিল সমাজে অবহেলিতা কোনো রকমের আইনগত অধিকার থেকেও নারী ছিল বঞ্চিত। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু আর পাগলের মতো নারীকেও মনে করা হতো অযোগ্য ও অক্ষম। নারী হয়ে জন্ম নেয়াই ছিল তার অযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এমনকি যা বাবার পক্ষ থেকে বিয়ের যৌতুক বা পিতার হিসেবে পাওয়া সম্পত্তিতেও নারীর কোনো অধিকার ছিল না। স্বামীর ঘর করার সাথে সাথে স্ত্রীর সব ব্যক্তিগত সম্পদও স্বামীর মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হতো। রোমান নারী আদালতে বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল, এমনকি তার সাক্ষী দেয়ার কোনো অধিকার ছিল না।

রোমান সমাজে অন্য এক ধরনের বিয়ে শাদীরও প্রচলন ছিল। এ বিয়েকে "সর্বদা বিয়ে" বলা হতো। এর মাধ্যমে যে কোনো নারী সর্দারের স্ত্রী বলে গণ্য হতো এবং একবার কেউ সর্দারী বিয়ের কবলে পড়লে তাকে তার সাবেক পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হতো এবং কখনো তার ওপর কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা হলে তাকে সর্দারের সামনে পেশ করা হতো যেন নিজ হাতে তার শাস্তি দিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো সর্দার অভিযুক্ত নারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার অধিকারও রাখত, যেমন বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে।

এছাড়া কোনো মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করলে, তার বিধবা স্ত্রী ছেলেদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো। যদি পুত্র সন্তান না থাকত তাহলে বিধবাটি স্বামীর ছোটভাই বা চাচার অধিকারে চলে যেত।

আরব : আরবে তো অধিকাংশ লোক তাদের ঘরে মেয়ে জন্ম হওয়া ঘৃণার চোখে দেখতো দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত। এমন এক সমাজে যেখানে যুদ্ধবিগ্রহই তাদের নিত্যদিনের প্রধান কর্ম, সেখানে মেয়েদের ব্যাপারে তাদের এ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক। কারণ, যুদ্ধ-বিগ্রহের ধকল সইবার শক্তি সামর্থ্য পুরুষেরই থাকতে পারে এবং পুরুষের বীরত্বের মাধ্যমেই গোত্রীয় মানমর্যাদা ছিল নির্ভরশীল। কিন্তু তো নারীরা এ ধরনের কোনো কাজেই লাগত না, বরং তারা ছিল শত্রুর লালসার লভ্য বস্তু। শত্রুরা তাদের মেয়েদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করে তাদের সেবা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারও করত। এভাবে মেয়েরা ছিল গোত্রের জন্য এক কলঙ্কজনক ও স্থায়ী বোঝাস্বরূপ। কারণ সব সময়ে মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়টি তাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। কেননা, তাদের মেয়ে শত্রুর অধিকারে যাওয়াটা ছিল গোত্রের জন্যে চরম অবমাননাকর। এতে করে তাদের মাথা নীচু হয়ে যেত।

কোনো কোনো গোত্রে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, যদি কারো ঘরে মেয়ের জন্ম হতো তখন সে তীব্র মর্ম বেদনা অনুভব করে এটা ভাবতে লাগত যে এমন দুঃখজনক ও লজ্জাকর অবস্থার পরও মেয়েটিকে বাঁচতে দেবে, নাকি অপমানের এ প্রতীকটিকে হত্যা কিংবা জীবন্ত সমাধীস্থ করবে! অনেক লোক এ শেষ সিদ্ধান্তটিকেই কার্যকারী করত, অর্থাৎ মেয়ে সন্তানটিকে জীবন্ত কবর দিত।

এ নিষ্ঠুরতার প্রতি ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–
"যখন তাদের মধ্যে কাউকে মেয়ে সন্তান হওয়ার সুখবর দেয়া হতো তখন তার মুখে কালিমার রেখা ছেয়ে ফেলতো এবং সে যেন তিক্ত ঢোক গিলে নিত, লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াত যে এ দুঃসংবাদের পর কিভাবে কাউকে মুখ দেখাবে। ভাবতে থাকে যে, অপমানের সাথে মেয়েটিকে নাকি মাটিতে পুঁতে দেবে? দেখ; এমন খারাপ কথা, যা এরা (খোদার ওপর) আরোপ করে।"
(আন-নাহল : আয়াত-৫৮-৫৯)

আরবে এ প্রথাও ছিল যে যখন কোনো স্ত্রীর স্বামী মৃত্যুবরণ করত তখন তার বড় ছেলে দাঁড়িয়ে যেত এবং তার পিতার স্ত্রীকে যদি নিজের জন্যে প্রয়োজন মনে করত তাহলে তার ওপর নিজের জামা নিক্ষেপ করত এবং এভাবে সে বিধবা তার একান্ত মালিকানায় এসে যেত।

ইহুদীবাদ : ইহুদীরা যদিও এক আসমানী দ্বীনেরই অনুসারী ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যেও একদল বোনকে তার ভাইয়ের সমান অধিকার ও মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। ইহুদী সমাজে নারীর মান মর্যাদা ছিল অপমানকর লজ্জাজনক। তারাই শুধু সেবিকার জন্য। ইহুদী নারীদের, তাদের ভাইদের মতো সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অংশ দেয়া হতো না এবং ইহুদী পিতা তার প্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকারও রাখত।

খ্রিস্টান পণ্ডিত : খ্রিস্টান পণ্ডিতরা তো দু'দুবার নারীদের মান খর্বকরণের সিদ্ধান্ত কার্যকারী করে। অথচ খ্রিস্টান পণ্ডিতরাই নিজেদেরকে দয়া ও স্নেহের অগ্রদূত বলে দাবি করত। এরাই নারীদের ব্যাপারে তাদের 'পবিত্র গ্রন্থ' থেকে এ বক্তব্যের উল্লেখসহ প্রচার করে যে–

"নারীকে লজ্জায় মরে যাবার জন্যে এতটুকু কথাই যথেষ্ট যে সে নারী। এছাড়া মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর মতো অবমাননার কারণও এ নারী।"

নারীদের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের ধারণা ঠিক হিন্দুদের মনুর মতো ছিল যে, "নারী হচ্ছে নরকের দরজা এবং পাপের প্রতিমা।" কোনো কোনো খ্রিস্টান পণ্ডিত তো আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে অভিহিত করেছেন, "নারী হচ্ছে শয়তানের সন্তান।"

তারা আরো বলেছে–
"নারীদের ওপর লা'নত করা অপরিহার্য, কেননা বিপথগামিতার একমাত্র কারণ এরাই।"
খ্রিস্টান পণ্ডিতদের আর এক দলের ধারণা হচ্ছে–
"নারী হচ্ছে শয়তানেরই বহিঃপ্রকাশ। শয়তান নারীর বেশ ধরে দৃশ্যমান হয়।"
নারীদের প্রতি এর চেয়েও জঘন্য মানসিকতা ছিল খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পাদ্রীদের। এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক যে, "নারী কি পুরুষের মতো সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করতে সক্ষম?" "নারী কি স্বর্গে যেতে পারবে? নারীর মধ্যে কি মানবিক আত্মা রয়েছে? নাকি তারা ভৌতিক জীবনযাপন করে?"

বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম ও সমাজে এ-ই ছিল নারীর সঠিক অবস্থান। কোথাও মানবিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না সর্বদাই ছিল অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত।

অতীত-ভ্রান্তির সারসংক্ষেপ এবং ইসলামের অভিমত

উপরের কয়েকটি ঘটনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক। ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি আমাদের সামনে অতীতে সভ্য ও অর্ধসভ্য সমাজসমূহে নারী-জাতির নির্মম দূরাবস্থার করুণ চিত্র তুলে ধরেছে। এ থেকে আমরা প্রাচীন যুগের নারীদের সামাজিক মান-মর্যাদার সঠিক অবস্থা অনুধাবন করতে পারি। আমাদের দৃষ্টিতে অতীতের উল্লেখযোগ্য ভ্রান্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ–

* পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর কোনো মানবিক মান-মর্যাদা ছিল না। নারীর অধিকার আদায়ের কোনো চেষ্টা-সাধনা অথবা পৃথক কোনো কর্মক্ষেত্রও ছিল না। সামাজিক উন্নয়নে অংশ নেয়ার জন্যে তার কোনো আলাদা ভূমিকা পালনের অবকাশও ছিল না। যেমন উপরে বলা হয়েছে, পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর অবস্থান এতোটা নিকৃষ্ট ছিল যে, তারা নারীর মানবিকতা এবং তার মধ্যে আত্মা আছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নকে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তুতে পরিগণিত হতো। অতীতের পণ্ডিতরা নারীকে আত্মাহীন এক অপবিত্র নোংরা অস্তিত্ব বলে ধারণা করত।

* অধিকাংশ পুরুষই মনে করত যে নারীর উপাসনা করা বা সমাজে মর্যাদার সাথে জীবন যাপনের কোনো অধিকারই নেই। যেমন হিন্দুদের মনুস্মৃতি অধ্যয়নে জানা যায়, মনু নারীকে মানবিক মর্যাদা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত বলে মনে করত। অধিকাংশ পুরুষ তারই মতো ধারণা পোষণ করত, মনু এবং তার অনুসারীরা নারীকে উপাসনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

* পরিবারে মেয়ে ও ছেলের মধ্যে সমতা বলতে কিছুই ছিল না। চীনা ও আরবি ইতিহাস একথার সাক্ষ্য বহন করে। হিন্দু পুরুষেরা তো তাদের স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর চেয়েও নিকৃষ্টতর মনে করত।

* প্রাচীন অতীতে নারীর কোনো আইনগত মান বা মর্যাদাও ছিল না। এবং তাদের কোনো প্রকার অর্থনৈতিক অধিকারও ছিল না। নারীর কোনো জিনিসের ওপর মালিকানা বা উত্তরাধিকারের কোনো প্রাপ্ত অংশ ছিল না। এসব থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। নারীদের কেনা-বেচা বা ব্যবসা-বাণিজ্যেও অংশ নেয়া নিষিদ্ধ ছিল। মোটকথা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই নারীর ওপর শোষণ নির্যাতন চলছিল এবং পুরুষ তার স্বেচ্ছাকারী মনিব হয়ে থাকে। রোমান ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, নারীর নারীত্বই ছিল তার সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং এ নারীত্বই তার অযোগ্যতা প্রমাণের জন্যে ছিল যথেষ্ট।

অতীতের এসব ভ্রান্তিকে এক সংক্ষেপে বলতে গেলে এটাই বলতে হয়, যেহেতু তারা নারীকে মানুষ বলেই স্বীকার করত না এজন্যে তারা মানবিক মর্যাদা থেকে নারীকে অবহেলিত ও বঞ্চিত করে। আর এর মূল কারণ ছিল যে, যেহেতু নারী স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বল, এজন্যে জীবন সংগ্রামের ময়দানে সমস্যাবলির মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। উপরিউক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অতীতের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর নারীত্বই ছিল নারীর উন্নতি অগ্রগতির সামনে সবচেয়ে বড় বাঁধার পাহাড়। নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষেরা সবসময়ই নারীর অধিকার ও মান-মর্যাদাকে করেছে ক্ষুণ্ন তাদের জীবন নিয়ে খেলেছে ছিনিমিনি খেলা।

ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথেই সেই অভিশপ্ত অতীতের সকল শোষণ ও জুলুমের সার্বিক অবসান ঘটে। বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর সকল প্রচেষ্টায় নারী জাতি তাদের সম্মানে ভূষিত হয়। ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে নারী জাতিকে সার্বিক উন্নতি-প্রগতির আসল বুনিয়াদ বলে ঘোষণা করে এবং নারীর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অধিকার এবং সম্মান পুনর্বহাল করে।

ইসলাম ঘোষণা করে যে রক্তে মাংস গড়া, নারী পুরুষের মতোই একটি মানুষ। বরং নারীকে তার নারীত্বের কারণে পুরুষের থেকেও বেশি মর্যাদার অধিকারী বলে ঘোষণা করে। ইসলাম নারীর স্বভাব-প্রকৃতির আলোকে তার আসল মান নির্ধারণ করে দেয় এবং তার দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেয়। ইসলাম

নারীকে সর্বপ্রকার অন্যায় জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন, সক্ষম, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও পরিপূর্ণ মানুষ বলে ঘোষণা করে। সর্বাধিক সম্মানের আসনে সমাসীন করেন।

নারীজাতির যুক্তি-অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের ওপর আলোকপাত করে, আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। এ সম্পর্কে আমাদের পরবর্তী আলোচনা শীর্ষক হবে "সম অধিকার"। সামনের অধ্যায়ে আমরা নারীর মানবিক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা, তার মালিকানা-অধিকার, তার অর্থনৈতিক স্বাধিকার, সমাজ সংস্কারে নারীর দায়িত্ব ও ভূমিকা এবং নারী হিসেবে তার সাধারণ ব্যবহার ও শিষ্টাচার এ সম্পর্কে আলোকপাত করব।

তার পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা নারীর "বিশেষ অধিকার" শীর্ষক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এতে বিয়ে, তালাক, মাতৃত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার এবং সংক্ষেপে এও আলোচনা করা হবে যে, তার অধিকার ও দায়িত্ব কী? আর এ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও উপদেশ কী?

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম অধিকার

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারী এরা সবাই একে অন্যের বন্ধু, (তারা) সততার আদেশ দেয় এবং মন্দের প্রতিরোধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করে। এরা সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হবেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার ওপরে বিজয়ী ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা তওবা : আয়াত-৭১)

ইসলামে নারীর মানবাধিকার

আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, অতীতের অনেক সভ্য সমাজেও তা ধর্মভিত্তিক হোক বা ধর্মহীন নির্বিশেষে– নারীকে মানুষ বলে স্বীকার করা হবে কি না তা তর্ক-বির্তকের বিষয় ছিল। তারা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করত, নারীও কি পুরুষের মতো উপাসনা করতে সক্ষম? নারীও কি পুরুষের মতো পরকালীন জীবনে প্রবেশ করবে? একটি বিষয়ে তাদের মতৈক্য ছিল যে, নারী হচ্ছে এক অপবিত্র জীব। একে শুধু পুরুষের সেবা ও মনোরঞ্জনের জন্যই এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ এরকম আরও বহু অর্থহীন ও নোংরা ধারণার শিকারে পরিণত ছিল প্রাচীন যুগের পুরুষ সম্প্রদায়। এমন অমানবিক চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ যখন চরম সীমায় উপনীত হয় তখনই নারী তথা সমগ্র নির্যাতিত মানবতার চিরমুক্তির পয়গাম নিয়ে পৃথিবীর বুকে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে।

ইসলাম প্রথমেই নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। তার দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে, তার পূর্ণ মানবিক অধিকার বহাল করে এবং নারীর এত বেশি মর্যাদা দেয়া হয় যে, সাহাবারা পর্যন্ত অবাক হয়ে যান। নারী জাতিকে হাজার হাজার বছরের শোষণ-নির্যাতন, অবিচার-বঞ্চনা ও অত্যাচার-অধীনতার নির্মম নাগপাশ থেকে পূর্ণ মুক্তি দেয়ার জন্যে ইসলামের এসব ঘোষণা ও ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য ছিল।

ইসলাম নারীর পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধিকার দিয়ে তাকে পুরুষের সমান অধিকার ও ক্ষমতা অর্পণ করে। এভাবে নারীকে শতাব্দীর নিষ্ঠুর শোষণের অক্টোপাশ থেকে স্বাধীন করে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলে। এর চেয়েও বড় কথা, ইসলাম নারীকে সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশীদার গণ্য করে তার ওপর সমাজ সংস্কারের দায়িত্বও ন্যস্ত করে। তার কর্মক্ষেত্র ও তার ভূমিকা পালনে সীমা নির্ধারণও করে দেয় ইসলাম। নারী সমাজ যাতে তাদের উন্নত মর্যাদায় নির্দেশ যথার্থ পথে অগ্রগতি অর্জন করতে পারে এবং নিজেদের হীনমন্যতা, পুরনো বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারে সে জন্যে ইসলাম সঠিক ও বাস্তবানুগ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে।

এভাবে ইসলাম নারীকে সকল দিক ও বিভাগে পুরুষের সমমানে উন্নীত করে। কোনো ক্ষেত্রেই তাকে পুরুষের অধীনে বা পেছনে ফেলে রাখা হয়নি। বলাবাহুল্য, নারীর অধিকার ও মর্যাদা পুনর্বহালের সাথে সাথে তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যও

পুরুষের সমপর্যায় করে দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এ আয়াত থেকেই নারী-পুরুষের সমতার বিধান স্পষ্ট হয়ে যায় :

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারী, –এরা সবাই একে অন্যের বন্ধু, (তারা) সততার আদেশ দেয় এবং মন্দের প্রতিরোধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।" (সূরা তওবা : আয়াত-৭১)

ইসলাম এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পুরুষের সাথে সাথে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়কে এমনভাবে সমন্বিত করে দেয়া হয়েছে যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে উভয় হচ্ছে একই সত্যের দুটি রূপ ও নামমাত্র। আর এ উভয় সত্ত্বাকে পরস্পর মিলিয়ে রাখার জন্যে দুটি শক্ত ও স্থায়ী বুনিয়াদও সরবরাহ করেছে।

১. ঔরসজাত সম্পর্কে ভিত্তি। ২. মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি।

এ উভয় বুনিয়াদের মধ্যে নারী ও পুরুষের স্থান ও মান মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে একই সমান্তরাল।

পবিত্র কুরআনে এ উভয় সম্পর্কের বিষয়ে আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– "হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অত:পর তোমাদের জাতি ও গোত্র বানিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান সেই যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্ববিষয়ে অবহিত। (সূরা আল হুজুরাত : আয়াত-১৩)

এ পবিত্র আয়াতে পুরোপুরি বিশ্বমানবতাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে– তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ এক মাতা এবং এক পিতার দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সামগ্রিকভাবে নারী পুরুষ একে অপরের ভাইবোন। কারণ দুনিয়ার সব মানুষ একই আদি পিতার সন্তান। এদিক থেকে সব মানুষ পরস্পর আপন ভাই-বোনের মতোই। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ ইঙ্গিত করে বলেছেন : "নারী পুরুষের সঙ্গে সম-সম্পর্কযুক্ত।"

বলাবাহুল্য, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের সমগুরুত্ব যখন অর্জন করা হয় তখন তাদের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করাও অপরিহার্য। কেননা ছেলেমেয়ে উভয়ই মাতা-পিতার ঔরসজাত সন্তান হিসেবে সমান গুরুত্বের অধিকারী। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কেউ কারও চেয়ে বড় ছোট নয়। কারও মর্যাদা কারও চেয়ে বেশি বা কম নয়। নারী কোনো ক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নয়। নারী পুরুষ সকলেই সমান।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর দ্বিতীয় মর্যাদা হচ্ছে মানবিকতার ভিত্তিতে। এক্ষেত্রেও নারী পুরুষের মতোই সমমানের মানুষ।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

"হে মানবজাতি! তোমরা নিজ প্রতিপালককে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সত্তা থেকে তার জোড়া তৈরি করেছেন এবং সেই দুজন থেকে অনেক পুরুষ ও নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের অধিকার দাবি কর এবং আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চিত জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্বদা তোমাদের তত্ত্বাবধান করছেন।"

(সূরা নিসা : আয়াত-১)

এ আয়াত সম্পর্কে আমরা তিনটি বিষয় বিশ্লেষণ করব–

১. এ আয়াতে তাকওয়া বা খোদাভীরুতার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর আগের আয়াতে মানুষদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে তাদের সৃষ্টি করেছেন।

   'তাকওয়া' বা খোদাভীরুতা হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক গুণ। মানুষের ঔরসজাত সম্পর্কে বা অন্য কোনো মানবিক সম্পর্কের সাথে এর কোনো প্রকার মিল বা সাদৃশ্য নেই। মানুষকে এ পৃথিবীর বুকে যে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তারই ভিত্তিতে তাদেরকে খোদাভীরুতার পথ অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেহেতু মানুষ সাধারণভাবে নারী ও পুরুষের সমষ্টিকেই বলা হয়ে থাকে এজন্যে খোদাভীরুতার ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্বকে বাদ দেয়া বা আলাদা করার কোনো পথই নেই। নিজের মানবিক গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের জন্য নারীকেও অন্যান্য মানুষ অর্থাৎ পুরুষের মতো খোদাভীরুতা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে।

২. "তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" –এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো, এ বাক্যে ঔরসজাত সম্পর্কের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের অর্থই বেশি স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। কেননা ঔরসজাত সম্পর্কের জন্যে নারী ও পুরুষ দুজন মানুষের সমন্বয় একান্ত জরুরি। তাছাড়া আভিধানিকভাবে 'নফ্স' বা সত্তার অর্থ আত্মা অথবা মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণের দিকেই চিহ্নিত করে। এজন্যে এ থেকে অনর্থক বা নিছক ঔরসজাত সম্পর্কে অর্থ নেয়া যেতে পারে না।

৩. আল্লাহ্ তায়ালার বাণী, "সেই সত্তা থেকে তার জোড়া বানিয়েছি" প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো, এ বাক্যটিও সাবেক দুটি কুরআনী বাক্যের মতো মানব ঐক্যের তাকিদার্থে বলা হয়েছে। কারণ প্রথম বাক্যে এটা বলা হয়েছে যে, সারা বিশ্বমানবতাকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তিনিই হচ্ছেন আদি পিতা হযরত আদম (আ)। এর পরের বাক্যে তাঁর স্ত্রী এবং মানুষের আদি মাতা হাওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সবাই তাঁরই সন্তান। বলাবাহুল্য যে, সন্তানদের মতো মাও মহামানবতার ও মানব ঐক্যের বৈশিষ্ট্যে সমপর্যায়ের অংশীদার।

এ ব্যাপারে আমরা স্থির নিশ্চিত যে, কুরআনের এ আয়াতে নারীর যে মান-মর্যাদা ও গুরুত্ব পেশ করা হয়েছে তা পৃথিবীর সব জ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের সামষ্টিক জ্ঞান বুদ্ধির পক্ষেও আদৌ সম্ভব নয় যা এতোটা তাৎপর্যপূর্ণ ও অধিক অর্থবোধক। ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিক থেকেও আয়াতটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনন্য– অসাধারণ।

এরপর এ মানবত্ত্বের গুণ– যা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদমের জন্যে নির্ধারিত করেছেন– তা একটি অদৃশ্য জিনিস, তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে না। আর এ গুণ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে– আদমের সন্তান হিসেবে। তা সে পুরুষ অথবা নারী, তাতে কিছু যায় আসে না। এভাবে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামই নারী ও পুরুষ উভয়কে একই মানবিক মর্যাদা প্রদান করেছে। এদের মধ্যে এ ব্যতীত আর কোনো পার্থক্য নেই যে এরা কে নারী আর কে পুরুষ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম নারী জাতিকে এ মানবিক অধিকার ও মর্যাদা তখন দিয়েছে যখন খ্রিস্টান ও ইহুদী পণ্ডিতদের সাথে সারা পৃথিবীর পণ্ডিতেরা "নারী– মানুষ না আমানুষ" এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুলেছিল।

এ দীর্ঘ বিশ্লেষণের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে– সব বুনিয়াদী ব্যাপারেই নারী ও পুরুষ সমগুরুত্ব ও সমমর্যাদার অধিকারী। কেউ কারোর থেকে কোনো দিক দিয়ে খাটো নয়, হীন নয়। পুরুষ ও নারীদের মধ্যেকার এ সমতাপূর্ণ অবস্থানকে সম্মুখে রেখেই ইসলাম পুরুষদের মতো নারীদের জন্যেও আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তার বিধান জারি করেছে। সামনের শিরোনামের লেখনীতে আমরা নারী সংক্রান্ত এসব ইসলামী শিক্ষা ও আইনবিধি নিয়ে আলোচনা করব।

নারীর ধর্মীয় মর্যাদা

আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত প্রদান করেছি যে, নারীর ধর্মীয় অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপারটি খোদাভীরুতার উপদেশ দানের মধ্যেই নিহিত আছে। এর কারণ হলো তার মানবিক বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি অর্থাৎ বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে তার দায়িত্ব ঠিক পুরুষেরই সমান এবং এ ব্যাপারে তাকে পুরুষের মতোই যোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদি মানব আদমকে বেহেশতে থাকার জন্যে বলেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন তখন সেই আদেশ ও নিষেধের বাধা অতিক্রম করে সম্বোধন আদি মাতা হাওয়ার প্রতিও ছিল, যেমনটি ছিল হযরত আদমের প্রতি। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

"এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়ই এ জান্নাতে বসবাস করতে থাক, সেখানে যে জিনিস তোমাদের ইচ্ছে হয় খাও, কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকট যেও না, নয়তো অত্যাচারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা আরাফ : আয়াত-১৯)

এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অবাধ্যতার জন্যে ভর্ৎসনা করেন তখনও উভয়কে একই সাথে সম্বোধন করে বলেন :

"আমরা কি তোমাদের উভয়কেই ঐ গাছের নিকটে যাওয়া থেকে বাধা দিইনি।"

তাছাড়া ইসলাম নারী-পুরুষের ক্ষমতার শুধু সংবাদই দেননি বরং তাকে হাতে কলমে বাস্তবায়ন ও তার স্থায়িত্ব এবং স্থিতিশীলতা দানের উদ্দেশ্যে তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির উপলব্ধিও সৃষ্টি করেন। এর সাথে সাথে নারীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে একটি বিশেষ বাইয়াতের আয়োজনও করা হয় যেন তাদের এক পৃথক মর্যাদা স্বীকৃত হয় এবং তারা যেন শুধুমাত্র বাবা, ভাই বা অন্য কোনো মানুষের চাপে পড়ে ইসলাম কবুল না করে। ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কেও নারীদের পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতার অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

"হে নবী! যখন তোমার কাছে মু'মিন নারী বাইয়াত করার জন্যে আসে এবং এ কথার শপথ নেয় যে, সে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, আপন সন্তানকে হত্যা করবে না, নিজ হাত-পায়ের সামনে কোনো মিথ্যা অভিযোগ আনবে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না এবং কোনো সৎকর্মের আদেশে তোমার অবাধ্যতা হবে না– তাহলে তাদের বাইয়াত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"

(সূরা মুমতাহেনা : আয়াত-১২)

মনীষী মোহাম্মদ সাতুত্ তাঁর গ্রন্থ "নারী ও কুরআন"-এ উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন : "নারীদের কাছ থেকে আলাদাভাবে বাইয়াত গ্রহণের অর্থ হলো ইসলাম নারীদেরকে পুরুষদের চেয়ে পৃথক এক স্থায়ী মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং তাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে নিজেদেরকেই জাবাবদিহি প্রদান করতে হবে। (দ্রষ্টব্য : নারী ও কুরআন, পৃ: ৩)

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে তাদের দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আখিরাতে একইভাবে জবাবদিহি করতে হবে এবং উভয়ই পাপ বা পুণ্যের ভিত্তিতে শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"আর যে সৎকর্ম করবে– তা সে পুরুষ হোক বা নারী হোক– যদি সে মু'মিন হয়, তাহলে এমন লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের অণু পরিমাণ অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারবে না।" (সূরা নিসা : আয়াত-১২৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন–
"মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। সেটাই তাদের জন্যে উপযুক্ত স্থান। তাদের ওপর আল্লাহর লা'নত রয়েছে এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।" (সূরা তওবা : আয়াত-৬৮)

অর্থনৈতিক অধিকার

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার বলতে ইসলামের মর্মবাণী হচ্ছে, সব প্রকার ধনসম্পদ বা সম্পত্তিতে তার সমান মালিকানার অধিকার এবং তার ইচ্ছামতো ওসব ধনসম্পদ বা সম্পত্তি ব্যয় বা ব্যবহার করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, নারী বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই আল্লাহর ইবাদাত করার যোগ্যতম এবং সৎকর্মে তার ভূমিকা ও সহযোগিতা অপরিহার্য। কাজেই এ অযোগ্যতার প্রমাণ পেশ করার জন্য এবং সৎকর্মে ভূমিকা পালন ও সহযোগিতা দানের জন্যে তার অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা থাকা একান্তই আবশ্যকীয়। অবশ্য এ উভয়াদি অধিকারের জন্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও নীতিগত কোনরূপ পার্থক্যই নেই।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রোমান সমাজে নারীর নারীত্বের জন্যেই তার সবরকমের অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হতো। এভাবে আরব এবং অন্যান্য সভ্য এবং অর্ধসভ্য সমাজেও নারীর সব রকম অধিকার ও মর্যাদা হরণ করা হয় ও ভূলুণ্ঠিত হয়। তাদের দৃষ্টিতে নারী হয়ে জন্মানোটাই ছিল একটা বড়

অপরাধ। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথেই নারী জাতিকে সর্বপ্রথম অধিকার ও মর্যাদা দানের সাথে সাথে ক্রয় বিক্রয় এবং সম্পদ ও সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিকানা লাভের অধিকার ও সুযোগ প্রদান করা হয়।

ইসলাম নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ বা সম্পত্তি থেকে কোনো পুরুষকে, এমনকি স্বামী, পিতা বা ভাইকেও অনধিকার হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয়নি। ইসলাম নারীকে তার নিকটাত্মীয়ের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী অংশীদারিত্বও দান করেছে। অথচ পৃথিবীর অন্য সব জাতি নারীর এ অধিকারকে অস্বীকার করে, ফলশ্রুতিতে তারা কোনো মৃত নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী থেকে বঞ্চিত করে রাখত না।

নারী সমাজকে এ বঞ্চনার হাত থকে বাঁচিয়ে তার উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়ে আল্লাহ কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ করেন–

"পুরুষদের জন্যে সেই ধনসম্পদে অংশ রয়েছে যা মাতা-পিতা এবং নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে এবং নারীদের জন্যেও সেই ধনসম্পদে অংশ রয়েছে যা মাতা-পিতা এবং নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে– কম হোক বা বেশি, আর এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকেই) নির্ধারিত রয়েছে।" (সূরা নিসা : আয়াত-৭)

কুরআনের এ আদেশ মোতাবেক নারীরাও তাদের মাতা-পিতা, ভাই-ছেলে, স্বামী এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদের অংশ পেতে আরম্ভ করে।

একইভাবে ইসলাম-পূর্বযুগে নারীদেরকে তাদের বিয়ের দেনমোহর থেকেও বঞ্চিত করে রাখা হতো। বাবা, ভাই, স্বামী বা অন্য কোনো পুরুষ তার দেনমোহরের প্রাপ্য হজম করত। তার যৌতুক এবং উপহারগুলো সরাসরি স্বামীর করায়ত্বে চলে যেত। মোটকথা, কোনো উপায়েই নারীকে ধনসম্পদের মালিক হতে দেয়া হতো না সর্বপ্রকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে রাখা হতো।

ইসলাম নারীর ওপর পরিচালিত এ অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটায় এবং তাকে তার ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে জোড়ালো ভূমিকা রাখে বাপ-ভাই বা স্বামীর জন্যে এখন নারীর অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আর কোনো ফুরসত নেই।

মেয়েদের বিয়ের দেনমোহর সম্পর্কেও কুরআন স্পষ্ট বলেছে–

"নারীদেরকে তাদের মোহর– যা তাদের অধিকার, তা দিয়ে দাও।"

(সূরা নিসা : আয়াত-৪)

মনীষী ইবনে হাযম বলেন–

"শরীয়তের আইন অনুযায়ী স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে বা প্রতারিত করে তার যৌতুক বা মোহর ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার কোনো স্বামীর নেই। এমনকি স্ত্রীর যৌতুকের সামান্যতম অংশ ভোগ করাও তার জন্যে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যৌতুক ও মোহরের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার একচ্ছত্রভাবে শুধু নারীদেরই রয়েছে। নারী তার সম্পদ স্বামীর বিনা অনুমতিতেই নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যয় বা ব্যবহার করতে পারে। এ ব্যাপারে স্বামীর আপত্তি করার কোনো অধিকার নেই।

তিনি আরো বলেন–

"কোনো মেয়ের পিতা, তা সে প্রাপ্তবয়স্ক হোক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হোক, স্বামীর ঘর করুন বা না করুক– এ অধিকার নেই যে, সে তার মেয়ের মোহর থেকে কিছু অংশগ্রহণ করবে। পিতা বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয় যদি মেয়ের মোহরের কোনো অংশ গ্রহণ করে, তাহলে তা হারাম বা অবৈধ বলে পরিগণিত হবে। মেয়ে তার মোহর বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত সম্পদ যেখানে মর্জি, যেভাবে ইচ্ছা, স্বাধীনভাবে ব্যয় করতে পারে; এ ব্যাপারে পিতা, ভাই বা স্বামীর বলার বা নিষেধ করার কোনো অধিকার নেই।" (আলমুহাল্লা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৭-৫১১)

স্থাবর-অস্থাবর সবরকমের সম্পদের ওপর নারীর পূর্ণ স্বাধীন অধিকার রয়েছে। এ ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনসম্পদ আয় উপার্জন করার পূর্ণ স্বাধীনতাও নারীর রয়েছে। নারীর জামানত দান বা প্রদানের অধিকারও আছে; নারী উপহার দিতে বা নিতেও পারে। সে তার সম্পর্কের আপন বা তার নিকটাত্মীয় বা তার ইচ্ছে অনুযায়ী অপর কোনো মানুষকেও দান করার ব্যাপারে স্বাধীন। সে তার ধনসম্পদ যে কোনো মানুষের জন্যে অসীয়ত করে রেখে যেতে পারে। ইসলামের আইন অনুযায়ী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নারী সুবিচারের জন্যে আদালতে মামলা দায়ের করার অধিকারও রাখে। মোটকথা, ইসলাম নারীকে সর্বপ্রকার পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। ইসলামের আগে নারী এসব অধিকার ও মর্যাদা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল।

ইমাম মোহাম্মদ আবদুহু বলেন–

"ইসলাম নারীকে এমন উন্নত মর্যাদায় আসীন করেছে এবং তাকে যে অধিকার দান করছে তা অভূতপূর্ব ও নজীরবিহীন। এতো অধিকার ও মর্যাদা যেমন জগতে

নারী পায়নি তেমনি ইসলামী সমাজ ছাড়া বর্তমানে অন্য কোনো সমাজেও নারীর এত অধিকার ও মর্যাদা পরিলক্ষিত হয়নি। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে নারী ভবিষ্যতেও তার এতো মর্যাদা বা অধিকার পাওয়ার আশা করতে পারে না। ইসলাম শত শত বছর আগে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে বিধান বাস্তবায়ন করেছে তা এতো উন্নতমানের যে কোনো মানুষের পক্ষে তার চিন্তা করাটাও দুরহ।"

"অধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ যেখানে নারীশিক্ষা, প্রশিক্ষা এবং অন্যান্য জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারী প্রগতির বুলি আওড়ানো হয় সেখানেও নারীর যথার্থ অধিকার ও মর্যাদার আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি, যা ইসলাম অনেক পূর্বেই নারীকে যথাযথভাবে দিয়ে রেখেছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে আজও এমন সব নারী বিরোধী আইন ও প্রথা প্রচলিত রয়েছে যার মাধ্যমে নারীকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শোষণ বঞ্চনার স্বীকার হতে হচ্ছে। গত পঞ্চাশ বছরে পাশ্চাত্য জীবনের সর্বত্র নারী সংক্রান্ত এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে আজ পাশ্চাত্য সমাজে নারীর অবস্থা এমন করুন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যা সম্ভবত অন্ধকার যুগকেও হার মানিয়েছে।"

এ বিখ্যাত গ্রন্থকার অন্য এক জায়গায় লিখেছেন–

"পাশ্চাত্যের বর্তমান পণ্ডিত সমাজ যারা নিজেদের দাবি মতো নারীকে অনেক বড় স্থান দিয়েছে বলে গর্ব করে আর উল্টো আমাদেরকেই সংকীর্ণমনা বলে কটাক্ষ করে; আজ ইসলাম থেকে আমাদের দূরে সরে পড়ার কারণে আমাদের যে অধঃপতন– এ জ্ঞানপাপীরা তাকে আমাদের দ্বীনের ফলাফল বলে দোষারোপ করছে।"

আমাদের সমাজে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী ব্যক্তিরা, যারা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তারা পশ্চিমা জ্ঞানপাপীদের তালে তাল মিলিয়ে ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে নানারকম ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করে থাকে। ইসলামী চিন্তাবিদদের ব্যাপারেও এসব অন্ধ অনুসারীরা অযাচিত উক্তি প্রকাশ করে থাকে– তারা আসলে নিকৃষ্ট পর্যায়ের আহম্মক। পাশ্চাত্যের ঠুনকো চাকচিক্য তাদের সৃষ্টি ও বিবেকশক্তি কেড়ে নিয়েছে।

সামাজিক অধিকার

ইসলাম নারীর সামাজিক অধিকারও দিয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত আইনবিধি প্রবর্তন করেছে–

ক. মেয়ে যখন বালেগ অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কে পৌঁছে এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ ঘটে সব বিষয় ও সম্পর্কে ভালো করে অনুধাবন করতে শুরু করে তখন তার ব্যক্তিগত ধনসম্পদ ও নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যাবতীয় অধিকার অর্জিত হয়ে যায়। এখন সে চাইলে পৃথক কোনোরূপ বাসগৃহেও অবস্থান করতে পারে। এ ব্যাপারে তার আত্মীয়স্বজনের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই, তাকে কেউ নিজেদের সাথে থাকার জন্যে বাধ্য করতে পারে না। অবশ্য শর্ত হলো সে যেন সচেতন ও সজ্ঞান হয় যাতে নিজেই তার জানমাল ও ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা বিধান করতে পারে।

শাব্দিক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আহমদ ইব্রাহীম বলেন, "মেয়ে যখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়, বা বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা– তার অবস্থা যদি অসন্তোষজনক হয় তাহলে তার পিতা অথবা অন্য কোনো দায়িত্বশীলের এ অধিকার বর্তায় যে, সে তাকে নিজের কাছেই থাকার জন্যে বাধ্য বাধকতা প্রয়োগ করবে। কিন্তু মেয়ে যদি জ্ঞানী বুদ্ধিমতী ও মর্যাদাবান হয় তাহলে তাকে কাছে রাখার জন্যে বাধ্য করার অধিকার কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির থাকে না। অবশ্য বিয়ের পর মেয়ের এ অধিকার স্বভাবতঃই সমাপ্ত হয়ে যায় এবং তার পক্ষে স্বামীর সাথে অবস্থান করা অপরিহার্য হয়ে উঠে যেন সে তার দাম্পত্যের অধিকার ও দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারে। এটা এমন এক স্বাভাবিক কথা যার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই।"

খ. প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে তার ইচ্ছামতো বিয়ে করার অধিকার রাখে। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোথাও বিয়ে দেয়ার অধিকার কোনো অভিভাবকের নেই। যদি সে কোনো চরিত্রবান ব্যক্তির সাথে বিয়ে করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে বাধা দেয়ার অধিকারও কারোর নেই, কারণ তা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং এটা হলো তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এ অধিকার সে প্রকাশ্য পন্থায় প্রয়োগ করার স্বাধীনতা রাখে। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর বাণী বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন–

"কোনো অলীর (দায়িত্বশীল) পক্ষে মেয়ের (ব্যক্তিগত) ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই।" (আবু দাউদ)

প্রিয়নবী আরো বলেছেন :
"বিবাহিতা নিজের ব্যাপারে "অলি" থেকে বেশি ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অবিবাহিতার ব্যাপারে অলী তার কাছে অনুমতি চাইবে এবং তার নীরবতাই অনুমতির লক্ষণ বলে ধরে নিবে।" (বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ)

আল্লামা ইবনে কাইউম এ হাদীসের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন, "বালেগা, বুদ্ধিপ্রাপ্তা ও জ্ঞানী মেয়ের ধনসম্পদেও যখন তার পিতা মেয়ের অনুমতি ব্যতীত ব্যয়ের অধিকার রাখে না সেখানে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার ইচ্ছা স্বাধীন ব্যতীত তিনি কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন? অথচ, ধনসম্পদ ব্যয়ের অধিকার, কোনো অবাঞ্ছিত পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়ার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ব্যাপার।"

(জাদুল মায়াদ, চতুর্থ খণ্ড)

কিন্তু এসব বিধি-নিষেধের পরও যদি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি নিজের মেয়েকে কোনো অবাঞ্ছিত পুরুষের সাথে বিবাহ দিয়ে থাকে, তাহলে মেয়ে সে বিবাহকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখবে। হাদীসে আছে যে-খান্‌সা বিনতে জুযাযকে তার পিতা এমন এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেন- যাকে তিনি পছন্দ করতেন না। (উল্লেখযোগ্য যে তার প্রথম স্বামী ইন্তেকাল করেন)। মহানবী ﷺ এ বিয়েকে প্রত্যাখ্যান করেন। (আল আহকাম আশ শারয়ীয়াহ)

এজন্যে বিয়ের সময় মেয়ের উপস্থিতি একান্ত কাম্য ও অতি উত্তম। আহমদ ইব্রাহীম তাঁর আল আহকাম আশ শরীয়াহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো পাত্রপাত্রী স্বাধীন ও বুদ্ধিমান হওয়া প্রযোজ্য। বিয়ের সময় উভয়েই উপস্থিত থাকবে কিংবা উভয়ের উকিল অথবা উভয়ের মধ্যে একজন স্বয়ং উপস্থিত এবং অন্য জনের উকিল উপস্থিত থাকবে।

(আহকাম আশ শরয়ীয়াহ, পৃঃ ৯)

শায়খ আল্লামা মাহমুদ শাতুত এ বিষয় প্রসঙ্গে বলেন : "এ সম্পর্কে আমরা যখন কুরআনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন দেখি যে, ইসলাম নারীকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দিয়েছে।

যেমন সূরা আহযাবের এ আয়াতে বলা হয়েছে-
"আর সেই মু'মিন মহিলা যে নিজেই নিজেকে নবীর জন্য হেবা করে দিয়েছে নবী যদি তাকে বিবাহ করতে চায়। এ বিশেষ সুবিধা শুধু তোমার জন্যে অন্যান্য মু'মিনদের জন্য নয়।" (সূরা আহযাব : আয়াত-৫০)

সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে–
এরপর যদি (দ্বিতীয়বার তালাক দেয়ার পর স্বামী তৃতীয়বার) তালাক প্রদান করে তাহলে সেই নারী এরপর তার জন্যে আর জায়েয থাকবে না। অবশ্য যদি তার বিবাহ অন্য কোনো পুরুষের সাথে হয় (এবং সে যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয়)।

একই সূরায় অন্যত্র বলা হচ্ছে–
"এরপর যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায় তখন ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রকাশ্য পন্থায় যা মর্জি তা করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৪)

এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বিবাহের কর্ম নারীর মর্জির ওপর নির্ভরশীল করে দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের ভূমিকাকে গৌণ করা হয়েছে। এরপর একথা একেবারে বিবেকবর্জিত ও শরীয়ত বিরোধী মনে হয় যে, কোনো ব্যাপারে অধিকার প্রয়োগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি জরুরি হয় ঠিকই, কিন্তু সে যদি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কোনো বিষয়ের ফয়সালা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তাকে অবৈধ গণ্য করা হবে।

আর এতেও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শরীয়তের আইন অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার বালেগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রের রয়েছে। আর ঠিক একই অবস্থা যদি নারীর বেলায় ঘটে যায় তাকে অবৈধ বলার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এছাড়া এটাও সন্দেহাতীত ব্যাপারে যে বিয়ের সম্পূর্ণ সম্পর্কটাই স্বামী-স্ত্রীর মর্জির ওপর নির্ভরশীল আর এটা সর্বজন স্বীকৃত নীতি যে, যেকোনো ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকারের মালিক হতে পারে কেবল বিষয় সংশ্লিষ্ট নরনারী। (কুরআন ও নারী, পৃঃ ১২-১৩)

তাঁর বক্তব্য হলো, অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট। এরপর আরো কিছু বলার মানে হবে সূর্যের সামনে বাতি জ্বালানোর মতো। উপরের বক্তব্যের মাধ্যমে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম নারীর স্বাধীন অভিমতকে কতখানি গুরুত্ব প্রদান করে এবং ইসলাম নারীর মর্যাদা কতটা বৃদ্ধি করেছে।

গ. সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে অন্য যে অধিকারটি প্রদান করেছে তা সত্যিই অনন্য ও অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। আজকের তথাকথিত প্রগতিবাদীরাও নারীকে এতোবড় অধিকার দিতে সম্মত নয়। অথচ এরাই নারীমুক্তির ব্যাপারে নিজেদেরকে ঠিকাদার মনে করে। নারীর এ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকারটি হলো– শান্তি বা যুদ্ধের যে কোনো সময় নারী ইচ্ছা করলে শত্রুপক্ষের যে কোনো লোককে আশ্রয় দান করতে পারে।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের পর আবু তালেবের মেয়ে এবং আলী (রা)-এর সহোদরা বোন উম্মে হানী এক মুশরিক ব্যক্তিকে নিজগৃহে আশ্রয়দান করেন। আলী (রা) বোনের দেয়া এ আশ্রয়কে অগ্রাহ্য করে শত্রুটিকে হত্যা করার জিদ ধরেন। এমতাবস্থায় উম্মে হানী শীঘ্রই মহানবীর দরবারে হাজির হয়ে বলেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল! আলী এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছে যাকে আমি আশ্রয় প্রদান করেছি।'

একথা শুনে মহানবী বলেন–

'উম্মে হানী! আমরাও তাকে আশ্রয় দিচ্ছি, যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ।'

(বুখারী, মুসলিম)

এ সম্পর্কে প্রিয় নবীর আরও একটি হাদীস প্রনিধানযোগ্য। মহানবী ﷺ বলেছেন–

"সব সবল মুসলমান দুর্বল মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষক। তাদের রক্ত সমগুরুত্বপূর্ণ এবং (কাউকে) আশ্রয় দেয়ার অধিকার তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে।"

'মুসলমান' শব্দটি অধিক অর্থবোধক। ছোট-বড় ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো মানুষই মুসলমান হওয়ার অধিকার রয়েছে। বলাবাহুল্য, উম্মে হানী সম্পর্কিত হাদীসের মতো এ হাদীসটিতে দেয়া অধিকারও নারী-পুরুষ সবাই সমানভাবে পাবে। এখানে মহানবী ﷺ-এর আর একটি হাদীসে নারী সমাজের যোগ্যতা, দক্ষতা ও গুণবৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন– "নারী পুরো জাতির দায়িত্ব নিতে পারে।" (তিরমিযী)

"আল মুলকাতা'র গ্রন্থকার এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "নারী মুসলমানদের তরফ থেকে শত্রুকে আশ্রয় দিতে পারে।" এ প্রসঙ্গে আয়েশা সিদ্দিকার হাদীসটিও সিদ্ধান্তমূলক। তিনি বলেন : "যদি কোনো মহিলা মুসলমানদের তরফ থেকে (শত্রুকে) আশ্রয় দিতে ইচ্ছা করে, তাহলে দিতে পারে।" এ অনুমতির স্পষ্ট অর্থ হলো, ইসলামী সমাজে নারীর এ কাজকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং যেকোন মুসলিম মহিলা এ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। কোনো ব্যক্তি মহিলাদের এ অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না।

যদিও এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সামান্য অসতর্কবশত ভীষণ ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্মুখীন হতে পারে। কাজেই এ বিষয়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম এক্ষেত্রেও নারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করে অক্ষুণ্ন রেখেছে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ইসলামী সমাজে

নারীকে খানিকটা দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত মনে করা হয়। নারীকে এত বেশি মর্যাদা দেয়া এবং বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল কেবল ইসলামই মনে করে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে নারীমুক্তি শ্লোগান প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে কিন্তু তারা নারীর বিবেক-বুদ্ধি ও বিশ্বস্ততায় কখনও আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। এর প্রকৃত কারণ হলো, পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শন মানুষের চারিত্রিক ও নৈতিক গুণবৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে। ফলে সেখানে নারী-পুরুষের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেয়। সেখানে প্রতিটি নারী-পুরুষ অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে এবং তারা সবাইকে নিজেদের মতো অপরাধী ও অবিশ্বাসী বলে মনে করে। অতএব পাশ্চাত্য সমাজে নারীর ওপর পুরুষের এবং পুরুষের ওপর নারীর আস্থা স্থাপনেরও বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

এভাবে পাশ্চাত্য সমাজে পাক-পবিত্রতা, লজ্জাশীলতা ও নিঃস্বার্থ সেবার কোনো সুযোগ ও অস্তিত্ব নেই, আর পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার তো সেখানে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে ইসলামী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো পারস্পরিক মর্যাদা ও বিশ্বাসের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা পাশ্চাত্য সমাজে একান্ত অকল্পনীয় ব্যাপার।

এর একটি কারণ হলো, ইসলামী সমাজে উন্নতি ও মান-মর্যাদার মান, ধন-সম্পদ বা বংশভিত্তিক নয়। বরং এখানে নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সব মানুষই বরাবর মর্যাদার অধিকারী। কারো যদি বেশি মর্যাদা হয়, তাহলে তা হয় কেবল খোদাভীরুতার জন্যই। এখানে প্রত্যেকের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই অভিন্ন একই লক্ষ্যের দিকে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের পথ পাড়ি দিচ্ছে। এ পথে যদি কোনো আপদ-বিপদ আসে তাহলে তারা সম্মিলিতভাবে তার মোকাবিলা করে– সবাই জান-মালের ত্যাগ-তিতীক্ষায় এগিয়ে আসে।

ইসলামী সমাজে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই সমান। এখানে ভেদাভেদ ও বৈষম্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। সমতাবোধ, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা, সম্প্রীতি ও সদ্ভাব এবং নিঃস্বার্থ সেবা হলো মুসলিম সমাজের উল্লেখযোগ্য গুণ-বৈশিষ্ট্য। এজন্যে ইসলামী সমাজের কোনো নারীও যদি কারো জান-মালের দায়িত্ব নেয় তখন গোটা সমাজ তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন প্রকাশ করে এবং প্রত্যেকের মনেই তার জন্যে বিশেষ সম্মান ও সম্প্রীতির ভাব উদয় হয়।

সমাজ ও নারী

উপরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে এটা ভালো করে জানা গেল, ইসলামী সমাজে নারীর অধিকার কতখানি। ইসলামী সমাজে নারীর ধর্মীয়, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে এবং এখানে নারী সম্পূর্ণ মানবিক সন্তুষ্টির সাথে মুক্ত মন ও স্বাধীন বিবেক নিয়ে জীবনযাপন করে যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, এসব হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া অধিকার যা তিনি নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সমাজের প্রতিটি মানুষকেই দান করেছেন। এ থেকেও এ নীতি-যুক্তির বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ পৃথিবীতে কোনো জীব বা কোনো পদার্থকেই নিরর্থক বা উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি এবং পৃথিবীতে উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি জিনিসেরই মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে সেই মূল সত্যের দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারী– এরা সবাই একে অপরের বন্ধু, সৎ কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজের প্রতিরোধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করে। এরা সে-সব লোক যাদের ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হবেই। নিশ্চয়ই, আল্লাহ সবার ওপরে বিজয়ী এবং মহাজ্ঞানী।" (সূরা তওবা : আয়াত-৭১)

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে মানব জীবনের সবদিক ও বিভাগকে সামনে রেখেই সুস্পষ্ট দৃষ্টিকোণ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, কোনো ধরনের বিশেষ গুণাবলির সমন্বয় হলে পরে কোনো ব্যক্তি বা সমাজ যথার্থ উন্নতি সাধন করতে পারে। এসব মহৎ গুণাবলির অর্জন ও সংরক্ষণ করা প্রতিটি মুসলমানের বুনিয়াদী কর্তব্য। কিন্তু যেহেতু আমরা নারী সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করছি তাই এ আয়াতের আলোকে নারীদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো।

ক. এ আয়াতে একটি দৃষ্টান্তমূলক সমাজ– যথার্থ ইসলামী সমাজের লোকদের গুণবৈশিষ্ট্য এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রনিধানযোগ্য যে, একটি ইসলামী সমাজের সদস্যদের মধ্যে অবিভাজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এখানে ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বা সমাজকে ব্যক্তি থেকে আলাদা করে দেখার বা কোনো একটাকে গৌণ মনে করার কোনো যুক্তি নেই। আর এ সম্পর্কের বুনিয়াদ হলো সেই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ যার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন

করেই কোনো মানুষ মুসলমান হতে পারে। এর মধ্যে প্রথম বিষয় হলো এক আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আর এ বিশ্বাসই হলো ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রকৃত বুনিয়াদ। কারণ ব্যক্তি ও সমাজের সবরকম সম্পর্ক আবেগ ও উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল। আর এসব ইসলামী মূল্যবোধের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের পরই এ সম্পর্ক হয় মজবুত ও স্থিতিশীল।

এ সম্পর্ক এতই দৃঢ় যে তাকে ইস্পাত-কঠিন দেওয়ালের সাথেই কেবল সাদৃশ্য করা যেতে পারে। সম্পর্কের এ দৃঢ়তা আসলে ঈমানেরই প্রতিফল হিসেবে প্রকাশিত হয়। একে মেনে নেয়ার পর ব্যক্তি সমাজের এক ব্যক্তি দায়িত্বশীল সদস্যের মর্যাদা লাভ করে। এরপর ব্যক্তি তার ভালোমন্দ সব কাজের জন্যে আল্লাহ এবং তাঁর বান্দার সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এরই মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসার আবেগ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। বস্তুত, এটা হচ্ছে জীবনের মহত্তম লক্ষ্যস্থল, যেখানে পৌঁছানোর জন্যে যে কোনো মানুষ আকাঙ্ক্ষা করতে পারে।

এ বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারী সবাই পরস্পর-পরস্পরের বন্ধু।"

এতে পরিষ্কারভাবে এদিকে ইঙ্গিত করা হলো যে, ইসলামী সমাজে নারী ও পুরুষের মর্যাদার মানদণ্ড হচ্ছে ঈমান এবং এ ঈমানই হলো তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি।

খ. যখন কোনো সমাজের ভিত্তিই হয় 'ঈমান' তখন তার জনগণের মধ্যে সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রে দান করে বিশেষ গুণাবলির সৃষ্টি হয়। আর তা হলো তারা সৎকর্মের আদেশ দান করে, মন্দকর্মের প্রতিরোধ গড়ে তুলে। সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এখানে আমরা কুরআনী আয়াতের শুধু সেই অংশের ব্যাপারে আলোচনা করব যাতে নারীদের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

"তারা সৎকর্মের উপদেশ দেয় এবং অসৎকর্মের প্রতিরোধ করো" এ খণ্ড আয়াতের ব্যাপারে চিন্তা করলে অবগত হওয়া যায় যে, আল্লাহ সমাজকে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচিয়ে রেখে তাকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ওপর একটি পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ দায়িত্বের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে কাউকেই নিষ্কৃতি দেয়া হয়নি। আল্লাহ

সমগ্র বিশ্ব-মানবতাকে সামনে রেখেই সম্বোধন করেছেন– তাতে নর-নারীর পৃথক সত্তার কোনো গুরুত্ব নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা একটি বৃহৎ ও মহৎ দায়িত্ব– যা নর-নারী উভয়কেই অবশ্য কর্তব্য হিসেবে পালন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো সমাজে নারীকে এতো বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের যোগ্য মনে করা হয়নি।

গ. "তারা সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কর্মের প্রতিরোধ করে" –এ কুরআনী আয়াতের মাধ্যমে মুসলিম নর-নারীর দায়িত্বকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়। সমাজের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কাঠামোকে সর্বোতভাবে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করা এবং যুলুম-অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, অজ্ঞতা-নিরক্ষরতা ইত্যাদির অবসান ঘটানো তাদের বুনিয়াদী কর্তব্য হয়ে পড়ে। তারা সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যে, সেখানে কোনো একটি ব্যক্তিও যেন তার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং কেউ যেন কোনোভাবে কারো থেকে কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বরং প্রত্যেকেই যেন পরস্পরের সহযোগী ও কল্যাণকামী হয় একে-অন্যের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

তারা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যেখানে প্রতিটি ব্যাক্তি অত্যাচারের উচ্ছেদ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম নারীকে তার কর্ম সীমার আওতায় থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। অবশ্য এর জন্যে সে তার সমাজ ও পরিবেশকে ভালো করে জেনে বুঝে নেবে এবং সমাজ ও পরিবেশের সব রকম ভালো-মন্দ সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। এভাবেই মুসলিম নারী সমাজের বৃহত্তর অঙ্গণে নিজেদের বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে পারদর্শিতা লাভ করবে। এ সম্পর্কে মহানবীর একটি বাণী অতি তাৎপর্যপূর্ণ।

তিনি প্রতিটি মুসলিম নর-নারীকে সম্বোধন করে বলেছেন– "যে মুসলমান, মুসলমানদের ব্যাপারাদিতে আগ্রহ না দেখায়– সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

আর মুসলমানদের কার্যক্রম বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে এবং স্থান ও সময়ের দিক থেকে তার পরিবর্তন পরিবর্ধনও ঘটতে পারে। কোনো কোনো মুসলমান চাষাবাদ ও কৃষি তৎপরতায়, কেউ কল-কারখানা বা শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বা সরকারি দায়িত্ব পালনে, কেউ ক্ষুধা-দারিদ্র্যেও ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বা সরকারি দায়িত্ব পালনে, কেউ ক্ষুধা

ও দারিদ্র্যের অবসান করার আপ্রাণ চেষ্টায়, কেউ সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্কারে, কেউ কেউ সামষ্টিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়, কেউ বিশেষ বা সীমিত পর্যায়ে, কেউ বৃহত্তম ও ব্যাপক পর্যায়ে নিজ নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে থাকে।

আর কর্ম ও দায়িত্ব পালনের সবগুলো ক্ষেত্রেই নারীর কর্তব্যও ততটুকু যতটুকু পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এভাবে সমাজের উন্নতির সাথে সাথে যদি আরো নতুন কর্মক্ষেত্রের পরিসীমা সৃষ্টি হয় তাহলে পুরুষের মতো নারীও সেসব ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে।

এখানে মহিলাদের কর্মপদ্ধতি বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং তার ব্যবহারিক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ ইসলামের আলোকে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের দাবি ও চাহিদা অনুযায়ী নারী নিজেই তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে। কারণ সময় ও পরিবেশের সাথে সাথে কর্মপন্থারও পরিবর্তন হতে পারে। নীতি ও আদর্শ অপরিবর্তনীয় থাকলেই হলো।

অবশ্য এখানে আমরা নারীর স্বাভাবিক কর্মসীমা কর্মপরিধি এবং তাদের তৎপরতার বিভিন্ন পর্যায়ের দিক নির্দেশ করব যা তারা তাদের কর্মসীমায় থেকে গ্রহণ ও পালন করতে পারে। কিন্তু মূল আলোচনা শুরু করার আগে এখানে এমন একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজনীয় মনে করি, তাতে করে সামনের অনেক প্রশ্ন ও জটিল সমস্যাবলির সমাধান সহজ হয়ে যাবে।

আর তা হলো এই যে, ইসলামী সমাজের নারীর কর্মক্ষেত্রেও সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে নারীকে পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত এমনি অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং নারীদের কর্মপদ্ধতি ও কর্মসীমা নির্ধারণের পিছনে গভীর ও ব্যাপক ভাবনা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা রয়েছে। এতে সমাজ সংস্কার উন্নতি ও অগ্রগতির এমন রহস্য অন্তর্নিহিত রয়েছে যাকে বাদ দিয়ে সমাজের যথার্থ অগ্রগতি ও কল্যাণ সাধনের চিন্তাই করা যায় না।

এ জন্যে, কেউ যদি বলেন যে নারীর এ কর্মক্ষেত্র ও সীমা নির্ধারণ নিষ্প্রয়োজনীয় যাতে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে– তাহলে তিনি ভুল ও যুক্তিহীন কথাই বলবেন। নারীদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রকৃতি এবং তাদের দৈহিক মনস্তাত্ত্বিক কর্মপন্থা নির্ধারণের যৌক্তিকতা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম নারীদের গঠনমূলক ও বিপ্লবী ভূমিকা সামনে রাখলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। অতীতের মুসলিম নারী সমাজ ও

আজকের তথাকথিত আধুনিক নারী সমাজের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা পর্যালোচনা করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে, ইসলামই তাদের ব্যক্তিত্বের গঠন বিকাশে কি বিশাল অবদান রেখেছে।

তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রতিভার উন্মেষ এবং জীবনের বৃহত্তর অঙ্গণে তাদের সুদূর ভূমিকা ছিল গঠনমূলক এবং বিপ্লবাত্মক। বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত দিক থেকেও মুসলিম মহিলারা বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন। আর তাঁরা এসব কিছু করেছেন ইসলামের নির্ধারিত কর্মক্ষেত্র ও কর্মসীমার পর্দার অন্তরালে থেকেই। ইসলামের ছায়াতলে থেকেও তাঁরা কখনো তাঁদের জাতীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমস্যাবলির সমাধানে নিজেদের বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অবহেলা করেননি বরং বিশ্বের ইতিহাসে কেবল ইসলামী সমাজই একমাত্র উদাহরণ যেখানে মুসলিম নারী জাতির সাধারণ ও বিশেষ সমস্যাবলির সমাধানে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে, পারিবারিক, সামাজিক, যুদ্ধ, সন্ধি, শারীরিক ও মানসিকভাবে তাঁরা তাদের এক একটি দায়িত্ব পালন করেন। সব ক্ষেত্রেই তাঁরা পর্দার মধ্যে থেকেই পুরুষের সমান যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম মহিলাদের এ সক্রিয় তৎপরতা, বীরত্বের সত্যতা ইসলামের চরম শত্রু এবং সমালোচকরাও অস্বীকার জ্ঞাপন করেনি। ইতিহাস এ সত্যতারও সাক্ষী যে, মুসলিম নারী তার দ্বীন ও ঈমান এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের সব ধনসম্পদ জিহাদের তহবিলে দান করে দিয়েছেন এবং স্বয়ং নিজেরাই রণাঙ্গণে গিয়ে মুজাহিদের সাহায্য সহযোগিতা ও সেবামূলক কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন।

আহতদের সেবা ও চিকিৎসার দায়িত্ব মুজাহিদদের সাহায্য সহযোগিতা ও সেবা তাঁরাই পালন করেন। এভাবে শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ময়দানেও মুসলিম নারী তাঁর দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করেন। বর্তমান যুগের মুসলিম নারী ইসলামের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বলে এবং তথাকথিত আধুনিক চাকচিক্যের প্রতারণায় বিভ্রান্ত বলে আজ এতটা নির্জিব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। আজকের মুসলিম নারী ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে তাদের সঠিক অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে একান্তই অজ্ঞাত এবং একই কারণে তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও উদাসীনতা প্রদর্শন করছে।

অতীতের মুসলিম মহিলারা ইসলামী জ্ঞানে আলোকপ্রাপ্তা ছিলেন বলে তাঁরা ইসলামী শিক্ষার আলোকে পর্দার অন্তরাল থেকে সমাজ ও জাতি গঠনমূলক কাজ করে ইতিহাস অবতারণা করেছেন। তাঁরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন দুনিয়ার ইতিহাস তার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পেশ করতে সক্ষম নয়।

এখন আজকের যুগের নারী সমাজ যদি তাদের হৃত অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পেতে চান তাহলে তাদেরকে তথাকথিত আধুনিক পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ, তার লাগামহীন বেহেল্লাপনা, অশালীন ও অশ্লীল কার্যকলাপ, দেহ-প্রদর্শনী, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং এ ধরনের অন্যান্য নোংরা তৎপরতা বর্জন করে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে হারানো অধিকার ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে হবে।

বস্তুত, ইসলামী আদর্শের অনুসরণ তথা আল্লাহর নির্দেশিত কর্মপন্থা অনুসরণ করার মধ্যেই নারী-পুরুষ ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেদিন আমাদের মহিলা সমাজ এ বাস্তব কথা ও এ সত্য কথা অনুভব করে সামনের দিকে এগিয়ে আসবেন সে দিনই সত্যিকার অর্থে তাদের মুক্তির পথ সুগম হবে। সেদিন তারা আর পুরুষের সাথে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামত না এতে নিজেদেরই কর্মক্ষেত্র এবং কর্মসীমার দায়িত্ব কর্তব্য পালনের নতুন পথ খুঁজে পাবেন এবং সেই পথ ধরেই তাঁরা তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশেষ অধিকার

প্রথম পরিচ্ছেদ- বিবাহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- স্ত্রী সংখ্যা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ- তালাক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ- হালাল

পঞ্চম পরিচ্ছেদ- নারী : মা ও স্ত্রী হিসেবে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ- পর্দা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহ

"এবং আমরা প্রতিটি জিনিসের জোড়া বানিয়েছি। সম্ভবতঃ তোমরা তা থেকে শিক্ষা নেবে।" (সূরা আয যারীয়াত : আয়াত-৪৯)

বিবাহ এবং প্রকৃতির বিধি

বিয়ে-শাদী, স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক ইত্যাদি শব্দ মানব স্বভাবের যৌন প্রবৃত্তিরই পরিচয় বহন করে, এটা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ও চাহিদা যা আল্লাহ তা'আলা মানবপ্রকৃতির মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এখানে আমরা যৌন-বিজ্ঞানের কোনো পরিভাষা বা বিভিন্ন যৌন পর্যায়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে যাব না বরং এর পেছনে সুপ্ত প্রাকৃতিক রহস্য উন্মোচন করার শুধু চেষ্টা করব এবং সহজ ভাষায় এটাকে আমরা 'মানব স্বভাব' বলেই অভিহিত করব। বিবাহবিধি আসলে সেই বিশ্বপ্রকৃতির বিধান যার বন্ধনে আমাদের গোটা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আবদ্ধ রয়েছে।

আর এর ওপরই নির্ভর করে মানব-বংশ বিস্তারের ধারাবাহিকতা, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন–

"এবং সব জিনিসেরই আমরা জোড়া রূপে বানিয়েছি, সম্ভবতঃ তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।" (সূরা আয-যারীয়াত : আয়াত-৪৯)

আমাদের বিশ্বাস "সব জিনিসের" জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত আর কারোরই নেই। অবশ্য আমাদের ভাষা, জ্ঞান ও পরিভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট সব প্রাণী ও জড় এবং আমাদের জানা ও অজানা, বাকশক্তি ও বাক্‌হীন সব জিনিসই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন–

"পবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি সব রকমের জোড়া তৈরি করেছেন, তা সে পৃথিবীর বৃক্ষলতা হোক কিংবা স্বয়ং তাদের নিজ অস্তিত্ব (অর্থাৎ মানবজাতি) অথবা ওসব জিনিস যে সম্পর্কে তাদের অবগতিই নেই।" (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৩৬)

মোটকথা, এ বিবাহবিধি কোনো একশ্রেণী বা জাতির বিধানই শুধু নয় বরং পৃথিবীর সব মানুষ, জীবজন্তু-পশুপাখি, বৃক্ষলতা-গুল্ম, জড়-পাথর সব কিছুই এ বিধানের আওতাধীন রয়েছে। এ হলো গোটা পৃথিবীর স্বাভাবিক চাহিদা মাত্র। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি প্রাণ ও বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক জোড়াকে এমন ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যার সাথে অন্য কোনো জাত বা

শ্রেণীর কোনো সাদৃশ্য নেই। এভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে প্রতিটি জাত ও শ্রেণীর প্রকারভেদ বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে পজেটিভ ও নেগেটিভ ব্যবস্থার মাধ্যমেও আমরা বিষয়টির বাস্তবতা অনুভব করতে পারি। নেগেটিভ ও পজেটিভ তারের মধ্যেকার গুণবৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীত আর এ বৈপরীত্যের মাঝে রয়েছে তাদের একতার অফুরন্ত মিল। উভয়ের মিলনের ফলেই আলোকের সৃষ্টি হয়। আর প্রাকৃতিক বিধির অনুসরণ ব্যতীত এ দু'য়ের মিল কখনও সম্ভব নয়। যদি এ দু'য়ের মিল না হয় তাহলে তা থেকে উপকৃত হওয়ার কোনো আশা করা যায় না। শুধু নিরাশার বালুচরে মিথ্যে কল্পনা করা যায়। এভাবে বিশ্বের অন্যান্য জিনিসের উদাহরণও একই প্রকার।

বিয়ে ও মানব স্বভাব

মানবজাতির প্রতিটি ব্যক্তি– সে নর হোক বা নারী হোক, স্বাভাবিক নিয়মে যৌনপ্রবণ এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের সঙ্গম না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানবিক পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

এ সত্যতার ওপর আলোকপাত করেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

"এবং তার নিদর্শনাবলির মধ্যে এটাও একটা নিদর্শন যে, তিনি তোমাদেরই অস্তিত্ব থেকে স্ত্রীসমূহের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর এবং (তিনি) তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়ার উদ্রেগ সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে অনেক নিদর্শনাবলি রয়েছে ওসব লোকদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা রুম : আয়াত-২১)

উপরের কুরআনের আয়াতটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যতা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। প্রথম কথা এই যে, স্ত্রীদের সৃষ্টি হয়েছে আমাদেরই নিজ অস্তিত্ব থেকে, অর্থাৎ উভয়কে একই উপাদানের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে– এভাবে নারী ও পুরুষ উভয়েই, অর্ধেক মানুষ। উভয়ের মিলনই উভয়কে পূর্ণতা দান করে। দ্বিতীয় কথা হলো– স্বামীর শান্তির উদ্দেশ্যেই স্ত্রীর সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রী হচ্ছে শান্তির প্রতীক। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, বিয়ের আধ্যাত্মিক ও মানবিক উপকার সৃষ্টি পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়ার। এ তিনটি সত্যতার ওপর চিন্তা করলে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের বিভিন্ন দিক যেভাবে পরিলক্ষিত হয় তাতে আমাদের মন-মগজ ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

কাজেই আমরা এসব উপলব্ধির সমাপ্তী রেখা টানতে পারি আয়াতের শেষ বাক্যাংশটির মাধ্যমে-

"নিঃসন্দেহে এর মধ্যে অনেক নিদর্শনাবলি রয়েছে ওসব লোকদের জন্যে যারা চিন্তাভাবনা করে।" (সূরা রুম : আয়াত-২১)

এমনিতে বিধিসম্মত বিয়ের প্রচলন দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ্ বিশ্বজাহানের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ঈমান ও চরিত্র উপলব্ধির অসাধারণ শক্তিও দান করেছেন। আসলে এটাই হলো মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরই ফলে প্রেম-ভালোবাসার আবেগ-অনুভূতি ও দয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ একদিকে যেমন জৈবিক প্রবণতা ও প্রবৃত্তির অধিকারী তেমনিভাবে তাকে আধ্যাত্মিক গুণবৈশিষ্ট্য দান করে বিশেষ উন্নত মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্বও দান করা হয়েছে। এ বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা দানের মাধ্যমে তাকে সৎকর্ম বা অসৎকর্মের মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্য করার বিশেষ জ্ঞান অনুভূতিও দেয়া হয়েছে। মানবতার ওপর আল্লাহর এটা বিশেষ নিয়ামত যে, তাকে একই সাথে জৈবিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমৃদ্ধশালী করেছেন। আল্লাহর জৈবিক দিক থেকে মানুষকে নারী ও পুরুষে বিভক্ত করেছেন এবং সামান্য দৈহিক পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়কে পরস্পরের সুখ-দুঃখ বুঝতে পারে।

আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়কেই উন্নত ও মহত্তর গুণবৈশিষ্ট্য দান করে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবে নারী ও পুরুষ হিসেবে কাঠামোগত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও মানবিক ও আধ্যাত্মিকভাবে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা বৈপরীত্য নেই। নারী ও পুরুষ উভয়ে একই গুণ ও মর্যাদার অধিকারী। দৈহিক কাঠামোর দিক থেকে নারী ও পুরুষ বৈদ্যুতিক তারের পজেটিভ ও নেগেটিভের মতো স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হলেও অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষের গুরুত্ব অভিন্ন।

আমরা ইতিমধ্যেই নারী ও পুরুষের 'জৈবিক বৈশিষ্ট্যে'র পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছি যে, মানুষের মানবিকতার অপরিহার্য দাবি হলো- নারীর কাছ থেকে শান্তি অর্জন করা।

যেমন আল্লাহ্ বলেছেন-

"তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদেরই অস্তিত্ব থেকে স্ত্রীসমূহের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা শান্তি লাভ কর।" (সূরা রুম : আয়াত-২১)

এ স্থানে শান্তিটাকে পুরুষদের প্রাপ্য বিষয়ে পরিণত করার ব্যাপারটি অতি গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এর অর্থ যৌনতৃপ্তির অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভাষাগত দিক থেকে এই অর্থ নেয়া যেতে পারে না।

বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী এ 'শান্তিকে' আধ্যাত্মিক ও আন্তরিক শান্তির অর্থে গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া নিছক যৌন তৃপ্তিই যদি এর প্রকৃত অর্থ হতো তাহলে তা কেবল পুরুষের প্রাপ্য বিষয়ই হবে কেন? কারণ যৌনতৃপ্তি তো নর-নারী উভয়েই লাভ করে থাকে। কিন্তু আয়াতে শুধু এক পক্ষকে অন্য পক্ষের কাছ থেকে শান্তি লাভের কথা বলে আসলে আধ্যাত্মিক শান্তি অর্জনের ব্যাপারই স্পষ্ট করা হয়েছে। এখানে দৈহিক যৌনতৃপ্তির অর্থ অপ্রাসঙ্গিক বাতুলতা মাত্র। এটা এজন্যেই বলা হয়েছে যাতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, তাহলো স্বামী-স্ত্রীর যৌবন ঢলে পড়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে এক অনবদ্য আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জীবনের শেষ পর্যায়ে গিয়ে যখন উভয়ের মধ্যে সবরকম যৌনকামনা-বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটে তখন তাদের মধ্যে এক নতুন হৃদ্যতা সখ্যতা গড়ে ওঠে যা স্বামী-স্ত্রীর শেষ জীবনকে করে তোলে প্রশান্ত-মধু থেকে অতিমধুর, আর এ সম্পর্ক এতই স্থিতিশীল হয়ে ওঠে যে, পৃথিবীর কোনো শক্তিই তার মাধুর্যকে বিনষ্ট করতে পারে না। এছাড়া আয়াতে বর্ণিত শান্তি লাভের যে ফলাফল দেখানো হয়েছে তা বংশ বিস্তার নয় বরং ভালোবাসা ও দয়া মায়া-মহব্বত। এ থেকেও তার আধ্যাত্মিক দিক ভেসে ওঠে।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা, বিবাহের উপকারিতায় বুঝিয়েছেন যে এতে করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা এবং দয়া-সহানুভূতি জাগ্রত হয়। এভাবে আল্লাহ মানুষকে মানবিকতার সাথে সংস্পর্শ চান এবং তাদের মধ্যে এতটুকু নৈকট্য প্রতিষ্ঠা করতে চান যে তারা চিন্তা-ভাবনা ও মন-মানসিকতার দিক থেকে একাত্ম হয়ে একাকার হয়ে যাবে। আর এভাবেই তাদের মধ্যে সত্যিকার প্রেম ভালোবাসা ও দয়া-সহানুভূতির সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহর এ বাণী অনুযায়ী মানুষের সত্যিকার কল্যাণ ও উন্নতির জন্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থেকে উৎসারিত এ প্রেম ভালোবাসা এবং দয়া ও সহানুভূতি একান্তই অপরিহার্য।

এটা একটা স্পষ্ট বাস্তব কথা যে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ও মিলন একান্তই জরুরি। একাকী ওদের কেউই সেই স্নেহ মমতা ও উদার মননশীলতার অধিকারী হতে পারে না যা সন্তান লালন-পালনের জন্যে সহায়ক প্রমাণিত হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর এ মিলন স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত। তাই আল্লাহ তা'আলা এটাকে বৈবাহিক বিধির আকারে আমাদের এখতিয়ারাধীন করেছেন। এ থেকে সেই শান্তি অর্জিত হয় বা পূর্ব বর্ণিত আয়াতে ইঙ্গিত পেশ করা হয়েছে।

এটা এমন এক বাস্তব সত্য যাকে ইসলাম বিবাহের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করেছে এবং প্রত্যেকের জন্যে এটা অবশ্য কর্তব্য যে, বর্ণিত উপকার লাভের জন্যে সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করবে যার দিকে আয়াতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। কারণ তা মানুষের দৃষ্টিতে সম্মানজনক করে দেয়া হয়েছে এবং তাতে করে সমাজে উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো কোনো কোনো লোক স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম আপত্তিও তুলে থাকে। অথচ সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের আপত্তির মূলে মূর্খতাই কাজ করে থাকে। কারণ বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু যৌন তৃপ্তি লাভ করাই নয়, বরং এর মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে এক ধরনের আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা প্রেম-প্রীতির বন্ধনে একাত্ম হয়ে যায়। এটাই সৌন্দর্য, এটাই শান্তি এটাই সুখ এবং এটাই তৃপ্তি, কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে এ সত্যের বাস্তবতাই উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিয়ে ও সামষ্টিক স্বভাব

মানুষ এক সামাজিক জীব, কিন্তু তার আত্মব্যক্তিত্বের উপলব্ধি তাকে সাধারণ জীবের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন করেছে। মানুষের মধ্যে সামষ্টিক জীবনযাপনের এবং সমাজকে সুসংগঠিত ও অগ্রগতির দিকে টেনে নেয়ার অসাধারণ আবেগ কার্যকারী থাকে যা অন্য কোনো জীবের মধ্যে পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় না। মানুষের এ আবেগ অনুভূতিকে যথার্থ পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ নবী-রাসূল ও সংস্কারদের প্রেরণ করেছেন। এরা ব্যক্তি বা সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ককে সঠিক পন্থায় সুদৃঢ় ও মজবুত করেন। আর প্রাচীন অতীতকাল থেকে আজকের এ আধুনিককাল পর্যন্ত– এটা সর্বজন স্বীকৃত কথা যে, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক সঠিক পন্থায় সুদৃঢ় করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। পারিবারিক সম্পর্ক ব্যক্তি ও সমাজের ওপর সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ইতিবাচক প্রভাব রাখে এবং এটাই হচ্ছে অত্যন্ত ফলপ্রসূ যথার্থ ব্যবস্থা।

বিবাহের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলো এই যে, মানুষ তার যৌন বাসনা পূরণের জন্যে একটি সীমারেখা প্রস্তুত করে নেয়। এর পর সে নিজের সীমা অতিক্রম

করে না। এভাবে সে তার স্বাভাবিক কামনা-বাসনাকে এক নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করে এবং নিজেকে নিজে কিছু বিধি-নিষেধের আওতাধীন করে নেয় যাতে অন্যের মানমর্যাদা অক্ষুণ্ন ও নিরাপদ থাকতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে এক পবিত্র কর্ম। এ পবিত্র কর্ম সম্পাদন করে সে নিজের সামাজিক জীবনকে করে মহিমান্বিত ও সাফল্যমণ্ডিত।

বিবাহের দ্বিতীয় উপকার হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও সহযোগিতার বিকাশ লাভ। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক তাদেরকে পরস্পরের সাথে সাহায্য সহযোগিতার বন্ধনকে মজবুত করে তোলে। দয়া-প্রেম ও সাহায্য-সহযোগিতার অনুভূতির মাধ্যমে তারা সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে পরস্পরের জন্যে ত্যাগ তিতিক্ষার মানসিকতা গড়ে ওঠে।

বিবাহের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এ হলো, প্রেমের আবেগে উদ্বেলিত স্বামী-স্ত্রী যখন পরস্পরের সাথে একত্রিত হয় তখন তাদের মধ্যে কোনো রকমের লৌকিকতা বা ইতস্ততঃ বোধ অবশিষ্ট থাকে না। ফলে তারা অকৃত্রিম প্রেমের অন্তহীন অন্তরীক্ষে মুক্ত কপোত কপোতীর মতো। আর ভালোবাসার সুখ সাগরে অবগাহন করে এবং এর ফলশ্রুতিতে যে সন্তানের আবির্ভাব ঘটে তার প্রতি তাদের যৌথ ভালোবাসার কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না। তারা তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসার ফসলের জন্যে জীবনের যে কোনো ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্যেও প্রস্তুত থাকে। এভাবে স্বাভাবিক ও সুস্থ পারিবারিক পরিবেশে গড়ে ওঠা সন্তানই সমাজের সৎ ও সক্রিয় সদস্যে পরিণত হয়। এভাবেই সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজের গোড়াপত্তন হয়– যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি পরস্পরের সহযোগিতা করে ও সামষ্টিক কল্যাণের জন্যে কাজ করে নিবেদিত চিত্তে। ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্যেও সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকে।

পারিবারিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য আরেক উপকার হলো– ব্যক্তি বিয়ের আগে নিজের স্বার্থেই আয় ও ব্যয় করে। বিয়ের পর এবং সন্তান অর্জনের পর তার মনে উদারতার সৃষ্টি হয়। এখন সে শুধু তার নিজের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে না বরং পত্নী ও সন্তানের সুখ-শান্তির কামনায় সে আরো সক্রিয় হয়ে ও সচেতন হয়ে ওঠে, এতে তার মধ্যে ইতিবাচক ও গঠনমূলক আবেগ ও আনন্দ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। আর এ জিনিসটাই হলো সুস্থ ও সুন্দর সামাজিক জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর।

বিয়ে ও যৌন প্রবৃত্তি

পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার দৈহিক গঠন পার্থক্যের বিচার-বিশ্লেষণ করলে বিশেষ করে নারীর প্রজনন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, স্রষ্টার দৃষ্টিতে নর ও নারীর যৌন তৃপ্তির বিষয়টি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং বিয়ে শাদীর আসল উদ্দেশ্যটা হলো মানববংশ বিস্তারের ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং তা এমন পন্থায় ক্রমবিকাশ দান করা যাতে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সফলভাবে অর্জিত হতে পারে।

যৌন তৃপ্তি অর্জনটা কোনো রকমের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়, আসলে তা হলো লক্ষ্য অর্জনের পথে এক পরিতৃপ্ত অনুভূতি লাভের উপায় মাত্র। এটাও একটা বাস্তব সত্য কথা যে মানুষ, বিশেষ করে নারীকে সন্তান প্রজনন ও তার লালন-পালনে যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়।

নারী-সমাজের এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

"আমরা মানুষকে উপদেশ দিয়েছি যে, তারা তাদের মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তার মা কষ্ট স্বীকার করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে জন্ম দিয়েছে এবং তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত ত্রিশ মাস অতিবাহিত করেছে।" (আহকাফ : আয়াত-১৫)

মানুষ স্বাভাবিকভাবে আরামপ্রিয়, এ কারণেই সে দুঃখ-কষ্টকে ভয় করে এবং এড়িয়ে চলতে চায়। যদি এ কর্মে তার জন্যে আনন্দের আকর্ষণ না থাকত তাহলে তার প্রতি চিরবিমুখ হওয়ার জন্যে তার প্রথম অভিজ্ঞতাই ছিল যথেষ্ট। এজন্যে আল্লাহ নর-নারীর মধ্যে বিশেষ এক আকর্ষণ দিয়ে রেখেছেন এবং মিলনের ভাবনাই তাদের মধ্যে আনন্দঘন উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং মিলনের তাড়নায় তারা প্রবল অস্থির হয়ে উঠে। যদি তাদের মধ্যে আল্লাহ এ বিশেষ আকর্ষণ ও আবেগ উত্তেজনার সৃষ্টি না করতেন তাহলে বংশ বিস্তারের ধারা ব্যাহত হয়ে পড়ত।

এজন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন–

"এখন তোমরা নিজ স্ত্রীদের সাথে রাত্রিযাপন কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা বৈধ করে দিয়েছেন তা অর্জন কর।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

এখানে কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার 'অর্জন করার' অর্থ বংশবিস্তারের অর্থে গ্রহণ করেছেন। (প্রমাণের জন্যে তাবারী, কুরতুবী ও বায়জারী শরীফ দ্রষ্টব্য)

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব

এতক্ষণ পর্যন্ত মহাপ্রকৃতি ও মানব সমাজের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা ভিত্তিক আলোচনা করা হলো। এবার বিয়ে-শাদী সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও নীতি-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করা যায়। এ ব্যাপারে কুরআনের দিকে ফিরে তাকালে আমরা অবলোকন করতে পাই যে, কুরআন বিয়েকে পরিবার ও সমাজের বুনিয়াদ বলে ঘোষণা করে এবং এটাকে মানুষের যৌনতৃপ্তি অর্জনের সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর উপায় বলে অভিহিত করে।

এ সম্পর্কে কুরআনের একটি বাণী হলো–

"তোমার আগেও আমরা অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, এবং তাদেরকে আমরা স্ত্রী ও সন্তানের অধিকারী বানিয়েছি।" (সূরা রায়াদ : আয়াত-৩৮)

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন–

"চারটি বিষয় হলো নবীদের ঐতিহ্য– এর মধ্যে একটি হলো বিয়ে।"

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী)

প্রিয়নবী বিয়েকে– "দ্বীনের অর্ধেক" বলে তার গুরুত্বকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন :

"যখন বান্দা বিয়ে করে নেয় তখন এভাবে যেন সে তার দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে।"

পবিত্র কুরআনে আরো ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে–

"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদের বিয়ে করিয়ে দাও।" (সূরা নূর : আয়াত-৩২)

বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম কুরতবী এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন :

"যার বিয়ে হয়নি তার বিয়ে করিয়ে দাও কারণ লজ্জাস্থানের নিরাপত্তার জন্যে এটাই পবিত্র ও উত্তম উপায়।"

নবীন যুবকদের প্রতি বিয়ের আহ্বান জানিয়ে প্রিয় নবী ﷺ বলেন–

"হে নবীনগণ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে সক্ষম তাদের বিয়ে করে নেয়াই অপরিহার্য, আর যারা তার ক্ষমতা রাখে না তারা বেশি করে যেন রোযা রাখে, কারণ রোযা যৌনবাসনা খর্ব করার উত্তমপন্থা।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসের মর্মার্থ এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি অতিশয় যৌন উত্তেজনা অনুভব করে এবং তার বিয়ে করার মতো ক্ষমতাও থাকে– অর্থাৎ স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্ব নিতে পারে তাহলে সে যেন বিয়ে করতে বিলম্ব না করে। কিন্তু এমন ব্যক্তি যদি স্ত্রীর ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয়ে থাকে তাহলে তাকে তার যৌন

উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে বেশি বেশি রোযা পালনের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এতে করে তার স্বাভাবিক যৌনবৃত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইমাম ইবনে হাজম ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত সক্ষম ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা ফরয, যদি কোনো স্বচ্ছল সক্ষম ব্যক্তি বিয়ে না করে থাকে তাহলে সে ফরয কর্তব্যে অবহেলার জন্যে পাপের ভাগী হবে। অন্য এক পক্ষের মতে বিয়ে ঠিক ফরয না হলেও ওয়াজিব অবশ্যই।

ইসলামে মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন ও তাগিদে বিয়ের ওপর যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তাতো জানা হলো। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মগুরু 'সেন্ট পল' কি অস্বাভাবিক কথা বলেছেন একটু ভেবে দেখুন। তিনি বলেন, "আমি চাই বিশ্বের সব মানুষ আমারই মতো জীবনযাপন করুন (অর্থাৎ সবাই অবিবাহিত থাকুক)। অবিবাহিতা বা বিধবা মহিলাদের জন্য আমার পরামর্শ হলো বিয়ে না করাই তাদের জন্যে উত্তম।" এর কারণ দর্শাতে গিয়ে সেন্ট পল বলেন, "অবিবাহিত ব্যক্তি সবসময় তার প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে আর বিবাহিত ব্যক্তি সবসময় নিজের স্ত্রীর চিন্তাতেই বিভোর থাকে।"

আর একই যুক্তি তিনি বিবাহিতা বা অবিবাহিতা মহিলাদের প্রসঙ্গেও পেশ করেছেন যে, "বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীকেই প্রধান গুরুত্ব দেয় এবং প্রভুতে গৌণ গুরুত্ব দেয় অথচ প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনকেই তার প্রধান গুরুত্ব দেয়া উচিত।" সেন্ট পলের মতে, পুরুষ যদি তার যৌন প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে বিয়ে করতে পারে কিন্তু তা উত্তম নয়। সেন্ট পল বলেন, "কোনো নারীকে পাওয়ার ইচ্ছাই মনে পোষণ করো না। কিন্তু যদি তুমি বিয়ে করেই ফেল তা যেকোন উর্বশীর সাথেই কর না কেন– তাতে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়, তাদের জীবন আবর্জনাময় হয়ে যায় এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে সেই আশংকাবোধ করি।"

এর অর্থ হলো, সেন্ট পলের মতে বিয়ে করার ইচ্ছে করাটাই অনুচিত, কারণ তাতে আল্লাহর স্মরণে অবহেলা আসে। তাই তিনি বিয়েকে উত্তমপন্থা মনে করেন না। তাঁর এ কথা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত বা মানব প্রকৃতি ও স্বভাবের সাথে এর কোনো মিল বা অস্তিত্ব আছে কিনা তা সত্যিই প্রশ্নের জন্ম দেয়। তাছাড়া সেন্ট পলের কথা মতো যদি বিয়ে-শাদীর স্বাভাবিক পন্থা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মানববংশ বিস্তারের বৈধ পন্থা কি হবে? এতে করে কি সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলা এবং যৌন ব্যাভিচার ও অনাচার বৃদ্ধি পাবে না? যেমন পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান সমাজে আজ বলাৎকার মহামারীর আকার ধারণ করেছে।

বিয়ের নীতি ভঙ্গ– তার প্রভাব ও ফলাফল

সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করা পাপ : পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা মোতাবেক বিয়ে হলো মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন। এতে করে বৈধ উপায়ে মানুষের স্বাভাবিক যৌনতৃপ্তি অর্জিত হয় আর বিয়ে হলো পরিবার ও সমাজের বুনিয়াদ। ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যেকার প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও সহযোগিতার বুনিয়াদও হচ্ছে বিয়ে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো মানব অস্তিত্বের স্থায়ীত্বের জন্যে বিয়ে অতি অপরিহার্য। আর কেবল বিয়ের মাধ্যমেই যেকোন মানুষ তার লজ্জাস্থানের পবিত্রতা ও শালীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম।

বিয়েকে অস্বীকার করার মানে হলো মানবতার মূল অস্তিত্ব ও তার বিকাশকেই অস্বীকার করা, এর যাবতীয় সুফল থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে বঞ্চিত করা এবং স্বভাবকে তার গলা টিপে হত্যা করা। এরপরেও যদি কোনো সক্ষম ব্যক্তি বিয়ে করা থেকে নিবৃত থাকে তাহলে তার পরিষ্কার অর্থ হলো লোকটি শেষ দরজার আহাম্মক ও মূর্খ। জীবনের উদ্দেশ্য ও চাহিদা সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞানই নেই।

প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ জীবনের এক স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন–

"যে ব্যক্তি সম্পদশালী হয় এবং বিয়ে করার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (বায়হাকী)

অবিবাহিত জীবন ও তার অপকারিতা

প্রাচীন সমাজে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিকভাবে অপূর্ণ মনে করা হতো এবং তাকে খোদার নৈকট্য লাভের অযোগ্য মনে করা হতো। সুতরাং সে যুগের সাধু ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের জন্যে সংসারধর্ম বর্জনকে জরুরি মনে করত। তারা সব রকমের পার্থিব তৎপরতা থেকে নিজেকে পৃথক করে নিয়ে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে পড়ত। এ জন্যে তপজপকারী ব্যক্তি বিয়ে শাদীর ঝামেলায় পড়তে চাইত না। কেননা তাদের মতে, এতে করে মানুষের আবেগ উজ্জীবিত হয়ে উঠে এবং মানুষ সংসার বিরাগী থেকে সংসারমুখী হয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলাম প্রাচীন অন্ধকার যুগের সেই বাতিল ও ভুল ধারণাকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করে দেয় এবং বিয়েকে পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের উত্তম মাধ্যম বলে ঘোষণা করে।

প্রিয়নবী ﷺ এ সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলেন–
"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে পূর্ণ পবিত্রতার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহী তার স্বাধীন মহিলাদের সাথে বিয়ে করা উচিত।"

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, খ্রিস্টানধর্ম তার প্রথম যুগে অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর আমলে, কখনও বিয়ে বিরোধী ছিলেন না, অনেক পরে জানিনা তাদের পণ্ডিত সমাজ কোথা থেকে এটা আবিষ্কার করে বসল যে, "বিয়ে খোদার নৈকট্য লাভের অন্তরায়।" কাজেই তারা তাদের ব্যক্তিগত ধারণাকে ধর্মের নামে চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস পায়। তারা কিছুদিন পর্যন্ত বিয়েকে আবশ্যকীয় গণ্য করার ব্যাপারে ইতস্ততা প্রকাশ করতে থাকে। প্রথম যুগে বিয়ে করা বা না করার ব্যাপারে ইতস্ততা প্রকাশ করতে থাকে।

প্রথম যুগে বিয়ে করা বা না করার ব্যাপারে সব খ্রিস্টান স্বাধীন ছিল। কিন্তু চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে আলফিরা নামক খ্রিস্টানদের একটি ক্ষুদ্র দল স্পেনে একটি প্রস্তাব পাশ করে এবং এর মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্ম নেতাদের ওপর আইনগনভাবে বিয়ে করতে নিষেধ জারি করে। এ সময় খ্রিস্টান বৈরাগী সন্ন্যাসীদের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পেতে লাগল তারা কেউ গির্জায় এবং কেউ বনে-জঙ্গলে বা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আস্তানা গড়ে তুলে। এর মাধ্যমে তারা যৌন প্রবণতাকে দমন করে খোদার নৈকট্য লাভের পথ অনুসন্ধান করে। ইসলামের আবির্ভাবের পর সংসার বৈরাগীদের সেই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করে কুঠারাঘাত করা হয় এবং খোদার নৈকট্য লাভের সেই অস্বাভাবিক প্রচেষ্টাকে বাতিল বলে ঘোষণা করে।

আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে–
"এবং সন্ন্যাসবাদ তারা নিজেরাই আবিষ্কার করে নেয়, আমরা তা' তাদের ওপর ফরয করিনি"। (সূরা হাদীদ : আয়াত-২৭)

প্রিয় নবীও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন–

"ইসলামে বৈরাগ্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।"

প্রিয় নবী ﷺ মুসলমানদেরকে সন্ন্যাসবাদ বা বৈরাগ্যের পন্থা থেকে বিরত রাখেন। এজন্যে প্রিয়নবীর প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ সুন্নাতকে অস্বীকার বা অমান্য করার কোনো বৈধতা থাকতে পারে না।

অন্যদিকে প্রিয়নবী সন্ন্যাসবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ইঙ্গিত করে ঘোষণা করেন–
"আমার উম্মতের সন্ন্যাস হচ্ছে হিজরত, পাপ ও মন্দ কর্ম থেকে হিজরত; জিহাদ, রোযা, নামায, হজ্জ এবং উমরা।" (বুখারী ও মুসলিম)

প্রিয়নবীর জীবদ্দশায় কিছু লোক তাঁর ইবাদতের নিয়ম জানার জন্য এগিয়ে এলো। যখন তাদেরকে প্রিয়নবীর ইবাদতের পদ্ধতি সম্পর্কে বোঝানো হলো তখন তারা এটাকে অপর্যাপ্ত ভেবে বললেন তিনি তো নবী, তাঁর সব গুনাহই মার্জনা করা হয়েছে। অতএব আমাদেরকে আমাদের বিষয়ে ভাবতে হবে। তাদের একজন বলল, আমি তো সারারাত সালাত আদায় করব। অন্য একজন বলল : আমি অব্যাহতভাবে রোযা পালন করব। তৃতীয়জন বলল, আমি জীবনে বিয়েই করব না।

প্রিয়নবী যখন একথা জানতে পারলেন তখন তিনি তাদের কাছে এসে বললেন– "তোমরা এমন কথা বলেছ! শোন, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের চেয়ে বেশি নিজ প্রতিপালককে ভয় করি এবং সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু; কিন্তু আমি রোযা রাখি আবার রাখি না; রাতে সালাত পড়ি আবার পড়ি না, নিদ্রাও যাই এবং মহিলাদেরকে বিয়েও করি এবং এটাই আমার সুন্নাত। যারা আমার সুন্নাতকে উপেক্ষা করবে তারা আমার দলভুক্ত নয়।"

যৌন নোংরামী ও তার কুফল

এতক্ষণ পর্যন্ত সেসব লোকদের বিষয়ে আলোচনা করা হলো যারা বিয়েকে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতাবিরোধী মনে করে অর্জন করে থাকে। এখন সেসব লোকদের ব্যাপারে আলোচনা করা হলো যারা ব্যভিচার ও নিত্য-নতুন যৌন বিলাসিতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় বিয়ের পথ পরিহার করে চলে। তারা মনে করে বিয়ে করলে পরে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সাথে যৌন সম্ভোগ করতে পারবে না।

ব্যভিচার ও যৌন বিলাসিতার এ ঘৃণ্য প্রবণতাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছে আধুনিক জড়বাদী সভ্যতা। আর এর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকা। ঐসব পাশ্চাত্যে দেশগুলো তথাকথিত অবাধ স্বাধীনতার নামে যুবক-যুবতীদের যথেচ্ছ যৌন অনাচার সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার দর্শন ও শিক্ষা অনুযায়ী মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হলো ধন-সম্পদ, যশ, খ্যাতি এবং এ সবকেই উন্নতির মানদণ্ড মনে করা হয়। আধুনিক জড়বাদী সভ্যতা আধ্যাত্মিক তথা নৈতিক, চারিত্রিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে এবং এখানে অশ্লীলতা ও শালীনতার কোনো স্থান নেই। লজ্জাশরমের চিন্তা এখানে একান্তই গৌণ।

প্রতিটি মানুষ এখানে লাগামহীন অবাধ স্বাধীন, যার যা ইচ্ছা সে তাই অনায়াসে করতে পারে– ব্যস্, দেশ ও জাতির স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ না করলেই হলো।

এ লাগামহীন ব্যক্তিস্বাধীনতার ফলে গোটা পাশ্চাত্য সমাজে অবাধ যৌন নোংরামীর এক অপ্রতিরোধ্য বিস্তার লাভ করে। পাশ্চাত্যের প্রতিটি ব্যক্তি এমনকি নামীদামী লোকেরাও আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী লোকেরা নিজেদেরকে স্ত্রী-পরিবার ও সমাজের বন্ধন থেকে মুক্ত মনে করে বেশ্যা-পতিতা ও আধুনিকা কলগার্লদের সাথে যৌন নোংরামীতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি তাদের বিবাহিত নরনারীরাও প্রকাশ্যভাবে অন্য নরনারীদের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন বৈধ ও স্বাভাবিক মনে করে। মৌমাছি যেমন এক ফুলের রস চুষে নেয়ার পর অন্য নতুন ফুল ধরে– পাশ্চাত্যের নরনারীরাও তদ্রূপ। প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন দেহই তাদের যৌন কামনার একমাত্র বস্তু। আর তার জন্যে দারকার হলে কাউকে খুন করতেও তাদের বিবেকে এতটুকু বাধে না। ঘৃণা যৌন স্বেচ্ছাচারিতার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসেবে পাশ্চাত্যে পারিবারিক ব্যবস্থা তার সম্পূর্ণ কাঠামোসহ ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। ইউরোপ আমেরিকায় এ অবক্ষয় চলছে বেশ কয়েক যুগ ধরে আর তা দিন দিন ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। তাদের এ পাপাচার ও নোংরামীর ঢলে শুধু তারাই ডুবছে না বরং তাদের অন্ধ অনুকরণকারী অন্যান্য দেশের জনগণও ডুবে মরছে।

অধুনা পাশ্চাত্যের কোনো কোনো পরিণামদর্শী চিন্তাবিদ আজকাল আশংকার শেষ সতর্ক ঘণ্টা বাজাতে শুরু করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, পারিবারিক ব্যবস্থার অবসান ঘটলে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্যে অন্য কোনো উপায় থাকবেই না। তাদের মর্মান্তিক পরিণাম অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের বিখ্যাত চিন্তাবিদ মার্শাল বেটন বিশ্বযুদ্ধের পর নিজের জাতিকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন : "নিজেদের ভুলভ্রান্তিতে ভালো করে পরিমাপ করে নাও, কারণ তোমাদের পাপ অপরাধের পাল্লাকেই অধিকতর ভারী দেখাচ্ছে। তোমরা নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধকে পদদলিত করেছ। যৌন নোংরামীর পিছনে তোমরা বেপরোয়াভাবে ছুটে চলেছ, এখন দেখতে থাক যে তোমাদের যৌন নোংরামী তোমাদেরকে কোনো নিয়মের মুখোমুখি করে দিচ্ছে।"

ইসলাম, গোটা বিশ্বমানবতাকে এ ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচানোর জন্যে তাদের যথার্থ শিক্ষিত ও সুসভ্য বানাতে, তাদের সত্যিকার মানবতার পথ দেখাতে এবং তাদেরকে আসল আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে– সেই উচ্ছৃঙ্খল নোংরামীর উৎসকেই বন্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম যৌন নোংরামীতে অভ্যস্ত নারী ও পুরুষের জন্যে এমন কঠিন শাস্তির বিধান জারি করেছে যার কল্পনা করলেও তাদের লোমহর্ষ জাগবে। এমনকি কোনো কোনো

অবস্থায় যৌন অপরাধের জন্যে প্রাণদণ্ড দানের বিধানও রয়েছে। ইসলাম সমাজকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন এবং প্রত্যেক মানুষের মান-মর্যাদার নিরাপত্তা বিধানের বৃহত্তর স্বার্থে এ জরুরি আইনবিধি প্রবর্তন করেছে। এতে করে সাধারণ মানুষ যৌন অপরাধীদের পাশবিক হামলা থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ সুন্দরভাবে জীবনযাপনের অবাধ সুযোগ পাবে।

এ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম এ কঠোর শাস্তি নিছক দু'জন অপরাধীকে এ জন্যেই দেয় না, যে তারা কিছুক্ষণের জন্যে অবৈধ স্ফূর্তিতে মেতে উঠেছিল, বরং সমাজকে সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচানোই তার আসল উদ্দেশ্য, যা এ অপরাধের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা ও তার ক্ষতিকর প্রভাব

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে চিন্তাধারার ধ্বজাধারী তা তার নিজের কথায় চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা এবং বস্তুগত আরাম-আয়েশ এ দুটি বিষয়কেই তারা সম্পূর্ণ মানবগোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্য বলে বলতে চায়। আর এ উদ্দেশ্যে তারা যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে তৈরি। পশ্চিমা সভ্যতার পতাকাবাহীরা কোনো নীতি-চরিত্রের ধার ধারে না বা এমন কোনো ঈমান-বিশ্বাসকে বিবেচনাযোগ্য মনে করে না যা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে। তারা যা দেখে না– তা মানে না।

পাশ্চাত্যের এ বস্তুপূজারীরা কোনো অদৃশ্য সত্তার শক্তিকেও স্বীকার করে না; তাদের কোনো রিযিকদাতা, কোনো স্রষ্টা বা মালিক বা মৃত্যুর পর কারো দরবারে হাজির হতে হবে বলে বিশ্বাসকেও তারা অবিশ্বাস করে। স্রষ্টা যে তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, জীবন-যাপনের অবলম্বন দান করেছেন; সুখ-দুঃখ আর বিপদ আপদে, অথবা চরম নৈরাশ্যের অবস্থায় মানুষকে যে কোনো মহান শক্তি সাহায্য করেন– তাও তারা স্বীকার করে না। তারা এ বাস্তবতাকেও স্বীকার করে না যে, দুনিয়ার সব প্রাণীকে তাদের স্রষ্টা আহার যোগান এবং তাদের জীবন ধারণের সব আয়োজন স্বাভাবিকভাবে বিন্যস্ত করে রেখেছেন। মোটকথা, প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অগোচরে কোনো অস্তিত্বকে, কোনো শক্তিকে, কোনো স্রষ্টাকেই তারা বিশ্বাস করে না এবং স্বীকার করে না।

এ অবিশ্বাস আর অস্বীকারই হলো তাদের স্বার্থপ্রীতি আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চরম নৈরাশ্য ও উদ্বেগের একমাত্র মূল কারণ। বস্তুগত দিক থেকে সবকিছু পেয়েও তারা অসন্তুষ্ট ও বিচলিত– অস্থির এবং বিয়ের দায়িত্ব গ্রহণ ব্যতীতই যৌন সম্ভোগের যে পাশবিক প্রবণতা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার কারণও একই। এমতাবস্থায় তারা বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনে রাজী হবে, তা কি চিন্তা করা যায়?

আসলে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা এক দুরারোগ্য এক মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে, যা তার রোগীকে কেবল বিয়ে করার স্বাভাবিক পথ থেকেই অবরুদ্ধ করছে না বরং তার মানবিক অস্তিত্বকেও বিকৃত করে দিচ্ছে। এতে করে তারা সৎভাবে জীবনযাপনের পদ্ধতি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এটা এমন অনস্বীকার্য সত্য কথা যার সম্পর্কে যুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে। এ ভুল ও বিকৃত বুনিয়াদের উপর কোনোদিন কোনো সভ্যতা পূর্ণ সভ্যতারূপে গড়ে উঠতে পারে না। বস্তুত, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যতই চাকচিক্যময় ও লাবণ্যময় বলে মনে হোক না কেন আসলে তার ভিত্তি খুবই ঠুনকো, খুবই নড়বড়ে। এ থেকে কোনো প্রকৃত সুফলের আশা করা শুধুই নিরাশা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার সৃষ্ট নানারকম জটিল ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা হলো তারা জেনে-শুনে, কথায় ও কাজে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং দ্বীনের ওপর কার্যকারী বিশ্বাস স্থাপন করবে। একমাত্র ঈমানই তাদেরকে সকল দুষ্কর্ম ও তার ক্ষতিকর প্রভাব এবং ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে। ঈমান তাদেরকে এ অনুভূতিও দান করবে যে, এ ধনসম্পদ সবকিছু অস্তবেলার ছায়ার মতো– যা এক নির্ধারিত আইন অনুযায়ী সব মানুষের কাছে পৌঁছবে এবং কেউ শুধু ততটুকুই পাবে– যা তার প্রতিপালক তার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

এ সম্পর্কে মানুষের স্রষ্টা স্পষ্টতঃই বলেছেন–
“এ তো যুগের উত্থান-পতন মাত্র, যা আমরা মানুষের মধ্যে আবর্তিত করতে থাকি।” (সূরা-আলে ইমরান : আয়াত-১৪০)

প্রকৃতপক্ষে ঈমানই হচ্ছে সেই আলো যা থেকে আশার কারণ প্রস্ফুটিত হয়। এখানে দুষ্কর্ম ও দুশ্চিন্তার কোনো স্থান নেই। এখানে নেই কোনো নৈরাশ্য, কোনো অরাজকতা আর কোনো বিশৃঙ্খলা। এ প্রসঙ্গে কুরআনের একটি আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে নিতান্তই যৌক্তিকতার সাথে মানুষকে সুকৃতির জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–
“তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদের বিয়ে করিয়ে দাও। তারা যদি দরিদ্র হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ নিজ দয়ায় তাদেরকে ধনী করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত উদার ও মহাজ্ঞানী।”

(সূরা নূর : আয়াত-৩২)

কুরআনের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন–
"যে অবিবাহিত, তোমরা তার বিয়ে করিয়ে দাও এবং এ ব্যাপারে দারিদ্র্য বা অভাব-অনটনের ভিত্তিতে বিলম্ব করা আদৌ ঠিক নয়। কেননা সব ব্যাপারে আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত এবং তিনি নিজেই উদারতা ও বদান্যতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। (ইবনে কাসীর– তৃতীয় খণ্ড)

বলাবাহুল্য, এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং সব মুসলমান আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী ও পূর্ণ আস্থাবান। আল্লাহ যে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন তাতে কোনোরকম সন্দেহ নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) প্রায়ই বলতেন যে, "তোমাদেরকে আল্লাহ বিয়ে করার যে আদেশ দিয়েছেন তোমরা তা পূরণ কর; আল্লাহ তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।" এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) বলেন : "আমি অত্যন্ত বিস্মিত যে লোকেরা বিয়ে করে ধনী হচ্ছে না কেন, অথচ আল্লাহ বলেছেন : "তারা যদি দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ নিজ দয়ায় ধনী করে দেবেন।"

এ বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা বিয়ে না করার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আরো সতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিয়ে ব্যতীত কোনো সমাজই বিপথগামী ও ব্যভিচার থেকে মুক্ত হতে পারে না। কেবল বিয়ের মাধ্যমেই সমাজে সততা ও পবিত্রতার সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এরই মাধ্যমে আসতে পারে প্রকৃত সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি।

আল্লাহ এসব গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তির জন্যে সমৃদ্ধি দানের প্রতিশ্রুতি দেন। এর পরিপন্থী পথে চলে, সমাজে নৈতিক ও চারিত্রিকভাবে দেউলিয়া হয়ে এবং বিপুল ধনসম্পদের মালিক হওয়ার পরেও চরিত্রহীন ও অবিশ্বাসী লোকেরা নিজেদেরকে বড্ড অভাবী ও অসন্তুষ্ট মনে করে। বস্তুত, ঈমানই মানুষকে প্রকৃত সম্পদ ও সন্তুষ্টি দেয় আর ঈমান ব্যতীত কেউ কোটিপতি হলেও জীবনের সুখ-শান্তি ও সন্তুষ্টি থেকে সে বঞ্চিত থাকে। ঈমানদার মানুষের সমাজকে বলা হবে সৎ ও সুস্থ সমাজ আর ঈমানবিহীন সমাজকে বলা হবে নোংরা শয়তানী সমাজ। এ উভয় তুলনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের ব্যাপারে উৎসাহিত দান করে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ ক্ষমা ও দয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ অত্যন্ত উদারহস্ত ও মহাজ্ঞানী।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-২২৮)

বিয়ের নির্বাচন

স্ত্রী নির্বাচন : যখন কোনো ব্যক্তি এ কথাকে খুব ভালো করে জেনে বুঝে নেয় যে বিয়ের নীতি এক অপরিহার্য নীতি ও বিধি এবং এটা তার স্বভাবেরই চাহিদা– তখন প্রকৃত অর্থে সে বাস্তব সত্যতা অনুভব করে নেয়। আর এভাবেই সে সেই পন্থার অনুসন্ধান লাভ করে যা তাকে ইহকাল ও পরকালের জীবনকে মহা সাফল্যমণ্ডিত করে।

বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব অস্তিত্বের ধারা অব্যাহত রাখা, বৈধভাবে যৌন তৃপ্তি অর্জন এবং স্নেহ-ভালোবাসা, সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ সেবাভিত্তিক সুস্থ সমাজ জীবন গড়ে তোলা। এ জন্যে একজন উত্তম স্ত্রী কেবল সেই নারীই হতে পারে, যে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনও সজাগ রয়েছে এবং উত্তম পন্থায় তার স্ত্রী সুলভ দায়িত্ব পালনে সক্ষম, নীতি, চরিত্র ও জ্ঞান বুদ্ধিতে হবে সে নারী আদর্শস্থানীয়া। সুতরাং এমন স্ত্রী নির্বাচন করা উচিত যার অন্তর হবে ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত। কাজে কথায় ও কাজে হবে যথার্থ মুসলিম। যার চরিত্র হবে উন্নত, যে শিক্ষায় ও সততায় হবে সুন্দর, শ্লীলতা-শালীনতা, পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদার ব্যাপারে যে হবে সচেতন ও সজাগ।

ধন-সম্পদের মান : সমাজে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যারা জীবনের আসল সুখ-সমৃদ্ধি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তারা মূর্খতাবশত, সব সময় অন্যের ধনসম্পদ ও টাকাকড়ির দিকে লালসার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এবং বিয়ের মাধ্যমে ধনসম্পদ ও টাকা-পয়সা পাওয়ার লোভনীয় মানসিকতা তৈরি করে। এরা কেবল ওসব পাত্রীর অনুসন্ধান করে বেড়ায় যেখান থেকে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বলাবাহুল্য লালসার এ দৃষ্টিকোণ একান্তই নীতি বিরোধী বিবেক শূন্য জ্ঞানী এবং এতে করে কোনোদিন দাম্পত্য জীবনের সুফল পাওয়া যায় না। এতে করে বিয়ের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। এ ধরনের লোভী ব্যক্তি সামান্য স্বার্থের জন্যে জীবনের আসল সুখসম্পদ থেকে নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করে।

এ সম্পর্কে প্রিয়নবীর একটি বাণী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন–
"তোমরা ধন-সম্পদের ভিত্তিতে নারীদের বিয়ে করো না, কেননা এতে করে তাদের অবাধ্য হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।" (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

বংশ মর্যাদা : কোনো কোনো লোক পাত্রীর বংশমর্যাদা বা সমাজে তার পরিবারের সম্মান বা প্রভাব প্রতিপত্তির দিকে গুরুত্ব আরোপ করে। তারা শুধু সেই মেয়েকেই বিয়ে আগ্রহী, যার বংশ মর্যাদা বা পারিবারিক প্রভাব প্রতিপত্তি

রয়েছে। কিন্তু এটাও চরম ভ্রান্তিপূর্ণ প্রথা ও মানসিকতা। এ ধরনের মানসিকতা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। তারা হয়তো জানেনা যে এ পার্থিব মান-মর্যাদার কোনো গুরুত্ব নেই। এটা খুবই ঠুনকোহীন মর্যাদা।

এ সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন–
যে ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে বিয়ে করে– আল্লাহ তাকে আরো নিকৃষ্ট করে দেন। (সর্বজনস্বীকৃত সহীহ হাদীস)

রূপ-লাবণ্য : আবার কোনো কোনো ব্যক্তি তাদের পাশবিক মনোবৃত্তির ভিত্তিতে মেয়ের বাহ্যিক রূপ লাবণ্যকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এরা বাহ্যিক রূপেরই মোহগ্রস্ত। আসলে আসল রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে এরা কিছু জানেনা অথবা রূপ-সৌন্দর্যের অর্থই তারা বোঝে না। নারী মানুষ মাত্র। আর মানুষের প্রকৃত রূপ ও সৌন্দর্য হচ্ছে তার মানবিক বৈশিষ্ট। যার চরিত্র-ব্যবহার উত্তম এবং যার অন্তরের রূপ ও সৌন্দর্য আছে– আসলে সেই হচ্ছে প্রকৃত রূপসী ও সুন্দরী।

প্রিয়নবী স্ত্রী নির্বাচন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন–
"দ্বীনদার নারীর সাথে বিয়ে করো, তোমার কল্যাণ হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

এক ব্যক্তি প্রিয়নবীর কাছে একে জিজ্ঞেস করল– "আমি এমন এক মহিলাকে পছন্দ করি যে খুবই সুন্দরী রূপসী এবং উচ্চ পরিবারের মেয়ে কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করব? প্রিয়নবী তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করলেন। লোকটি আরেকবার এসে একই প্রশ্ন করল; প্রিয়নবী আবারও নিষেধ করলেন।

লোকটি তৃতীয়বার প্রিয়নবীর কাছে একই প্রশ্ন নিয়ে এলে প্রিয়নবী তাকে উপদেশ প্রদান করে বললেন–
"প্রেমময়ী ও একাধিক সন্তান উৎপাদন সক্ষম মহিলার সাথে বিয়ে করো– আমি যেন কিয়ামতের দিন তোমার জন্য গর্ব করতে পারি।"

স্বামী নির্বাচন

একজন যথার্থ স্বামীর যোগ্যতা ও মান নির্ভর করছে তার চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলির ওপর। এজন্যে স্বামী নির্বাচনের সময় নারীকে তার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গীর চারিত্রিক ও ঈমানী বৈশিষ্ট্যকে সামনে রাখতে হবে। প্রকৃত ঈমানদার এবং চরিত্রবান ব্যক্তিই উত্তম স্বামী হওয়ার প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। এছাড়া যারা ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য ইত্যাদিকে বেশি প্রাধান্য দেয়া তারা আসলে নিজেদের হীন মানসিকতারই পরিচয়ই উপস্থাপন করে। নারীর বিবেচনা করার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে লোকটি সুস্থ ও চরিত্রবান মানুষ কিনা। আর পুরুষের সবচেয়ে উৎকৃষ্টগুণ হচ্ছে তার খোদাপ্রেম ও খোদাভীরুতা। ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে যোগ্য ও মর্যাদানে ব্যক্তি হচ্ছে ঈমানদার ও পরহেযগার ব্যক্তি।

এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হচ্ছে–
"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানী আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে।"

এজন্যে যে ব্যক্তি ঈমানদার, চরিত্রবান, শিক্ষিত, মিষ্টভাষী, ভদ্র এবং পরোপকারী, সেই সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি– তা তার পারিবারিক ও বংশ মর্যাদা যাই হোক না কেন, তার দেহের বর্ণ যাই হোক আর পেশা যাই হোক না কেন– সে যে কোনো পরিবারের যে কোন মেয়ের সাথে বিয়ে করার উপযুক্ত পাত্র।

এ বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে মহামানবতার মুক্তির দূত প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ নারী জাতিকে পরামর্শ দিয়ে ইরশাদ করেছেন–
"যখন তোমাদের কাছে এমন ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাব আসে যে সভ্য ও চরিত্রবান তাহলে তার সাথে বিয়ে করে নাও। যদি তা না কর তাহলে দুনিয়াতে বিভেদ বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। (তিরমিযী)

স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার

নারী– তা সে অবিবাহিতা হোক, বা তালাকপ্রাপ্তা হোক অথবা বিধবা- সে তার বিবাহের জন্যে উত্থাপিত যে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। কোনো মেয়ে বা মহিলাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়ার অধিকার তার পিতা, ভাই বা কোনো দায়িত্বশীল কারোরই নেই।

এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর হাদীস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন–
"স্বামী-পরিচিতা (অর্থাৎ যে বিধবা তা তালাকপ্রাপ্তা) নারীর বিয়ে তার অনুমতি অর্জন ব্যতীত দেয়া যাবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন–
"কুমারীর (মেয়ের) বিয়ে তার অনুমতি ব্যতীত দেয়া যাবে না।" এ সম্পর্কে আয়েশা (রা) বলেন যে, আমি প্রিয়নবীকে বললাম "কুমারী মেয়েতো লজ্জা করে, সে কিভাবে অনুমতি প্রদান করবে? প্রিয়নবী জবাব দিলেন– তার নীরবতাই হচ্ছে অনুমতি।" (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

অর্থাৎ মেয়ের কাছে যদি অনুমতি চাওয়া হয় এবং তাতে সে চুপ করে থাকে– কোনো রকমের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে তাহলে সেটাকে অনুমতি বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু যদি বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা বিয়ে হয়, তার পরামর্শ ও স্পষ্ট ভাষায় অনুমতি ব্যতীত যদি বিয়ে দেয়া হয় তবে সেই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

অন্যদিকে কুমারী মেয়ের থেকে যদি (স্পষ্ট ভাষায়) অনুমতি না নেয়া হয়ে থাকে তাহলে বিয়ের পর– সেই বিয়েকে ভঙ্গ করা কিংবা ঠিক রাখার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকবে।

বিধবা নারীর ব্যাপারে অনুমতির যুক্তি প্রমাণ হযরত খানসা বিনতে খাদ্দামের ঘটনা থেকে নেয়া হয়েছে– যখন তার পিতা তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে দেন তখন তিনি সেই বিয়েকে অপছন্দ করেন। সুতরাং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়নবী সে বিয়েকে বাতিল করে দেন।

আর কুমারী মেয়ের অনুমতি সম্পর্কিত ব্যাপারে যুক্তি প্রমাণ দেয়া হয়েছে–
"একবার প্রিয়নবীর দরবারে একজন কুমারী যুবতী এসে বলল: তাকে তার পিতা এমন জায়গায় বিয়ে দিচ্ছে যা তার পছন্দ নয়। তখন প্রিয়নবী তাকে এ অধিকার দেন যে, সে চাইলে বিয়েকে বহাল রাখতে পারে অথবা বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে।" (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

এভাবে অপর একটি মেয়ের ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। মেয়েটি প্রিয়নবীর কাছে এসে বলল : "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আমার বিয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর ভ্রাতৃস্পুত্রের সাথে করে দিয়েছে।" কাজেই এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়নবী মেয়েটিকে অধিকার দিলেন যে, "চাইলে তা বহাল রাখ, চাইলে তা ভেঙ্গে দিতে পার।" এরপর মেয়েটি বলল যে, "আমার পিতার সিদ্ধান্তকে বহাল রাখছি। কিন্তু আমি এ প্রশ্ন মহিলাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে করেছি যে, তাদের ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকদের কোনো ক্ষমতা নেই।"

(বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ)

এভাবে মানবতার ইতিহাসে প্রথম ও শেষবার মহিলারা এতোবড় অধিকার ও মর্যাদা পেল। ইসলাম তাকে এ ক্ষমতা দিল যে, সে তার বিয়ের ব্যাপারে আগত প্রস্তাবসমূহকে ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারে বা ইচ্ছা হলে প্রত্যাখ্যান করে দিতে পারে। অথচ ইসলামের আগে কোনো নারীর গ্রহণ বা বর্জনের কোনোরকম অধিকারও স্বাধীনতা ছিল না। তখন তার জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত একমাত্র পুরুষেরাই। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। বাজারের পণ্য-সামগ্রীর মতো যে কোনো পুরুষ তাকে ক্রয়-বিক্রয় করত।

বিয়ের প্রস্তাব

আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের আগে বিয়ের প্রস্তাব বা পয়গাম পাঠানো শরীয়তের দৃষ্টিতে সুন্নাত। এতে করে উভয়পক্ষ একে অন্যের ব্যাপারে ভালোমন্দ সবকিছু অবগত হয়ে ও বিবেচনা করার অধিক সুযোগ লাভ করে এবং বিয়ের পরে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সমঝোতার ভাব উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বিয়ের পয়গাম পাঠানো ছাড়াই যে বিয়ে হয় তার পরিণাম সম্পর্কে কিছু বলা যায় না।

সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়-এর বর্ণনা মোতাবেক, সাহাবী হযরত মুগীরা ইবনে শোবা এক মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে পরে প্রিয়নবী ﷺ তাঁকে বললেন–
"মুগীরা, ওকে দেখে নাও, কারণ এটা তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা কায়েম করবে।"

এ হাদীসে দেখার কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। কাজেই এক্ষেত্রে ইসলামের নির্ধারিত সাধারণ অনুমতির সীমা লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধারণ অবস্থায় কোনো পুরুষকে অপর নারীর হাতের পাঞ্জা ও মুখ ছাড়া অন্য কিছু দেখার অনুমতি দেয়া হয়নি। আর তাও দেয়া হয়েছে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের সুবিধার্থেই। এতটুকু শিথীলতা ব্যতীত জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা অস্বাভাবিক কষ্টকর হওয়ার আশংকা থাকতে পারে। অবশ্য, কোনো মহিলার কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠানোর পর কথাবার্তা অনেকটা পাকাপাকি পর্যায়ে এসে পড়লে পরে শুধু নির্দিষ্ট মেয়েটিকে দেখার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে প্রিনবীর হাদীস হচ্ছে–
"যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়ে থাক, তাহলে তখন তাকে দেখে নেয়ার কোনো বাধা-নিষেধ নেই। তবে শর্ত হলো, সে সেই (বিয়ের) উদ্দেশ্যেই দেখবে। তা সেই মহিলাটি (এ ব্যাপারে কিছু) জানুক বা না জানুক।"

অন্য এক প্রসঙ্গে প্রিয়নবী বলেন–
"যখন তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিয়ের পয়গাম পাঠায় এবং তাকে দেখতে চায় তাহলে দেখতে পারে।" (হাদীস)

উল্লেখযোগ্য যে এখানেও ইসলাম মেয়ে দেখার সেই অবাধ স্বাধীনতা দেয়নি যা বর্তমান যুগে প্রচলিত দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, বিয়ের প্রস্তাবকারী ব্যক্তি মেয়েটিকে সেই পোশাকে দেখতে পারে– যা পরে মেয়েরা পিতা ও ভাইদের সামনে উপস্থিত হয়। এছাড়া বিয়ের আগে পাত্রীর মন-মেজাজ বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবগতি অর্জনের জন্যে কোনো মহররম-এর (পিতা, আপন, ভাই, মামা, চাচা ইত্যাদি) উপস্থিতিতে কোথাও ভ্রমণ করা বা দেখা সাক্ষাৎ করার অনুমতি থাকতে পারে।

উপরে বর্ণিত হাদীসের আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রস্তাবিত মেয়েকে যখন দেখার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তখন তার ব্যবহার, মন মানসিকতা, মেজাজ মর্জি ও চরিত্র সম্পর্কে অবগতি অর্জন করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কারণ, আসল জানার বিষয় হচ্ছে তাই। হাদীসের বাণীর সাথে এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়– এ ভাবেই উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও একাত্মতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এ বিশেষ অবস্থায় পাত্রীকে দেখার অনুমতি দানের মধ্যে ইসলামী শরীয়তের (আইনবিধি) বাস্তব উদারতা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। এটা নিঃসন্দেহে এক অনন্য উদারতা। এতে করে যে কোনো যুগের মানুষ তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের বেলায় নিজের বিচার-বুদ্ধি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকে।

সাধারণ অবস্থায় যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার কোনো সুযোগ নেই, সেখানে বিয়ের বিশেষ অবস্থায় পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে দেখা সাক্ষাতের অনুমতি দান করাটা অত্যন্ত তাৎপর্যময়। ইসলাম যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থী জীবনাদর্শ এ থেকেও তা স্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলামে কোনো চরম পন্থার অবকাশ নেই, আর অবাস্তব বা অস্বাভাবিকতার কোনো স্থানও ইসলামে নেই।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমরা আজকের যুগের মুসলমানদের দূরবস্থা দেখে অত্যন্ত লজ্জিত ও বিস্মিত হই। আজ মুসলমানরা প্রিয়নবীর সুন্নাতের কোনো তোয়াক্কা না করে যাচ্ছেতাই করে বেড়াচ্ছে এবং সবক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির প্রদর্শনী করে চলছে। অনেক ক্ষেত্রে সুন্নাতের নামে বা সুন্নাতের আড়ালে সুন্নাতবিরোধী তৎপরতা চালাতেও তাদের ভয় জাগে না।

একদিকে এক শ্রেণীর মুসলমানকে দেখি, তারা কোনো অবস্থাতেই বিয়ের আগে পাত্রকে পাত্রী দেখার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয় না, আর অন্যদিকে এক শ্রেণীর মুসলমান বিয়ের আগে পাত্রকে পাত্রী দেখানোর বাহানায় যাচ্ছেতাই করার এবং যত্রতত্র অবাধে ঘুরে বেড়ানোর খোলা অনুমতি দিয়ে রেখেছে যা দেখলে শুনলে লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসে। আসলে এ উভয় চরম পন্থাই ইসলাম বিরোধী।

কোনো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ বিষয়টির আগাগোড়া ভালো করে চিন্তা করে দেখলে পরে বলতে বাধ্য হবে যে, এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষাটিই যথার্থ ও সঠিক। পার্থিব আধ্যাত্মিক যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই ইসলামের সিদ্ধান্তই উত্তম। সমগ্র বিশ্বমানবতার স্বার্থে ইসলাম যে জীবনপদ্ধতি দিয়েছে তাই সবচেয়ে সহজ– সুন্দর ও স্বাভাবিক। যা একটি মানুষের জন্য কল্যাণকর।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, কোনো মুসলমান তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রস্তাবিত পাত্রীর কাছে নিজের প্রস্তাব পাঠাবে না।

কোনো মুসলমানের জন্যে এটা জায়েয নয় যে, সে জেনে শুনে নিজের বিয়ের প্রস্তাব সেই মেয়েকে পাঠায় যার কাছে অন্য কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রস্তাব ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। কারণ, এতে করে দুই মুসলমানের মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বা শত্রুতামূলক উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া এটা হীন মনোবৃত্তির পরিচয়ও বহন করে।

এ জন্যে প্রিয়নবী ﷺ এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে বলেছেন–

"কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব পাঠাবে না যতক্ষণ না সে (আগের প্রস্তাবকে) তার প্রস্তাব তুলে নেয় কিংবা তাকে (দ্বিতীয় জনকে) অনুমতি দান করে।" (হাদীস)

উপরের হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে মালেকী মতাবলম্বী আলেমদের অভিমত হচ্ছে– "যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মহিলার সাথে বিয়ে করে নেয় তাহলে সে বিয়ে ভঙ্গ হয়ে যাবে।" ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই অভিমতটি যথার্থ। কারণ তা ইসলামের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ।

মোহর

মোহরের পরিমাণ : ইসলামী শরীয়তের প্রতিটি বিধি-বিধানে স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা এবং নম্রতাকে গুরুত্বের সাথে বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় কড়াকাড়ি এবং জটিলতা ইসলামী নীতির পরিপন্থী।

বিয়ের বিধান ইসলামী শরীয়তেরই একটি অংশ। বরং বিয়ে এমন এক 'আবশ্যিক কর্ম' যা আল্লাহর তরফ থেকে সমগ্র মানব জাতির ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এজন্যে বিয়ের ব্যাপারে কোনো রকমের অর্থনৈতিক বা বৈষয়িক বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী কাজ। কেউ কোনো ব্যাপারে নেতিবাচক বা বিপত্তি সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। কেউ কোনো সমস্যার সৃষ্টিও করবে না।

কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

"আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্যে কোনো রকমের জটিলতা রাখেননি।"
(আল কুরআন)

এজন্যেই আল্লাহ ইসলামের সব কর্মে ভারসাম্যপূর্ণতাকে পছন্দ করেছেন। বলাবাহুল্য বিয়ে সংক্রান্ত সব বিষয়েই তা মোহর বা অন্য কোনোকিছু– ইসলামের সেই নীতিকেই বুনিয়াদ হিসেবে মেনে চলতে হবে।

বিয়ের সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন–
"সবচেয়ে বড় বরকতপূর্ণ বিয়ে সেটাই যাতে কম থেকে কম ব্যয় করা হয়েছে।"
অন্য একস্থানে প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন–

"সবচেয়ে উত্তম মোহর সেটাই যা আদায়কারীর জন্যে সহজ হয়।"

এমনিতে ইসলাম মহরের নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য সেই মহরকেই উত্তম বলা হয়েছে যা আদায় করতে কোনো অসুবিধে না হয়।

প্রিয়নবীর হাদীসটি হচ্ছে–
"যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে তার মহরের পরিবর্তে একমুঠো গম প্রদান করে তাহলে তা তার জন্যে জায়েয।"

উমর (রা) বলেছেন–
"বিয়ে শাদীতে মোহরের পরিমাণ অনেক বেশি রেখ না। কেননা (মোহর) বেশি ধার্য করায় যদি কোনো রকমের পার্থিব বা পরকালীন কল্যাণ থাকত তাহলে আল্লাহর রাসূল ﷺ তা অবশ্যই করতেন।"

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী, তিরমিযী)

তবে মোহর কম করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করবে। কারণ একটি পরিমাণ যেখানে একজনের জন্যে সহজ মনে হবে তা অন্য আর একজনের জন্যে কঠিনও হতে পারে। কারণ প্রত্যেকের অর্থনৈতিক অবস্থা একই রকম হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রিয়নবী যখন উম্মুল মু'মিনিন হযরত উম্মে হাবীবার (রা) সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন তখন নাজ্জাশী প্রিয়নবীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নিজের পক্ষ থেকে চার হাজার দিরহাম বা দু'শ দীনার মহর হিসেবে দেন এবং প্রিয়নবী তখন এ পরিমাণ টাকাকে বেশি মনে করেন না কারণ বাদশাহদের মান অনুযায়ী এটা কম ছিল।

কিন্তু যখন এক দরিদ্র ব্যক্তি এসে প্রিয়নবীকে বলল যে, "আমি এক মহিলার সাথে ১৬০ দিরহাম মোহরে বিয়ে করেছি।" তখন প্রিয়নবী এ পরিমাণকে অনেক বেশি মনে করেন এবং তাকে বললেন : "এখন মনে হচ্ছে যে, তুমি পাহাড় থেকে রূপা খোদাই কর।"

দেনমোহর আদায়ের ব্যাপারে ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী এক ব্যক্তিকে বললেন : "মোহর আদায় কর– তা লোহার একটি আংটি হোক না কেন।" কিন্তু যখন লোকটি ফিরে এসে প্রিয়নবীকে বলল : যে তার কাছে লোহার আংটিও নেই। এরপর প্রিয়নবী তাকে

জিজ্ঞেস করলেন, "কুরআনের কিছু সূরা কি তোমার স্মরণ আছে?" লোকটি তার মুখস্থ সূরাসমূহের নাম নিয়ে বলল, যে অমুক অমুক সূরা তার মুখস্থ রয়েছে। এরপর প্রিয়নবী ﷺ বললেন : "আমরা তোমার বিয়ে এ শর্তে করিয়ে দিচ্ছি যে- তুমি তাকে (স্ত্রীকে) ওসব সূরা মুখস্থ করিয়ে দেবে-যা তোমার মুখস্থ রয়েছে।"

অন্য হাদীস অনুযায়ী নবী করীম ﷺ বলেন- "এ শর্তে বিয়ে করিয়েছি যে তুমি তাকে কুরআনের কোনো সূরা মুখস্থ করিয়ে দেবে।"

এ ধরনের আর একটি ঘটনা হযরত আবু তালহা এবং হযরত উম্মে সলিমেরও রয়েছে, আবু নঈম তাঁর 'আল হুলিয়াদ' গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন- ঘটনাটি হচ্ছে, আবু তালহা উম্মে সলিমের কাছে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। কিন্তু আবু তালহা তখনো মুসলমান হননি, তাই হযরত উম্মে সলিম তাঁকে জবাবে বলেন যে, এ প্রস্তাব আসলে প্রত্যাখ্যান করার মতো নয়, কিন্তু আপনি তো কাফের এবং আমি মুসলমান। সুতরাং আপনার সাথে বিয়ে করা আমার জন্যে জায়েয নয়। তালহা একথা শুনে বললেন-

- এ আবার কেমন বিপদ মাথায় তুলে নিয়েছ?

উম্মে সলিম আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আমার আবার কি বিপদ?

তালহা বললেন : তুমি কি পরিমাণ সোনা-রূপা চাও?

উম্মে সলিম বললেন : সোনা রূপার কোনো প্রয়োজন নেই। আসল সমস্যা হচ্ছে, আপনি এমন বস্তুর পূজা করেন, যে শুনতেও পায় না এবং দেখতেও পায় না। আর তা আপনার কোনো লাভ-ক্ষতিও করতে পার না। সেই কাঠের পূজা করতে কি আপনার মোটেও লজ্জা হয় না- যা আপনার হাবশী গোলাম টেনে হিঁচড়ে আপনার কাছে বয়ে আনে? যাই হোক, এ কারণে আমি আপনার সাথে বিয়ে করতে রাজি না। তবে হ্যাঁ, আপনি যদি ইসলাম কবুল করেন- তাহলে তাই হবে আমাদের দেনমোহর। এছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করি না।

আবু তালহা উম্মে সলিমকে জিজ্ঞাসা করলেন- রমিসা! আমি কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করব?

উম্মে সলিম বললেন : এর জন্যে আপনি প্রিয়নবীর কাছে গমন করুন।

কাজেই আবু তালহা প্রিয়নবীর দরবারে রওয়ানা হলেন। প্রিয়নবী তাকে আসতে দেখে নিজের পাশে বসা সাথীদের বললেন- "আবু তালহা আসছে। আমি তার উভয় চক্ষুর মাঝখানে ঈমানের ঝলক দেখতে পাচ্ছি।"

আবু তালহা প্রিয়নবীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে প্রিয়নবীকে ওসব কথা বলে দিলেন যা তাঁদের উভয়ের মধ্যে হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়নবী তাঁদের বিয়ে সেই শর্তেই করিয়ে দেন।

এ হাদীসের বর্ণনা এতই স্পষ্ট যে, এর আর কিছু ব্যাখ্যা করে বলা প্রয়োজন হয় না।

মোহর–নারীর অধিকার

মোহর নারীর সেই অধিকার যা ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার ইসলাম শুধু নারীকেই দিয়েছে।

এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–

"এবং নারীদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে (ফরয মনে করে) আদায় কর।"

(সূর নিসা : আয়াত-৪)

ইমাম কুরতুবীর এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "মোহর আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহিলাদের জন্য এক বিশেষ উপহার।"

ইসলাম মোহরকে শুধু স্ত্রীর অধিকার বলে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। নয়তো ইসলাম পূর্বকালে নারীর এ অধিকার তার পৃষ্ঠপোষকরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিত আর নারীর ভাগ্যে একটি কানাকড়িও জুটতো না। ইসলাম নারীকে অন্যান্য সব অধিকার দানের সাথে সাথে তার মোহরের ওপরও তার পূর্ণ অধিকার দান করে। মোহরের ওপর পিতা-ভাই-স্বামী বা অন্য কারও কোনো অধিকার নেই। মোহরের টাকা ব্যবহার বা ব্যয় করার ব্যাপারে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। অন্য কোনো ব্যক্তি যদি মোহরের টাকা ব্যয় করে বা টালবাহানা করে কিংবা মোহরের টাকা আত্মসাৎ করে তাহলে সে বিশ্বাসঘাতকতার পাপে পাপী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্যে নারীমুক্তির উন্নতির যুগে নারীকে আজ পর্যন্ত এ অধিকার দেয়া হয়নি। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সমাজের নারীদের মতো আজও ইউরোপ আমেরিকান মহিলারা নিছক পুরুষদের খেল-তামাশা ও ভোগের বিলাসের বস্তুতে পরিণত রয়েছে। ওসব দেশে এখনও এ নিষ্ঠুর কুপ্রথা প্রচলিত রয়েছে যে, মেয়ে বিয়ের সময় যৌতুকের নামে পিতার ঘর থেকে বিপুল অর্থসম্পদ ও সাজসরঞ্জাম স্বামীর ঘরে নিয়ে যায় এবং তার সবকিছু স্বামীর অধিকারে চলে যায়। অবস্থা দেখে মনে হয় নারীই যেন উল্টো পুরুষকে মোহর আদায় করছে। এ কুপ্রথা এমন প্রচলিত যে, এছাড়া আজ আর কেউ বিয়ে শাদীর কথা ভাবতেই পারে না।

যৌতুক

আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করে দেখেছি যে, মোহর সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর অধিকার বা প্রাপ্ত। স্ত্রীর মোহর আদায় করা শরীয়তের আইন অনুযায়ী প্রতিটি স্বামীর জন্যে ফরয। এর বিনিময়ে স্বামী কোনো অর্থেই যৌতুকের দাবি করতে পারে না। যৌতুক দাবি করার কোনো অধিকারই স্বামীর নেই। অবশ্য স্ত্রী যদি সন্তুষ্টচিত্তে কোনো জিনিস আনে বা দেয়, তাহলে তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু স্বামী বা স্বামীপক্ষের কেউ যৌতুকের ওপর কোনো অধিকার দাবি করতে পারবে না। মোহরের সাথে যৌতুকের কোনো যথার্থতা নেই।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–
"এবং নারীদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে (ফরয মনে করে) আদায় কর, অবশ্য সে যদি নিজের খুশিমত মোহরের কোনো অংশ ক্ষমা করে দেয় তাহলে তোমরা তা সানন্দচিত্তে খেতে পারো।" (সূরা নিসা : আয়াত-৪)

আজকাল ছেলের পক্ষ থেকে পোশাক-পরিচ্ছেদ, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য জিনিসের যে দাবি করা হয় তা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম– অবৈধ।

কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় ছেলের পক্ষ থেকে যৌতুক হিসেবে এত বিপুল মূল্যের জিনিসপত্র দাবি করা হয় যে, তা মেয়ের অভিভাবকের সাধ্যের বাইরে চলে যায়। শেষপর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে মেয়েপক্ষ সুদে ঋণ করে হলেও ছেলের দাবি পূরণ করতে বাধ্য হয়। এটা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী কাজ। মেয়েপক্ষের কাছে যৌতুক দাবি করাটা বিরাট জুলুম ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ যৌতুক প্রাপ্ত ধনসম্পদ ও আসবাবপত্রে কোন বরকত নেই। তা যেভাবে আসে সেভাবেই চলে যায়।

এমনকি তা অকল্যাণকর বলেও প্রমাণিত হয়। সবচেয়ে আসল কথা হচ্ছে যৌতুকের ভিত্তিতে যে বিয়ে সংঘটিত হয় তার পরিণাম কখনও শুভ হয় না, স্ত্রীর কাছে যৌতুক গ্রহণকারী স্বামী সব সময় ছোট হয়ে থাকেন এবং উভয়ের মধ্যে কখনও আন্তরিক ভালোবাসা গড়ে উঠতে পারে না। বলাবাহুল্য, আজকের যুগে প্রচলিত যৌতুক সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী একটি হারাম কাজ এবং এটা হচ্ছে জঘন্য অপচয় ও পাপাচার। এছাড়া যৌতুকের মাধ্যমে প্রদর্শনী ও অহঙ্কারের অনুভূতি সক্রিয় থাকে।

যৌতুক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অপচয়ের নিন্দা করে আল্লাহর কুরআনে বিবৃত হয়েছে–

"অপচয়কারী শয়তাদের ভাই এবং শয়তান নিজ প্রতিপালকের কাছে অকৃতজ্ঞ।"

বস্তুত, মেয়েপক্ষ নিজেদের খুশীমত সহজভাবে এবং ছেলেপক্ষের কোন দাবি-দাওয়া ছাড়া যা দেয় এবং যাতে কোন অপচয় প্রদর্শনী বা অহংকারের ভাব থাকে না– তাই হচ্ছে উত্তম যৌতুক। এতে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি পাওয়া যায় এবং এতে অপচয় এবং লোক দেখানো প্রদর্শনীর কোন আশঙ্কা থাকে না।

বিয়ের উৎসব

ওলীমা

বিয়ের দিন নিঃসন্দেহে এক মহাআনন্দের দিন। এদিন পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজন সবাই একত্রিত হয়ে থাকে। এ আনন্দের মুহূর্তে পাত্রপক্ষকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী লোকদের প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রিয়নবী যখন তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা)-কে আলী (রা)-এর সাথে বিবাহ দেন তখন মহানবী ﷺ বলেন–

"বিয়েতে প্রীতিভোজ (ওলীমা) অবশ্য হওয়া চাই।"

মহানবী ﷺ-এর এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো ফকীহ এ যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, বিয়েতে 'প্রীতিভোজ' ফরয। অবশ্য অন্যান্য ফকীহদের মতে বিয়ের প্রীতিভোজ শুধু মুস্তাহাব।

এভাবে প্রিয়নবী ﷺ যখন জয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-কে বিয়ে করেন তখন একটি ছাগল যবেহ করে প্রীতিভোজের আয়োজন করেন এবং যখন আসিয়ার বিয়ে হয় তখন প্রিয়নবী খেজুর, পানি ও ঘি সহযোগে প্রীতিভোজ দেন। প্রিয়নবী ﷺ তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের বিয়ে উপলক্ষ্যে গমের রুটি সহযোগে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করেন।

প্রিয়নবী নিজে আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে বলেছেন–

"ওলীমার (প্রীতিভোজে) দাওয়াত করো– তা একটি ছাগলেরই হোক না কেন।"

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা প্রীতিভোজের আয়োজনকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, যেভাবে যতটুকু সম্ভব ততটুকু লোকদের খাওয়াবার আয়োজন কর। বিখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ 'নায়লুল আওতারে' উল্লেখ রয়েছে– ওলীমার সবচেয়ে কম সীমা হচ্ছে একটি ছাগল। যদি একথার প্রমাণ মজুদ না থাকত যে প্রিয়নবী একটি ছাগলের কমেও ওলীমার আয়োজন করেছেন। তাহলে কমপক্ষে একটি ছাগলের ওলীমা প্রত্যেকের জন্যে অপরিহার্য হয়ে যেত।" এরপর বিচারপতি কাযী আয়ায-এর এ বক্তব্য নকল করা হয়েছে যে, ফকীহদের এ ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে যে, বেশি থেকে বেশি ওলীমার আয়োজনের কোন সীমা

নির্ধারিত নেই আর ওলীমার কম থেকে কম সীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। (নায়লুল আওতার-১৭৬)

ওলীমা বা প্রীতিভোজে নিজের পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশি, ধনী-দরিদ্র সবাইকে আমন্ত্রিত করা উচিত।

প্রীতিভোজে কেবল ধনীদের আমন্ত্রণ জানানো এবং দরিদ্রদের অবহেলা করা অত্যন্ত আপত্তিকর কথা এবং যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের নীচ ও হীনতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। যারা তাদের প্রীতিভোজ বা অন্য কোন সাধারণ যিয়াফতে দরিদ্রদের বাদ দিয়ে করল ধনীদের দাওয়াত করে তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি কিনে নিল, কারণ প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন :

"অত্যন্ত মন্দ ওলীমার ভোজ হচ্ছে সেটা যাতে শুধু ধনীদের আমন্ত্রিত করা হয় এবং দরিদ্রদের পরিত্যাগ করা হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

আমন্ত্রণ গ্রহণ করা রাসূলের সুন্নাত। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী বলেছেন–

"যখন তোমাদের কাউকে ওলীমা ভোজের আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন তা গ্রহণ করা উচিত।"

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী বলেছেন : "যদি কোন ব্যক্তি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে, তাহলে সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমর একবার এক ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাল। লোকটি অক্ষমতা প্রকাশ করল কিন্তু তিনি তার অক্ষমতা গ্রহণ করতে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন :

"কিসের অক্ষমতা? চল .... উঠ ...!"

এর পর কেউ যদি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রীতিভোজে পৌঁছায় তখন তাকে ধৈর্য ও শোকরের সাথে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, আর যদি কেউ রোযা অবস্থায় থাকে তাহলে তা আমন্ত্রককে জানিয়ে দেয়া উচিত এবং তার জন্যে শুভ প্রার্থনা করা উচিত।

হাদীসে আছে–

"তোমাদের মধ্যে কাউকে যখন দাওয়াত দেয়া হয় তখন তা গ্রহণ করা উচিত। যদি সে রোযা অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে অক্ষমতা প্রকাশ করা উচিত এবং তার জন্যে শুভ প্রার্থনা করা উচিত কিন্তু যদি রোযা না রেখে থাকে তাহলে সবর ও শোকরের সাথে ভোজ গ্রহণ করবে।" (আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ)

কিন্তু ভোজসভায় যদি এমন কোন দ্রব্য দেখতে পাওয়া যায়, যা খাওয়া আল্লাহর বিধানে নিষিদ্ধ তাহলে নীরবে ফিরে চলে আসা উচিত। ইমাম ইবনে হাসান

বলেন : যদি সেখানে রেশমী চাদর বিছানো থাকে, গৃহ যদি হারাম আয়ের তৈরি হয়, আর খাদ্য হয় ছিনিয়ে নেয়া দ্রব্যের, আর যদি থাকে মদের আয়োজন তাহলে সেখান থেকে ফিরে চলে আসা উচিত।

হযরত আলী (রা) বলেছেন : "তিনি প্রিয়নবীকে ভোজের আমন্ত্রণ করেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হন। প্রিয়নবী তাঁর গৃহে ছবি লটকানো দেখে ফিরে চলে আসেন।" (ইবনে মাজাহ)

প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস রাখে, তাকে এমন ভোজসভায় কখনও বসতে নেই, যেখানে মদ্যপান চলে।"

বিয়ের আনন্দ

বিয়ে শাদীতে গীত ও গানের সাথে দফ্ বাজানো যেতে পারে। একবার হযরত আয়েশা এক আনসারী সাহাবীর সাথে তাঁর এক বান্ধবীর বিয়ে দিচ্ছেলেন।

তখন প্রিয়নবী বললেন–

"আয়েশা! তোমাদের কাছে কি কোন উৎসবের সরঞ্জাম নেই? আনসাররা তো উৎসব পছন্দ করে।"

গীত ও গানের সাথে দফ বাজানোর ব্যাপারে প্রিয়নবীর আরেকটি বাণীও লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন–

'বিয়ে-শাদী উপলক্ষ্যে গীত ও গানের সাথে দফ্ বাজানোতে কোন অপরাধ নেই।"

তবে প্রিয়নবী এমন বিয়ে-শাদী পছন্দ করতেন না যা নীরবে নিভৃতে হয়ে যায়। বিয়ের জন্যে যেন খুব ভালো করে ঘোষণা করা হয়। মুসনাদে আহমদে উল্লেখ রয়েছে প্রিয়নবী চুপচাপ নীরব বিয়েকে পছন্দ করতেন না, যতক্ষণ না তাতে দফ না বাজানো হয় এবং এ গান না গাওয়া হয় যে–

" .... এসেছি মোরা তোমাদের কাছে
এসেছি মোরা তোমাদের পাশে
তাহলে, মোদের বল মারহাবা
তোমাদের মোরা বলি মারহাবা ..."

এভাবে প্রিয়নবী বিয়ের অনুষ্ঠানে দফ বাজানোকে সুন্নাত বলে অভিহিত করেছেন এবং এমন বিয়েকে অপছন্দ করেছেন যাতে আনন্দের কোন সুব্যবস্থা নেই। এদিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান যুগেও বিয়ে শাদীতে এমন গীত পরিবেশন করা যায়। যাতে কোনো নোংরা বা অশ্লীলতা নেই। কিন্তু তাই বলে বাহারী ধরনের

বাজে গান গাওয়ার কোন অনুমতি নেই। নোংরা অর্থপূর্ণ, কুরুচি বা এমন গান যা পাশবিক প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেয় তা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। গানের কথা যদি রুচিপূর্ণ ও শালীন হয় তাহলে তাতে কোন বাধা নিষেধ নেই। বিয়ের গান যে কেউ গাইতে পারে। পুরুষ-মহিলা-বালক-বালিকা, যে কেউ বিয়ের গানে শরীক হতে পারে। এর প্রমাণ হচ্ছে আয়েশা (রা)-এর সেই ঘটনা : যখন তিনি তাঁর এক বান্ধবীর বিয়ের পরে তাঁকে স্বামীর বাড়িতে পাঠাল, তখন প্রিয়নবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন– "আয়েশা! তোমরা কি মেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছ?"

তিনি জবাব দিলেন– হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!

প্রিয়নবী জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা ওর সাথে গায়িকাদের পাঠাওনি?

তিনি বললেন : না।

প্রিয়নবী বললেন : আরে .... আনসাররা তো গীতের পাগল। তোমরা কোন গায়িকা মেয়ে পাঠালে না কেন?

আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন: কিন্তু, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি গাইবে?

প্রিয়নবী বললেন– গান এ ধরনের হবে :

" .... এসেছি মোরা তোমাদের কাছে
এসেছি মোরা তোমাদের পাশে
তাহলে, মোদের বল মারহাবা
তোমাদের মোরা বলি মারহাবা ..."
যদি এ গম গন্দমী–
না হতো হেথা–
কভু দেখতে না মোদের
তোমাদের মাঝে; তোমাদের পাশে।"

সাহাবায়ে কেরাম ও প্রিয়নবী এ রেওয়ায়েত থেকে উপকৃত হয়েছে। তারা বিয়ে অনুষ্ঠানের আনন্দে নিজেরাই অংশগ্রহণ করতেন আর এটাকে তাঁরা আপত্তিকর বলে মনে করতেন না। বিখ্যাত সাহাবী আমের ইবনে সা'আদ (রা) বলেন : "আমি এক বিয়েতে গিয়ে দেখি সাহাবী আমের ইবনে কা'আব ও আবু মাস'উদ আনসারী ওখানে আগে থেকেই উপস্থিত রয়েছেন এবং কয়েকটি বালিকা সেখানে দফ বাজিয়ে গান গাচ্ছে। আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম 'ওগো রাসূলের সাহাবীরা; আপনাদের সামনে এসব কি হচ্ছে?' তাঁরা বললেন : 'বসতে যদি চাও তাহলে বস, আর যেতে চাইলে যাও। কারণ প্রিয়নবী এ ধরনের মাহফিলের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করেননি।

আনন্দের মুহূর্তে এ ধরনের নির্দোষ খেলাধুলা দেখেছেন এবং এসবের আয়োজন করার পরামর্শও দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, ইসলাম তার অনুসারীদের জীবনকে সত্যিকার আনন্দ উল্লাস থেকে বঞ্চিত রাখে না বরং পরিচ্ছন্ন আনন্দ উল্লাসের সুযোগ দান করেছে, যেন তাদের জীবন শুষ্ক ও নিরানন্দ না হয়ে থাকে। ইসলামে স্থবিরতা ও বিরক্তির অবকাশ নেই।

মানুষ তার স্বভাবের তাগিদে পরিচ্ছন্ন ও শালীনতার মধ্যে থেকে নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ইসলাম রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও আনন্দের সাথে সাথে ইবাদতকেও সমন্বিত করে দিয়েছে। এভাবে আনন্দ ও ইবাদত পরস্পর একই সূত্রে গাঁথা কিন্তু খেলাধুলা ও কৃষ্টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে বা এসব স্বাভাবিক আনন্দ উল্লাসের আড়ালে কোন রকমের নোংরামী বা অশ্লীল কার্যকলাপের বিন্দুমাত্র স্থান নেই ইসলামে। কাজেই কেউ যেন কোন রকম অবৈধ তৎপরতা চালানোর অপচেষ্টা না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে রবং এর মাধ্যমে তারা চরিত্র গঠন, শ্লীলতা ও আত্মমর্যাদা সংরক্ষণের প্রয়াস পাবে।

স্ত্রীর অধিকার

ভরণপোষণ

স্ত্রী ধনী হোক বা দরিদ্র হোক– ইসলাম তার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর অর্পণ করেছে। অবশ্য স্ত্রী যদি ধনী হয় এবং আনন্দচিত্তে স্বামীকে কিছু আর্থিক সাহায্য প্রদান করা পছন্দ করে তাহলে কোন বাধা নেই। কিন্তু স্ত্রীর খাওয়া, পরা, বাসস্থান এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব স্বামী তার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী পালন করবে।

এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে–

"তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা স্বামীদেরই দায়িত্ব।"

এ হাদীসে যদিও বাসস্থান, বিছানাপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের নাম উল্লেখ নেই, কিন্তু ভরণপোষণ করার সাথে ওসব জিনিস স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। এজন্যে ওসব কিছুর পৃথক পৃথক নাম নেয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কুরআন শরীফে বাসস্থানের উল্লেখযোগ্য রয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

"তাদের (স্ত্রীদের) সেসব জায়গায় রাখ যেখানে তোমরা থাক, যেমন জায়গাই তোমাদের থাকে এবং বিরক্ত করার জন্যে তাদেরকে কষ্ট দিও না।"

(সূরা তালাক : আয়াত-৭)

ইসলাম স্ত্রীদের বাসস্থানের সমস্যা যেখানে সমাধান করে দিয়েছে, সেখানে অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থাও যে স্বামীর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা বলাই বাহুল্য। স্বামীরা স্ত্রীদের বসবাসের জন্যে সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীরও ব্যবস্থা করবে।

এখন এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, স্ত্রীদের ভরণপোষণের মান কি ধরনের হবে? এর জবাবে ইসলাম স্বামীর আর্থিক মানের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে। স্বামী যদি ধনী হয় তাহলে স্বচ্ছলতার সাথে, আর যদি দরিদ্র হয় তাহলে যেমন জোটে তেমন ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।

এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে-
"স্বচ্ছল ব্যক্তি তার স্বচ্ছলতা অনুযায়ী ভরণপোষণ দেবে আর যাদেরকে কর্ম জীবিকা দেয়া হয়েছে তারা সেই সম্পদ থেকে খরচ করবে যা আল্লাহ্ তাদের দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে যতটুকু দিয়েছেন তা থেকে বেশি তাঁর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন না। অসম্ভব কিছু নয় যে, আল্লাহ্ দারিদ্র্যের পর সমৃদ্ধিও দান করবেন।" (সূরা তালাক : আয়াত-৭)

প্রিয়নবীও একই নির্দেশ প্রদান করেছেন-
"প্রচলন অনুযায়ী তোমাদের স্ত্রীদের খাবার ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করা তোমাদের উপর ফরয (অবশ্য কর্তব্য)।"

যেমন, কোন ব্যক্তি যদি এমন ধনী হয় যে নিজ স্ত্রীকে রেশমী পোশাক পরাতে সক্ষম তাহলে স্ত্রীকে তার রেশমী বস্ত্র দেয়াই উচিত। ইমাম জহুরীকে মহিলাদের রেশমী বস্ত্র পরিধান সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : "আমাকে আনাস (রা) বলেছেন : তিনি রাসূলের মেয়েকে রেশমী চাদর ব্যবহার করতে দেখেছেন।"

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) তাঁর 'আল এসাবা' গ্রন্থে হাদীসটিকে সঠিক বলে বর্ণনা করেছেন।

পারস্পরিক সম্প্রীতি

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-
"তাদের (স্ত্রীদের) সাথে উত্তম পন্থায় জীবনযাপন কর, যদি তারা তোমাদের অপছন্দ হয়, তাহলে হতে পারে একটি বিষয় তোমাদের অপছন্দ হবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাতে কোন কল্যাণ রেখে দিয়ে থাকবেন।" (সূরা তালাক : আয়াত-৬)

আল্লাহ্ আরো বলেছেন-

"তাদের (স্ত্রীদের) বিরক্ত করার জন্যে তাদের কষ্ট দিও না।"

(সূরা তালাক : আয়াত-৭)

এসব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের এটা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, স্ত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা, বিরক্ত করা এবং বিনা কারণে কষ্ট দেয়া যাবে না। এজন্যে কেউ যদি নিজেকে যথার্থ মুসলমান দাবি করে সে যেন কোন কথায় বা কাজে আল্লাহ নির্ধারিত সীমালংঘন না করে। কেউ যদি আল্লাহর স্পষ্ট আদেশের অমান্য করে তাহলে সে সীমালংঘন করার অপরাধে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযীতেও একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন–

"তোমাদের মধ্যে সবেচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।"

অন্য এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার পরিবার-পরিজনের পক্ষে উত্তম এবং আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিজের পরিবার পরিজনের পক্ষে উত্তম।"

ইসলামের এ স্পষ্ট নির্দেশ ও উপদেশাবলি থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, কোন কোন অজ্ঞ, অভদ্রহীন লোক নারীদের ওপর জোর যুলুম করে নিজেদের পৌরুষত্ব দেখানোর নিন্দনীয় প্রয়াস চালায়। এ ধরনের নোংরা নিকৃষ্ট লোকেরা নারীদের সাথে স্নেহ-দয়া প্রদর্শন ও নম্র ব্যবহারকে তাদের পৌরুষের বিরোধী বলে ধারণা করে। এটা সত্যিই ঘৃণিত মনোবৃত্তি। এতে করে একদিকে তাদের চিন্তার অসারতা প্রমাণিত হয় এবং অন্যদিকে পারিবারিক সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। বস্তুত: নারীদের সাথে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করা এবং তাদের ছোটখাটো ভুলক্রটির প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার মধ্যেই রয়েছে পৌরুসুলভ সৌন্দর্য। নারীদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা উচিত।

যারা নারীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে তারা তাদের জ্ঞানবুদ্ধির গভীরতা এবং জীবনযাপনের আসল পদ্ধতির সাথে পরিচয়ের প্রমাণ উপস্থিত করে। নারীদের কথায় কথায় শাসানো, ভয় ভীতি দেখানো, বকাঝরা করা, মারপিট করা চরম অন্যায় এবং ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থী। যদি তারা ভুল করে, দোষ করে তাহলে সুন্দরভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে ভুল-ক্রটি শোধরানোর সুযোগ দিতে হবে। নয়তো তাদের মন ভেঙে যাবে এবং গোটা পারিবারিক পরিবেশ তিক্ততায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে।

সুস্থ ও সুন্দর দাম্পত্য জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের অন্যতম দাবি স্ত্রীর প্রতি অযথা সন্দেহ পোষণ এবং তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে বিশেষ কৌতুহলী হওয়া উচিত নয়। কোন কোন স্বামীকে দেখা যায় স্ত্রীদের ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ ও অপ্রয়োজনীয় কৌতুহল প্রকাশ করে থাকে। এ ধরনের দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন

স্বামীর স্ত্রীদের গতিবিধিকে সর্বক্ষণ ভুল দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের কথাবার্তা থেকে ভুল অর্থ বের করে। এসব নেতিবাচক দিক যে কতো বেশি ক্ষতিকর তা তারা উপলব্ধি করতেও অক্ষম।

এ ধরনের খুঁতখুঁতে মন নিয়ে কোন স্বামীর দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারে না। তারা সব সময় স্ত্রীদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে যে তাদের অনুপস্থিতিতে স্ত্রীরা কার সাথে মেলামেশা বা কি ধরনের কথাবার্তা বলছে, কি করছে? আসলে এসব হচ্ছে শয়তানী প্ররোচনা। এ ধরনের ভুল মানসিকতার কারণে কতো যে অঘটন ঘটছে কত যে দুর্ঘটনা ঘটছে তার হিসেব নিকেশ নেই। এতে করে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং অবাঞ্ছিত পরিণাম নেমে আসে। ফলশ্রুতিতে হাজারো বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে এজন্যে প্রিয়নবী এটাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্ম বলে ঘোষণা করেছেন এবং মুসলমানদেরকে এথেকে বেঁচে থাকার আদেশ দিয়েছেন।

হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন–

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে স্ত্রীর কাছে এ উদ্দেশ্যে এসো না যে, সে তা পাহারাদারী করছে অথবা তার ভুলভ্রান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।" (মুসলিম)

এর অর্থ এই যে স্বামী যেন তার স্ত্রীর কাছে হঠাৎ করে না আসে। কেননা, এতে করে তাদের গোপন ভুলগুলো দৃষ্টিগোচর হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইসলাম নারীদের এসব স্বাভাবিক ভুলভ্রান্তির দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং নারীদের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছে।

ইমাম ইবনে আযম বলেন–

"নারী জাতির প্রতি এতবড় আস্থা ও বিশ্বাস এবং নম্রতা পূর্ণ ব্যবহারের নির্দেশ শুধু ইসলামই দিয়েছে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও ক্ষমা ও উদারতার এ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না।"

ইসলামের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনের সুখও সাফল্যের জন্যে নারীদেরকে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "আমি প্রিয়নবী ﷺ-র পাশে বসেও পুতুল খেলা করেছি।"

এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল যে, মা আয়েশা (রা) প্রিয় নবীর ﷺ পাশে বসে পুতুল নিয়ে খেলা করেছন, কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ তাঁকে তা করতে নিষেধ করেননি।

অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন–

"আমি আল্লাহর রাসূলের ওখানে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার সাথে আমার বান্ধবীরাও থাকত, তারা আমার সাথে খেলত। প্রিয়নবী ﷺ যখন

আসতেন তখন ওরা লুকিয়ে পড়ত। তিনি তাদেরকে খুঁজে বের করে আমার কাছে পাঠাতেন যেন তারা আমার সাথে খেলতে পারে।" (বুখারী ও মুসলিম)

এসব হাদীসের আলোকে যেকোন ব্যক্তি সহজে অনুমান করতে পারেন যে, উম্মুল মু'মিনীনদের সাথে প্রিয়নবীর দাম্পত্য সম্পর্ক কত সহজ-সুন্দর ও স্বাভাবিক ছিল এবং তাদের আনন্দে রাখার জন্যে তিনি কি সুন্দর সুযোগ প্রদান করতেন।

প্রিয়নবীর ﷺ উম্মত হিসেবে সাধারণতভাবে সকল নারী, বিশেষ করে স্ত্রীদের সাথে সহজ স্বাভাবিক ও নম্র ব্যবহার করা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। আমাদের স্ত্রীদের সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে তাদের রুচি ও আনন্দ উল্লাসের চাহিদা মোতাবেক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বামীর অধিকার

ইসলাম স্বামীদেরকেও কয়েকটি অধিকার দিয়েছে। আমরা নিচে তার ওপর আলোকপাত করছি।

স্বামীর আনুগত্য

স্ত্রীরা সব রকমের সৎকর্মে অর্থাৎ ইসলামের নির্ধারিত সীমা অনুযায়ী স্বামীর আনুগত্য করবে। স্বামী যদি সহবাসের জন্যে আহ্বান করে তাহলে স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেবে। এক্ষেত্রে বিনা কারণে যদি অমত প্রকাশ করা হয় তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা বলে পরিগণিত হবে।

এ ব্যাপারে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

"স্বামী যখন নিজের স্ত্রীকে সহবাসের জন্য আহ্বান এবং সে যদি আসতে অস্বীকার করে এবং স্বামী যদি এতে দুঃখিত হয়ে রাত কাটায় তাহলে ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত এ ধরনের নারীর ওপর অভিসম্পাত করে।"

(বুখারী ও মুসলিম)

স্বামীর এ অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা আদায় করতে নিষেধ করেছে।

এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ বলেন–

"কোন নারী নিজ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখবে না।" (হাদীস)

স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী তার নিজের ইজ্জত আব্রু এবং স্বামীর ধনসম্পদের সংরক্ষণও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। অর্থাৎ স্বামী তাকে যেসব জিনিসের দায়িত্ব ন্যস্ত

করে গেছে সে তাতে অবহেলা করবে না। স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। এটা হচ্ছে স্ত্রীর ওপর স্বামীর সেই অধিকার যার ফরয হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন মতভেদ নেই।

প্রিয়নবী ﷺ উত্তম স্ত্রীর গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন–
"নিজের স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে নিজের এবং তার ধনসম্পদের ব্যাপারে আন্তরিকতাপূর্ণ থাকবে।" (ইবনে মাজাহ)

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর ধনসম্পদ থেকে তার অনুমতি ব্যতীতই সদকা দান করার অনুমতি দেয়। কিন্তু স্ত্রীর ধনসম্পদ থেকে স্বামী স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া কোন দান-খয়রাত করতে পারবে না। তবে ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর ধনসম্পদ অপচয় করার কোনো অনুমতি দেয় না। স্ত্রী এমন কোন কাজ করবে না যাতে স্বামী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ব্যাপারে মহানবীর বাণী হচ্ছে–

'যদি স্ত্রী স্বামীর ধনসম্পদ থেকে এতটুকু সদকা দান করে যা স্বামীর জন্যে দুঃখজনক না হয় তাহলে এর জন্য স্ত্রী পুণ্য পাবে এবং স্বামীও ততটা পুণ্য পাবে কেননা এ ধনসম্পদ তারই অর্জিত ছিল।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

স্ত্রীকে তার নিজের ব্যক্তিত্বের হেফাযতের অর্থ হচ্ছে তাই যা মহানবী ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণের সময়ে বলেছেন–

"তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমনি অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীদের তেমনি অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো, তারা তোমাদের এখানে এমন কোন ব্যক্তিকে আসতে দেবে না, যাকে তোমরা অপছন্দ কর।" (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

কেননা স্বামীকে ভালোবাসার দাবি হচ্ছে সেও তাকে ভালোবাসবে। আর এমন কাউকে ঘরে আসার অনুমতি দেবে না যার আগমনকে তার স্বামী অপছন্দ করে। তবে ওসব লোক যাদের ঘরে আসার ব্যাপারে তার স্বামীর কোন আপত্তি নেই তাদেরকে প্রয়োজনীয় কাজে ঘরে আসতে দিতে কোন বাধা নিষেধ নেই। যেমন স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মেহমান, ভাই ইত্যাদি যারা নিত্য কাজকর্মে আসা-যাওয়া করে থাকে, এমন লোকদের ঘরে আসতে দেয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, তাদের ঘরে আসার অনুমতি দেওয়ার অর্থ পর্দার অন্তরালে থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন বিছানাপত্র, চেয়ার, বালিশ ইত্যাদি পাঠানো। কিন্তু এদের করো সাথে বসে বসে গল্প করার বা কোথাও আসা-যাওয়ার কোনো অনুমতি নেই। শরীয়তের আইন অনুযায়ী তা নিষিদ্ধ। এমনকি স্বামীর অনুমতিতেও স্ত্রী তাদের সাথে বসে আলাপ আলোচনা বা কোথাও আসা যাওয়া করা নিষেধ।

দাম্পত্য জীবনে সহযোগিতার ভিত্তি

উপস্থাপনা : "এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এটা অন্যতম যে, তিনি তোমাদেরই অস্তিত্ব থেকে স্ত্রীদের তৈরি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে, এতে অনেক নিদর্শনাবলি রয়েছে ঐসব লোকদের জন্যে যারা চিন্তাভাবনা করে।" (সূরা রুম : আয়াত-২১)

প্রাচীনকাল থেকে নারীকে আত্মাবিহীন এক অপবিত্র প্রাণী বলে দাবি করা হচ্ছিল। পুরুষ নারীকে তার পাশবিক ক্ষুধার শিকারে পরিণত করত ঠিকই কিন্তু তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে তারা ছিল অপ্রস্তুত। ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, "নারী পশু নয় এবং মানুষ– তবে তাকে পুরুষের সেবার জন্যে তৈরি করা হয়েছে।" এ ছিল তৎকালীন সভ্য সমাজে নারীর মান-মর্যাদা। নারী জাতির প্রতি পৃথিবীর উন্নত মানুষগুলোর এ বিকৃত মনোবভাবকে সামনে রেখে যদি আমরা নারী সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষার অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করি তখন আমরা সন্তোষজনক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে, ইসলাম নারীকে অবনতি ও অবমাননার নিকৃষ্টতম ডাষ্টবিন থেকে তুলে এনে উন্নতি ও মর্যাদার উচ্চতম সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আল্লাহ এটাকে অন্যতম নিদর্শন বলে ঘোষণা করেছেন এবং যেহেতু নারী ও পুরুষ একই উপাদানে গঠিত তাই উভয়ের গুরুত্ব এবং মর্যাদাও একই সমতল বলে উল্লেখ করেন। ইসলাম আরও বলে– নারীকে স্বাধীন মানুষ ও স্ত্রীত্বের মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে– পুরুষের দাসী হিসেবে নয়।

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কুরআনে বলেন–
"এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এটা অন্যতম যে, তিনি তোমাদের জন্যে স্বয়ং তোমাদেরই মধ্যে থেকে স্ত্রীদের তৈরি করেছেন।" (সূরা রুম : আয়াত-২১)

এবং নারীর কাছে থেকে শান্তি অর্জন করতে বলা হয়েছে। বস্তুত: এ শান্তি হলো মানব প্রকৃতিতে সুস্থ সেই অনুভূতি যা সমাজকে সততা ও পবিত্রতার বুনিয়াদ সরবরাহ করে এবং এ শান্তিই বিশ্ব বসুধায় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেকার দাম্পত্য জীবনকে করে তুলবে সার্থক ও সুন্দর। শান্তি এমন এক আধ্যাত্মিক প্রয়োজন যা একজন পুরুষ কেবল তার স্ত্রীর কাছ থেকে লাভ করতে পারে। এ জন্যেই আল্লাহ উভয়ের মধ্যে পরস্পরের জন্যে প্রেম প্রীতি ও সহানুভূতির অনুভূতির সৃষ্টি করেছেন।

এসব বিচার-বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী অন্যান্য ধর্মের কথা অনুযায়ী সাপ, প্রেতিনী, ডাইনী বা রাক্ষুসী নয় বরং

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী হচ্ছে সমমর্যাদা সম্পন্ন এক স্বাধীন অস্তিত্ব এবং শান্তির প্রতীক। ইসলাম নারীকে এমন এক উৎস মনে করে যা থেকে স্নেহ, দয়া ও সহানুভূতির ফল্গুধারা উৎসারিত হচ্ছে বয়ে চলছে অনন্ত স্বর্গীয় ধারা।

মানুষের স্বভাবসুলভ প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিশেষ আইন-বিধি প্রণয়ন করেছে এবং জীবন সংগ্রামের কঠিন পথে কিভাবে পরস্পর স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে একে অন্যের সহযোগিতায় অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এখানে ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বুনিয়াদ সম্পর্কে আলোচনা করব, যা প্রত্যেকের জন্যেই জানা অত্যন্ত জরুরি এবং এরই ভিত্তিতে আপনারা পরিবার পরিজন ও আমাদের লেখকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে সহযোগিতা পাবেন। এ বিষয়ে বুনিয়াদি নীতি নির্ধারণ করেছে আল কুরআন–

"নারীদের জন্যেও ন্যায্য সঙ্গত তেমন অধিকারই রয়েছে যেমন পুরুষদের অধিকার তাদের ওপর রয়েছে। কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্ষমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২২৮)

এই কুরআনী আয়াত থেকে তিনটি নীতি পরিলক্ষিত হয়–

১. **সুবিচার** : এ আয়াত থেকে প্রথম যে কথাটি প্রকাশ পায় তা হলো– আল্লাহর দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী উভয়ের গুরুত্ব সমান। এভাবে স্বামী ও স্ত্রী হচ্ছে জীবন সফরে একে অন্যের সহগামী ও সহকর্মী এবং এ যাত্রায় উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব সমান। নারী বা পুরুষ কাউকেও পরস্পরের অধিকার হরণ করার কোন অধিকার দেয়া হয়নি। স্বামী স্ত্রীর অধিকার খর্ব ও ক্ষুণ্ন করতে পারবে না, আর স্বামীর অধিকার খর্ব করার অধিকার স্ত্রীর নেই। উভয়ের মধ্যে যে কারো অধিকার নিয়ে অনধিকার চর্চা করবে সেই সীমালংঘনের দায়ে দায়ী হবে।

২. **সাম্য** : দ্বিতীয় যে কথাটি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায় তাহলো উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টনে তাদের নিজ নিজ স্বভাব ও ক্ষমতার আলোকে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নারী ও পুরুষের অধিকার ও দায়িত্বে সমতা থাকলেও তাদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। নারী ও পুরুষের কাউকেও এমন কর্মে বাধ্য করা হয়নি যা তাদের রুচি ও স্বভাবের সাথে সংঘাতপূর্ণ হতে পারে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কত সুন্দর কথা বলেছেন–

"আমি নিজের স্ত্রীর কাছে তেমনি সেজেগুজে থাকি যেমন আমি তাকে নিজের সামনে সেজেগুজে থাকতে পছন্দ করি।"

এরপর তিনি এ আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করে শুনান–

"নারীদের ওপর যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি তাদের অধিকারও রয়েছে।"

এ আয়াতের মাধ্যমে নারীদের সঠিক অধিকার– এমনকি সাজসজ্জা ও রূপচর্চার স্বাভাবিক অধিকারও দেয়া হয়েছে। পুরুষ ও নারী তাদের পৃথক দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের সাজসজ্জার ধরণ-ধারণ ও বেশভূষা হবে ভিন্ন ভিন্ন। উভয়ে উভয়ের রুচি ও বৈশিষ্ট্যের অনুযায়ী উত্তম ও রুচিপূর্ণভাবে পোশাক পরিধান করবে এবং সাজগোজ করবে। এতে করে উভয়ই আন্তরিক আনন্দ পায়।

৩. **পারস্পরিক শলা-পরামর্শ :** আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে পুরুষ ও নারীদের সর্ব অধিকারের বিস্তারিত উল্লেখ করেননি– বরং এমন মূলনীতি ঘোষণা করেছেন যার আলোকে যে কোন যুগের যে কোন সমাজের নর-নারী তাদের নিজ নিজ চাহিদা অনুযায়ী অধিকার ও দায়িত্ব নিজেরাই নির্ণয় করবে। এ ব্যাপারে নর ও নারী উভয়কেই কুরআনী মূল নীতি অনুযায়ী নিজেদের অধিকার নিশ্চিন্তকরণের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

কুরআনের এ আয়াতটি আবার উল্লেখ করছি–

"নারীদের ওপর যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি তাদের অধিকারও রয়েছে।"

এখানে অধিকার বলতে আল্লাহ্ সবরকমের অধিকারকেই বুঝিয়েছেন, যা সাধারণভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় বিষয়াবলি এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অবশ্য সব ব্যাপারে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোন ক্ষেত্রেই যেন আল্লাহর নির্ধারিত সীমার বাইরে না যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পারস্পরিক ব্যাপারাদির নিষ্পত্তি বা সমস্যাবালির সমাধানের ব্যাপারে উভয়কে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরস্পর মিলেমিশে বসবাস করবে এবং কেউ কারও ওপর অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার জুলুম করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকবে। এ ব্যাপারে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীকে পারস্পরিক সমঝোতার নীতি মেনে চলতে উৎসাহিত করেছে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথেও পারস্পারিক পরামর্শ ও সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধান করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

যেমন এ প্রসঙ্গে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা নিম্নের আয়াতটি উল্লেখ করেন–

"যে পিতা চায় যে তার সন্তান পূর্ণ রেজায়াতের মেয়াদ পর্যন্ত দুধ পান করুক তাহলে মা তার শিশুকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে। এমতাবস্থায় শিশুর

পিতাকে প্রচলিত পন্থায় তাদের খাদ্য-বস্ত্র প্রদান করতে হবে। কিন্তু কাউকে তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি দায়িত্ব চাপানো ঠিক নয়। মাকে এজন্যে কষ্টে ফেলতে নেই যে শিশুটা তার এবং পিতাকেও এ কারণে বিরক্ত করা যাবে না যে শিশুটা তার। দুধপানকারিণীর এ অধিকার যেমন শিশুর পিতার ওপর রয়েছে তেমনি তার উত্তরাধিকারীর ওপরও রয়েছে। কিন্তু উভয়পক্ষ পারস্পরিক সন্তুষ্টি এবং পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চাইলে– এমন করাতে কোন বাধা নিষেধ নেই।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৩)

পূর্বেই বলা হয়েছে, এখানে তালাকা প্রাপ্তা স্ত্রী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। সে যদি তার সাবেক স্বামীর সন্তানকে দুধ পান করাতে থাকে এবং উভয়ে যদি পারস্পরিক শলাপরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দু'বছর পূরণের আগেই শিশুর দুধ ছাড়িয়ে নেবে তাহলে তাতে কোন বাধা নিষেধ নেই। কিন্তু উভয়ের সমঝোতা ব্যতীত যদি কোন একজন এ সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তা করার অধিকার তাদের কারো থাকবে না।

এ থেকে এটা বুঝা যায় যে, ইসলাম যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথেও এমন সমঝোতাপূর্ণ ব্যবহার করার আদেশ দেয় তাহলে স্ত্রীর সাথে সমঝোতার ওপর যে কতোখানি গুরুত্ব আরোপ করে তা সহজেই অনুমেয় করা যায়।

নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য

পারিবারিক ব্যবস্থাবলিকে ইসলামী ধাঁচে পরিচালনার জন্যে ইসলাম তিনটি বুনিয়াদ সরবরাহ করেছে। এ তিনটি বুনিয়াদ অর্থাৎ 'সুবিচার', 'সমতা' ও 'পারস্পরিক পরামর্শ' নিয়ে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এবার এ নিয়ে আলোচনা করা হলো যে, পারিবারিক ব্যবস্থা বা প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করা উচিত– পুরুষের ওপর না কি নারীর ওপর? এর জবাবে কুরআন এ ভারী দায়িত্বটি পুরুষের ওপর অর্পণ করে সঠিক সিদ্ধান্তই দিয়েছে। আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিতেও সিদ্ধান্তটি সঠিক মনে হয়। এছাড়া পুরুষই সন্তানের পিতা হয়ে থাকে। বংশবিস্তারের ধারাবাহিকতায় পুরুষের ভূমিকা গুরুতর, তাই পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ হওয়াই স্বাভাবিক। এর সাথে সাথে পরিবারের সকল ভরণ পোষণ এবং অন্যান্য ব্যবস্থাবলি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সেই পালন করে থাকে, এজন্যে জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রকৃতির অনুযায়ী পুরুষকেই পরিচালনার দায়িত্ব সোপর্দ করা উচিত।

অন্যদিকে পুরুষই হয় ঘরের কর্তা। পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ, তাদের সুখ-সুবিধে ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে লালন-পালনের সব দায়-দায়িত্ব

পুরুষকেই বহন করতে হয়। এসব ভারী দায়িত্ব নিজ থেকেই যেন ঘোষণা করছে যে, পরিবারের প্রধান পরিচালক নারীর পরিবর্তে পুরুষই হবে। কারণ ঘরে বাইরের এত বিরাট দায়িত্ব পালন করা নারীর স্বাভাবিক সক্ষমতার বাইরে। তবে নারী তার শলাপরামর্শ দিয়ে পুরুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এভাবে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শলাপরামর্শ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পারিবারিক ক্ষেত্রে পূর্ণ সুবিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিবার পরিজন বিশেষ করে সন্তানদের আয়-উপার্জন করে ভরণ-পোষণ শুধু তার দায়িত্বের অংশ নয়, বরং সমাজের খারাপ ও অপরাধীদের থেকে বাঁচিয়ে রেখে তাদেরকে সততা ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করাটাও তার অন্যতম দায়িত্ব কর্তব্য। এজন্যে ইসলাম নারীকে সংসারের বিভিন্ন কাজে স্বামীকে সহায়তা ও পরামর্শ দানের সাথে সাথে এ নির্দেশও দান করে যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে যেন এমন কোন ব্যক্তিকে ঘরে আসার অনুমতি না দেয়, যাকে তার স্বামী অপছন্দ করে থাকে।

বলাবাহুল্য, ইসলামের নির্দেশিত পথে নারীর কোনরকম অধিকার খর্ব বা ক্ষুণ্ন করা হয় না এবং নারীর ওপর কোন রকমের জুলুম অত্যাচারের আশংকাও থাকে না।

পুরুষের এ স্বাভাবিক প্রাধান্য স্বীকৃত বলেই বিয়ের পর স্ত্রীকে মাতাপিতার ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে আসতে হয়। এজন্যে বিভিন্ন ব্যাপারে তাকে স্বামীর সন্তুষ্টির দিকে সুদৃষ্টিও লক্ষ্য রাখতে হয় এবং জীবন যাপনের অন্যান্য সব ক্ষেত্রে স্বামীর ইচ্ছের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে চালিয়ে নিতে হয়।

স্ত্রী স্বামীকে বিশেষ কোন স্থান বা শহরে থাকার জন্যে বাধ্য করবে না এবং স্বামীকে তার সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী আয়-উপার্জনের জন্যে যে কোন স্থান বা শহরে বসবাস করার অধিকার দিতে হবে। এ ব্যাপারে স্বামীর কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার স্ত্রীর নেই।

এ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থেই পুরুষকে পরিবারের প্রধান হিসেবে কাজ করার বর্ধিত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে নারীর গুরুত্ব বা মর্যাদাকে খর্ব করা বা ক্ষুণ্ন করা হয়নি বা এতে নারীর অবমাননা ও অবহেলা করার কোন অবকাশও নেই। এর মাধ্যমে নারীকে বরং জটিল ও কষ্টকর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। মোটকথা, যেক্ষেত্রে যে কর্মটি পুরুষের দ্বারা অধিকতর সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করা যথাযথভাবে সম্ভব সেই ক্ষেত্রে পুরুষের ওপর বর্ধিত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক আসলে একান্ত আবেগ নির্ভর হয়ে থাকে। এখানে একে অন্যকে অন্তরের গভীর উপলব্ধি সহকারে ভালোবাসে। এ ভালোবাসা তাদেরকে করে দেয় সম্পূর্ণ একাত্ম একাকার। স্বামী-স্ত্রী যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে তখন তাদের মনে কোন বাহ্যিক প্রভাব বা আনুষ্ঠানিক আইনবিধির ছায়াপাত পরিলক্ষিত হয় না।

আইন-কানুনের অনেক ঊর্ধ্বে এক অপার্থিব প্রেম-প্রীতির বন্ধনে দুজন থাকে চির আবদ্ধ। তারা তখন কোন রীতিনীতি বা পারিভাষিক সাম্য সুবিচার ইত্যাদির লৌকিক আয়ত্বাধীনে থাকে না। তখন একথা চিন্তা করাই তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে যে, পরিবারের প্রধান কে? প্রেম, প্রীতি, অকৃতিম ভালোবাসার সেই মধুর পরিবেশে এসব প্রশ্ন নিতান্তই তুচ্ছ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমই হয় তখন মুখ্য বিষয়, আর সবকিছু নিছক লৌকিকতা– নিছক আনুষ্ঠানিকতা। প্রেমপ্রীতির সেই পরিবেশে নীতিবাক্য বা তত্ত্বকথার স্থান একান্তই গৌণ ও ক্ষুদ্র। ইসলাম এ স্বাভাবিকতাকেই স্বীকার করে এবং গুরুত্ব দেয়।

স্বামী স্ত্রীর এ যে ভালোবাসা, এ যে ত্যাগ-তিতিক্ষার অনুভূতি তা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। এক্ষেত্রে স্বামী যদি অবস্থাপন্ন হয়, তাহলে সে নিজ তাগিদেই স্ত্রী যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করে রাখে। আর স্বামী যদি গরিব বা দরিদ্র হয় তাহলে পতিব্রতা স্ত্রী শুধু যে ধৈর্যধারণ করে তাই নয় বরং বিভিন্ন উপায়ে স্বামীকে সাহায্য সহযোগিতাও করে থাকে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী ঘরের বাইরের দায়িত্ব পালন করেও স্বামীকে সহযোগিতা দান করে।

এমন পতিব্রতা এক স্ত্রীর বাস্তব দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের মেয়ে হযরত আসমার দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন যুবাইর ইবনে আওয়াসের স্ত্রী। হযরত যুবাইয়ের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। কাজেই ত স্বামীর সাহায্য সহযোগিতা কিভাবে যে করতেন তা তাঁর নিজের মুখেই করেন এভাবে– তিনি বলেন, "যুবাইরের ঘরের সব কাজকর্ম আমিই সমাধা করি। তাঁর ঘোড়াকে ঘোড়াশালে বাঁধি, ঘাস দিই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও করি। পানি ভরে এনে তাকে পানি পান করাই। আর পানিও আনি তিন ফার্লং দূর থেকে মাথায় বয়ে ...।"

এ যে তিনি স্বামীকে পারিবারিক কাজকর্মে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন– তা কোন আইন কানুনের অধীনে নয়, বরং এসব কাজ করতেন তিনি স্বামীর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা এবং একাত্মতার আবেগ অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েই।

পুরুষের দায়িত্বশীলতা

ইসলামী সমাজে স্ত্রীর ওপর পুরুষকে দায়িত্বশীল বানানোর বুনিয়াদ হলো কুরআন শরীফের এ আয়াত–

"পুরুষ নারীদের ওপর দায়িত্বশীল রয়েছে। এ ভিত্তিতে যে, আল্লাহ্ এদের মধ্যে একজনকে অন্যজনের ওপর মর্যাদা দান করেছেন এবং এ ভিত্তিতে যে পুরুষ তার ধনসম্পদ ব্যয় করে।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

এ দায়িত্বশীলতা দু'প্রকার–

১. বস্তুগত ও বাহ্যিক অনুভবজনিত ২. আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক।

প্রথম : বস্তুগত – আমরা দেখি যে পুরুষ আয়-উপার্জন করে এবং নারীর জন্য খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থাদি করে থাকে। একে আমরা অনুভবজনিত দায়িত্বশীলতা বলে থাকি, যা আমরা বাইরে থেকেও দেখতে পাই। আভিধানিকভাবেও দায়িত্বশীলতার এ অর্থ দাঁড়ায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ 'কাওয়াম' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আর বিখ্যাত আরবি অভিধান "আলকামুস আল মুহিত" এ "কাওয়াম"-এর অর্থ এভাবে করা হয়েছে– "পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর দায়িত্ব গ্রহণ করা, তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা এবং তার বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করা।"

এভাবে আভিধানিক দিক থেকেও পুরুষ নারীর ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং আল্লাহ্র কুরআনের অর্থও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাস্তবেও পুরুষ নারীর রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনা করে থাকে। দায়িত্ব পালন করে। কারণ দৈহিক ও প্রাকৃতিকভাবে নারীকে এমন অনেক পর্যায়ে অতিক্রম করতে হয় যখন নারীগণ পুরুষের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়ে পড়ে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থা ও শিশুকে দুধ খাওয়ানোর সময় নারী এতোটা দুর্বল হয়ে পড়ে যে অনেক সময় তার চলাফেরা করাটাও কঠিন হয়ে পড়ে। সে সময় সে স্বাভাবিকভাবে যে কোন পুরুষের সহযোগিতা কামনা করে যে তার নিরাপত্তা ও স্বার্থের তত্ত্বাবধান করবে। নারীদের এ প্রাকৃতিক অক্ষমতা ও অসহায়তার কারণে ইসলাম কেবল পুরুষদের ওপরেই জিহাদ ফরয করেছে এবং জিহাদের গুরুদায়িত্ব থেকে নারীসমাজকে মুক্তি দিয়েছে। এভাবে প্রাকৃতিকভাবেই পুরুষ নারীর স্বার্থ সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের জন্য দায়িত্বশীল।

দ্বিতীয় : আধ্যাত্মিক– এটাকে আমরা অন্য শব্দে চারিত্রিক বা আভ্যন্তরীণ দায়িত্বশীলতাও বলতে পারি। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াতটি এ অর্থের দিকেও ইঙ্গিতবহন করে। এখানে একটি দারুণ বিভ্রান্তি ও অপরাধের অপনোদন করাও জরুরি যে, কোন কোন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও জ্ঞানপাপী লোক এ আয়াতের

উল্লেখ করে এটা বুঝাবার অপচেষ্টা ও অপব্যাখ্যা করে যে, ইসলামে নারীর ব্যক্তিত্বের কোন গুরুত্ব নেই এবং তাকে মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়। অন্যদিকে সকল অধিকার পুরুষকেই দান করা হয়েছে যাতে নারীদের ওপর শোষণ অব্যাহত রাখা যায়। বস্তুত, এটা একটা অজ্ঞতাপূর্ণ ধৃষ্টান্ত অভিমত। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে এ ধরনের ভিত্তিহীন অপবাদ রটিয়ে থাকে।

কিন্তু আমরা যেমন আগেই উল্লেখ করেছি, পারিবারিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে ইসলাম পুরুষ ও নারী উভয়কেই একই ধরনের অধিকার ও গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং এক্ষেত্রে সমতা, সুবিচার ও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পারিবারিক প্রশাসন পরিচালনার আদেশ দেয়। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের কোন পর্যায়ে নারীর ব্যক্তিত্বকে খর্ব বা ক্ষুণ্ন করার বা তার মর্যাদা খাটো বা ছোট করার কোন রকম প্রশ্নই উঠতে পারে না। সে ইসলাম নারীকে যুগযুগের শোষণ ও লাঞ্ছনার নিষ্ঠুর অক্টোপাশ থেকে মুক্তি দিয়ে পরিপূর্ণ মানবিক অধিকার ও মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সেই ইসলামের বিরুদ্ধে যারা এ ধরনের অহেতুক ভিত্তিহীন বিভ্রান্তিমূলক অপবাদ রটিয়ে বেড়ায়– তাদের মানসিক বিকৃতি কুরুচি সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি? নিঃসন্দেহে ইসলাম দুনিয়ার নারী সমাজকে শত-শতাব্দীর জুলুম নিষ্পেষণের কবল থেকে চিরমুক্তি দান করেছে।

ইসলাম পুরুষকে নারীর ব্যক্তিগত ধনসম্পদ ব্যবহারের অনুমতি দেয় না। নারী তার ব্যক্তিগত ধনসম্পদ নিজেদের ইচ্ছেমতো স্বাধীনতা ব্যবহার করার পূর্ণাঙ্গ অধিকার রাখে। এক্ষেত্রে যদি পুরুষ কোন রকম অনধিকার চর্চা করতে চায় তাহলে নারী তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে গিয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারও রাখে।

আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে দাবি করতে পারি যে, ইসলাম নারীকে যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা আজ পর্যন্ত কোন ধর্ম বা মতবাদে পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি নারী স্বাধীনতার তথাকথিত চ্যাম্পিয়ন আধুনিক পাশ্চাত্যেও নারী তার সত্যিকার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এ অতি সম্প্রতিকালে যেসব দেশে নারীর কোন কোন অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে মাত্র। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করলে, দেখা যাবে যে, একমাত্র ইসলামই সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে তার যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে এবং তার ব্যক্তিত্বের গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়ে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী করে দিয়েছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো ইসলাম পুরুষকে তার স্ত্রীর ধর্ম বা মতবাদ পরিবর্তন করার ব্যাপারে জোরজবরদস্তি করার অধিকারও দেয় না। যেমন স্ত্রী যদি ইহুদি ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকে তাহলে সে তার ওপর টিকে থাকার অধিকার রাখে,

আর যদি খ্রিস্টান ধর্মমতে বিশ্বাসী হয়ে থাকে তাহলে তাতেও স্বামীর জোরজবরদস্তি করার কিছু নেই। স্ত্রীর ধর্মের ওপর আপত্তি বা নিন্দনীয় কিছু বলার অধিকারও স্বামীর নেই। স্ত্রীর ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করার ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারবে না।

পবিত্র কুরআনে নারীর এ অধিকার প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে–

"আজ তোমাদের জন্যে সব পবিত্র জিনিসকে হালাল করে দেয়া হলো। তাহলে আহলে কিতাবদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্যে হালাল; এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্যে হালাল তা যদি তারা ঈমানদারদের মধ্যে থেকে হোক বা ওসব জাতির যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে তোমরা মোহর আদায় করে বিয়ের মাধ্যমে তাদের সংরক্ষক হও। এটা নয় যে স্বাধীন ব্যভিচার করতে শুরু করবে কিংবা লুকিয়ে পালিয়ে মেলামেশা করবে।" (সূরা মায়েদা : আয়াত-৫)

অতএব আহলে কিতাবের কোন নারী যদি মুসলমান স্বামীর স্ত্রী হয়ে থাকে তাহলে তাকে তার ধর্ম পরিবর্তন করার জন্যে বাধ্য করা যাবে না। অবশ্য সে যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তাহলে অন্য কথা। কেননা, আল্লাহ এটাও ঘোষণা করেছেন যে "দ্বীনে (ইসলামে) কোন জোরজবরদস্তি নেই।"

এখন বলা যায়, যে ইসলাম নারীকে তার ধনসম্পদ এবং ধর্ম ও বিশ্বাসের এতটা স্বাধীনতা দান করেছে এবং অন্যান্য সব অধিকার ও সমতা দান করেছে তার সম্পর্কে এটা কল্পনা করাও কি সম্ভব যে, সেই ইসলাম নারীকে পুরুষের হাতে শোষিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার সুযোগ দেবে? তাহলে ওইসব জ্ঞানপাপী পণ্ডিতরা কোন যুক্তিতে বলে যে, ইসলাম পুরুষকে নারীর ওপর অন্যায় কর্তৃত্ব করার বা নারীর অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ দিয়েছে?

আসলে পুরুষকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত পর্যায়ে বর্ধিত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে– যা মানব প্রকৃতির দাবি অনুযায়ী একান্তই যুক্তিযুক্ত। এরই মধ্যে একটি ক্ষেত্র হচ্ছে পারিবারিক দায়িত্ব। এ সম্পর্ক অনুযায়ী ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে সামরিক নেতৃত্ব। এর মাধ্যমে সে শত্রুর আক্রমণ থেকে কোনও জাতির স্বার্থ ও মান-মর্যাদা রক্ষা করে এবং প্রয়োজন হলে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, নারীত্বসুলভ স্বাভাবিক দুর্বলতা ও বিশেষ প্রাকৃতিক অসুবিধার কারণে নারীরা যথার্থভাবে সামরিক দায়দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে পুরুষদের বিশেষ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যে সক্ষমতা রয়েছে, যার কারণে সামরিক ক্ষেত্রেও পুরুষদের ওপরই অধিকারের গুরুদায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

নারীদের কয়েকটি স্বাভাবিক দুর্বলতা লক্ষণীয়

১. মাসিক ঋতু অর্থাৎ হায়েয, প্রসবকালীনে নেফাস, গর্ভধারণ ও প্রসব, শিশুকে দুধ খাওয়ানো, সন্তানের লালন-পালন ও অন্যান্য পারিবারিক কাজকর্মে রাত-দিনের ব্যস্ততা ইত্যাদি এমন কিছু রুটিন থাকে নারীর নিত্যদিনের আজীবন সাথী বলা যেতে পারে। অন্যদিকে পুরুষেরা স্বাভাবিকভাবেই এসব কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত। সেজন্যে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের দায়িত্ব পুরুষের ওপরেই অর্পণ করা হয়েছে।

এছাড়া আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সব যুগেই নারী দৈহিক শক্তির দিক থেকে পুরুষের তুলনায় অধিক দুর্বল প্রমাণিত হয়ে আসছে। তাদের দেহ অধিক পরিশ্রম ও কঠোরতা সহ্য করতে সক্ষম নয়, পুরুষের তুলনায় তাদের শক্তি সাহসও নিতান্তই কম।

২. গৃহস্থালী কাজকর্মে অধিকতর ব্যস্ততাবশতঃ বহিরাঙ্গণের বিভিন্ন জটিল কাজকর্মে তাদের অভিজ্ঞতাও খুব কম থাকে। তাদের কর্মক্ষেত্র, ঘর-পরিবার ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পর্যন্তই সীমিত। অন্যদিকে পুরুষের কর্মক্ষেত্র বাইরের জগতের ব্যাপকতায় পরিব্যাপ্ত। এ ব্যাপক ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা এবং বৈষয়িক জ্ঞান পুরুষেরই বেশি থাকে। বিভিন্ন কলাকৌশল ও উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কে পুরুষই বেশি ওয়াকিবহাল। এজন্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে বুদ্ধিগত ও শারীরিক শক্তির পার্থক্য থাকাটা অত্যান্ত স্বাভাবিক।

৩. নারীকে তার সন্তানের লালন-পালনে ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে কোন রকমের অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি বা শক্তির প্রয়োজন হয় না বরং প্রাকৃতিকভাবে যে নম্রতা-সরলতা ও সহজ আবেগ উপলব্ধি সে পেয়েছে তাই তার জন্যে যথেষ্ট। শিশুর সাথে শিশু হয়ে থাকতেই তার প্রকৃত আনন্দ। তাই শিশুর মতোই তার মানসিকতা। সে শিশুর মতোই হয় সৌন্দর্য ও কোমলতা প্রিয়। তার জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনাও শিশুসুলভ। এমনকি শিশুসুলভ কথা বলতে এবং শিশুর মতো অঙ্গভঙ্গি করতেই তার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। বিধিবিধান, শৃঙ্খলা ও গণ্ডির নীতি তত্ত্ব ইত্যাদির দিকে নারীর আকর্ষণ কমই পরিলক্ষিত হয়। অথচ এসব ব্যাপারে পুরুষের আবেগ-উদ্দীপনা সম্পূর্ণ আকর্ষণ কমই দেখা যায়। অথচ এসব ব্যাপারে পুরুষের আবেগ-উদ্দীপনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। পুরুষদের মধ্যে চেষ্টা সংগ্রাম, নীতি, তত্ত্ব, গভীর বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞানপিপাসা এবং শক্তি ও সাহসিকতার মনোভাব দেখা যায়। নারী পুরুষের মধ্যে এসব গুণবৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন যেন তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব সে পালন করতে পারে।

এতে করে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নারী সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই শান্ত, কোমল, সংবেদনশীল ও সৌন্দর্যপ্রিয় স্বভাবের অধিকারী। আর পুরুষ শক্তিমত্তা, সংগ্রাম সাধনা, জ্ঞানবুদ্ধি-ইচ্ছাশক্তি ও কর্মকৌশলের অধিকারীণী।

নারীর তুলনায় পুরুষের এসব ব্যতিক্রম গুণবৈশিষ্ট্য এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রাধান্য একটা সর্বজন স্বীকৃত সাধারণ সত্য কথা। এজন্যে বুদ্ধিগত ও প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রধান দায়িত্বশীল করাটাই যুক্তিসঙ্গত। এরপর এটাও তো জানা কথা যে, পৃথিবীর যত বিপ্লব, যত সংস্কার ও সংশোধনী আন্দোলন এবং গণসংগ্রামের নেতৃত্ব সবসময় পুরুষই দিয়ে আসছে তারই ফলশ্রুতিতে পুরুষেরা জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে বরাবরই এগিয়ে রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তার জ্ঞান ও অবগতি রয়েছে ব্যাপক। সামরিক শক্তি ও কলাকৌশলের ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতাই বেশি। এসব কারণে পুরুষেরাই আদিকাল থেকে সমাজের ভালোমন্দ দেখাশোনা করে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

এভাবে জীবনের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যখন তখন যোগ্যতা ও নেতৃত্ব সর্বজন স্বীকৃত তখন ছোটখাটো ব্যাপারে যে তার প্রাধান্য থাকবে তাতো স্বাভাবিকই। সে যেমন পারিবারিক দেখাশুনা করে, তেমনি রণাঙ্গণে গিয়ে যুদ্ধ করে, বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্বদান করে এবং সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বও পালন করে। এসব প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আলোকে নারীর ওপর পুরুষকে দায়িত্বশীল করণ সংক্রান্ত কুরআনী আয়াতের আসল তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আজকাল নবজাগৃতি ও প্রগতিশীলতার নামে যেসব কথাবার্তা অহরহ শোনা যাচ্ছে তা কোন নতুন কথা নয়। প্রিয়নবীর যুগেও কিছু সংখ্যক মহিলা পুরুষের মতো পুরুষের বরাবর দায়িত্ব ও অধিকার পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

যেমন উম্মে সালমা একবার কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে মহানবী ﷺ কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করেন যে–

"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের উপরও যদি জিহাদ ফরয করে দেয়া হতো যেমন পুরুষদের ওপর রয়েছে তাহলে আমরাও পুরুষদের সমান পুরস্কার ও প্রতিদান পেতাম।"

তাদের সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়–

"আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকে অন্যান্যদের তুলনায় বেশি দিয়েছেন তার আকাঙ্খা করো না। যা কিছু পুরুষরা আয় করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে, আর যা কিছু নারীরা আয় করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩২)

এটা বলে আল্লাহ্ সামাজিক বিশৃঙ্খলার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। নারীদের পক্ষে পুরুষদের জন্যে নির্ধারিত কর্মে হস্তক্ষেপ করা ভুল। কারণ এতে করে প্রকৃতির উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হয়ে যাবার আশংকা থাকে। সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে মানব জীবন গড়ে তোলার জন্যে আল্লাহ্ যে আইন প্রবর্তন করেছেন– একে অন্যের কর্মে হস্তক্ষেপ করার ফলে তার উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলাদা আলাদাভাবে বণ্টন করে রেখেছেন এবং সে হিসেবে তাদের প্রতিদান ও পুরস্কারের ইনসাফ ভিত্তিক ব্যবস্থাও করে রেখেছেন।

তারই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ বলেছেন–
"যেমন কর্ম পুরুষ করবে সেই মোতাবেক তাদের প্রতিদান দেয়া হবে এবং যেমন কর্ম নারী করবে সেই অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দেয়া হবে।"

(সূরা নিসা : আয়াত-৩২)

আর এ প্রতিদান বা পুরস্কার শুধু জিহাদ বা এ ধরনের অন্যান্য কর্মের জন্যে নির্ধারিত নয় রবং পুরুষের জন্যে জিহাদের যে পুরস্কার সেই একই পুরস্কার নারীকে তার নির্ধারিত কাজের জন্যে দেয়া হবে। সুতরাং নারীকে নিজের কাজেই মনোযোগ দেয়া উচিত আর পুরুষ তার নিজের কাজে মন দেবে। পরস্পর কারো কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করবে না। কারণ তাতে করে শুধু বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি হবে। তাছাড়া তা হবে আল্লাহর পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপেরই নামান্তর এবং প্রাকৃতিক বিধিবিধানের পরিপন্থী কর্ম।

প্রিয়নবী নরনারীকে এ বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যেসব মহিলা এ স্বাভাবিক বিধিবিধানকে অমান্য করে সীমালংঘন করে পুরুষালী বেশভুষা গ্রহণ করেছে তাদের অভিসম্পাৎ করেছেন। একইভাবে নারীর বিশেষ কর্মক্ষেত্রে পুরুষের হস্তক্ষেপও বাঞ্ছনীয় নয়। বস্তুত, নারীকে তার নিজ ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব পালন করেই কৃতিত্ব অর্জন করতে হবে। প্রকৃতি তার জন্যে যে কর্মসীমা নির্ধারণ করেছে সেটাই তার জন্যে উপযুক্ত স্থান। আল্লাহ্ তার জন্যে তার যোগ্য ক্ষেত্র ও কর্ম নিযুক্ত করে দিয়েছেন, এটাই স্বাভাবিক বিধি, আর এরই ওপর নির্ভর করছে সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি।

নারীর ওপর পুরুষের মর্যাদা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য ও দায়িত্বশীলতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ নারীর ওপর শোষণ-জুলুম করবে বা তার অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। আসলে পুরুষকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে শুধু পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে। এর উদ্দেশ্যে পুরুষের ভিন্ন কোন মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য দান করা নয়। আল্লাহর কুরআনের আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য এটা নয় যে, পুরুষ মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক থেকে নারীর ওপরে। না তা নয়। অধিকার মর্যাদা ও গুরুত্ব নারী পুরুষের সমানই। তবে প্রাকৃতিক কারণে তার ওপর শুধু দায়িত্বটাই বেশি অর্পণ করা হয়েছে। কুরআন নারী ও পুরুষের একই গুরুত্ব ও মর্যাদার উল্লেখ করে ঘোষণা করেছে যে 'উভয়ে একই উপাদান থেকে সৃষ্ট।'

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–
"জবাবে তাদের প্রতিপালক বলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে কারো কর্ম বিফল করি না– তা নারী হোক বা পুরুষ হোক, তোমরা সাবই একে অন্যের সম অস্তিত্ব।" (সূরা মায়েদা : আয়াত-১৯৫)

এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পুরুষকে নারীর উপরে বিশেষ কোন মর্যাদা বা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পুরুষ ও নারীর পার্থক্য ঠিক একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পার্থক্যের মতোই। দেহের কোন কোন অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় বেশি কাজ করে, কিন্তু তাই বলে তার প্রাধান্য বা বিশেষ মর্যাদা নেই। দেহের সব অঙ্গই সমান গুরুত্বের অধিকারী। নর ও নারীর অবস্থাও ঠিক একই রকম। আল্লাহর কাছে মর্যাদা শুধু তারই বেশি হবে যে সৎ ও খোদাভীরু–তা সে, নারী হোক বা নর। এছাড়া আল্লাহর দরবারে দৈহিক পার্থক্যের কোন গুরুত্ব নেই।

এরই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন–
"আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকে অন্যান্যদের তুলনায় বেশি দিয়েছেন তার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর না। যা কিছু পুরুষেরা অর্জন করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে, আর যা কিছু নারীরা অর্জন করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ। হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে তাঁর দয়া কামনা করতে থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসেরই জ্ঞান রাখেন।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩২)

এথেকে আরো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পুরুষের প্রাধান্যটা কেবল বাহ্যিক অনুভব জনিত দায়িত্বের ক্ষেত্রেই সীমিত। নয়তো মানুষ হিসেবে তার গুরুত্ব ততটুকুই যতটুকু একজন নারীর রয়েছে।

একই অর্থবোধক অন্য আয়াত হচ্ছে–
এখানে রিযিকের বাড়তি-কমতি আইনবিধি বর্ণনা করে আল্লাহ্ কারো মানমর্যাদা হ্রাস-বৃদ্ধি করছেন না। আসলে এটা হচ্ছে এমন এক স্বভাবসম্মত পারস্পরিক নির্ভরশীল বণ্টন ব্যবস্থা– যাতে সব লোক একে অন্যের সেবায় আসতে পারে।

মোটকথা এই যে, সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়েরই পৃথক পৃথক মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে যে রকমের আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও সৎ উদ্দেশ্যে পালন করবে আল্লাহর দৃষ্টিতে সে ততটুকু গুরুত্ব ও মর্যাদা পাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রী সংখ্যা :

"আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচারী পুরুষ এবং ব্যভিচারী নারীকে পছন্দ করেন না।"
(দারকুতনী, তাবরানী, দায়লামী)

উপস্থাপনা : ইসলাম প্রাচীন যুগীয় ও যাযাবরীয় যে কয়টি প্রচলনকে নির্দোষ মনে করে অবশিষ্ট রেখেছেন এর মধ্যে একটি হলো একাধিক স্ত্রী প্রসঙ্গে। বহুবিবাহের প্রচলিত ইসলামের আগেও গোটা পৃথিবীতে সভ্য ও অর্ধসভ্য জাতিসমূহে বিশেষ করে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে স্ত্রীসংখ্যার ওপর কোন রকমের বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল না। তখন যার যত ইচ্ছা স্ত্রী রাখার স্বাধীনতা ছিল। এটাকে কেউ কোনদিন খারাপ মনে করেনি।

এ ধরনের অবস্থাতেই বিশ্বমানবতার সামনে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। ইসলাম যেহেতু সর্বমানবতার সামগ্রিক সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্যে এসেছে তাই সেহেতু বহুবিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টিও ইসলামের বিবেচনাধীনে আসে। ইসলাম এটাকে সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণাও করেনি, আবার তার খোলা অনুমতিও দেয়নি বরং বহু বিবাহের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করে তাকে শর্তসাপেক্ষ করে দিয়েছে যেন বহুবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব দূর হয়ে যায় এবং কেবল কল্যাণকর দিকটি অবশিষ্ট থাকে।

ইসলাম বহুবিবাহের ওপর যে বিধি-নিষেধ ও শর্ত আরোপ করেছে তা কুরআনের বর্ণনায় বলা যায়–
"যেসব নারী তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য থেকে দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার জন বিয়ে কর। কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে তাদের সাথে সুবিচার করতে পারবে না তাহলে কেবল একটি স্ত্রীই গ্রহণ কর অথবা ওইসব নারীকে স্ত্রীত্বে আনো যারা তোমাদের অধিকারে এসেছে; অবিচার থেকে বাঁচার জন্যে এটা অধিকতর উত্তম" (সূরা সূরা নিসা : আয়াত-৩)

একাধিক স্ত্রীর উদ্দেশ্য যৌনতৃপ্তি অর্জন নয়

এ বিষয়ে অধ্যয়ন করার আগে যেসব বুনিয়াদী জ্ঞান অর্জনের একান্ত প্রয়োজন তা হলো, ইসলামে বিয়ের উদ্দেশ্য নিছক যৌনতৃপ্তি লাভ নয় বরং মানব অস্তিত্বের ধারা অব্যাহত রাখা।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

"এখন তোমরা স্ত্রীদের সাথে রাত্রি যাপন কর এবং সেই উপকার অর্জন কর যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

ইসলামী বিশেষজ্ঞরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন– এ আয়াতে সহবাসের উদ্দেশ্য নিছক যৌনতৃপ্তি অর্জনের কথা বলা হয়নি বরং এর উদ্দেশ্য মানব বংশধারা অব্যাহত রাখার। কারণ "সেই উপকার অর্জন কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন" –এর এ অর্থই দাঁড়ায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য।

"এক ব্যক্তি প্রিয়নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল যে, "হে আল্লাহর রাসূল! একটি মহিলা খুবই সুন্দরী ও রূপসী। কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করব?" প্রিয়নবী ﷺ জবাবে বললেন : 'না'। দ্বিতীয়বার সেই ব্যক্তি আবার উপস্থিত হয়ে নিজের আগের প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করল। এবারও প্রিয়নবী ﷺ বললেন : 'না'। এমন মহিলার সাথে বিয়ে কর যে সুন্দরী-রূপসী হওয়ার সাথে সাথে সন্তান উৎপাদনও করতে পারে। যেন রোজ হাশরে আমি আমার উম্মতের আধিক্যের ওপর গৌরব করতে পারি।"

আমরা এটা অবশ্য জানি না যে, প্রশ্নকর্তা ব্যক্তিটি অবিবাহিত ছিল, নাকি বিবাহিত। কিন্তু সে যে মেয়ে লোকটির রূপে এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে, সে বন্ধ্যা জানা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে রাজী ছিল। কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ তা করার অনুমতি প্রদান করেননি। আর এ অনুমতি না দেয়ার পরিষ্কার অর্থ হলো বিয়ের উদ্দেশ্য কেবল যৌনতৃপ্তি অর্জন করা নয়: বরং বংশ বিস্তার লাভ করা। যেহেতু এ বিয়েতে বংশবিস্তারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই প্রিয়নবী তার অনুমতি দেননি। এখন প্রশ্নকর্তা বিবাহিত হয়ে থাকুক বা অবিবাহিত উভয় ক্ষেত্রেই একই যুক্তি কার্যকর হয়েছে যে, ইসলামে বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য বংশবিস্তার করা, যৌন সম্ভোগ বা যৌনতৃপ্তি অর্জন করা নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু যৌন উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে বিয়ে করা অপছন্দনীয়।

যারা কেবল যৌন সম্ভোগের উদ্দেশ্যে বিয়ে করে তাদের উদ্দেশ্য করে মহানবী ﷺ বলেছেন-

"আল্লাহ্ তা'আলা সম্ভোগকারী পুরুষ ও সম্ভোগকারিণী নারীদের ভালোবাসেন না।" তাবারী ও দারে কুতনীতে একই বিষয়ভুক্ত অন্য এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন- "বিয়ে কর এবং তালাক দিও না, কেননা আল্লাহ্ সম্ভোগকারী ও সম্ভোগকারিণীদের পছন্দ করেন না।"

একাধিক স্ত্রী- নিছক অনুমতি মাত্র

উপরের হাদীস দুটির আলোকে আমরা কুরআনে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট আয়াতটি সম্পর্কে চিন্তা করলে এটা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, একাধিক বিয়ের অনুমতি দানের উদ্দেশ্য কোন অর্থেই যৌনসম্ভোগ বা যৌনতৃপ্তি অর্জন নয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরের বিশেষজ্ঞবৃন্দ বলেছেন, এর অর্থ হলো- দ্বিতীয় বিয়ে কেবল তখনই হালাল বা বৈধ হবে যখন তা করা শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে না।

অন্য কথায় শুধু বিশেষ অবস্থা যেমন প্রথম স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, বা এত বেশি রুগ্ন হয়ে পড়ে যে, স্ত্রীত্বের দাবি পূরণে অক্ষম থাকে, বা দেশে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে পুরুষের সংখ্যা হ্রাস হয়ে পড়ে- তখন বিধবা ও অবিবাহিতা নারীদের বৃহত্তর স্বার্থে সক্ষম ও স্বচ্ছল পুরুষেরা- একাধিক বিয়ের অনুমতি পাবে। তাও এ শর্তে যে, তারা স্ত্রীদের সাথে সমতা ভিত্তিক ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করবে।

সীমা নির্ধারণই উদ্দেশ্য- স্বেচ্ছাচারিতা নয়

কুরআনের সেই আয়াত যা থেকে একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা হয় তা আসলে লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতার সামনে সীমা নির্ধারণ করার জন্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাজেই কুরআনের এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

"আর যদি তোমার শংকা হয় যে, ইয়াতীমদের সাথে সুবিচার করতে পারবে না তাহলে যেসব নারী তোমাদের পছন্দ হয় দুই-দুই, তিন-তিন এবং চার-জনকে বিয়ে কর কিন্তু যদি তোমার আশংকা হয় যে তাদের সাথে সুবিচার অর্জন করতে পারবে না তাহলে একটি স্ত্রীই রাখো অথবা ওসব স্ত্রীকে স্ত্রীত্বে নাও যারা তোমার অধিকারে এসেছে, অবিচার থেকে পরিত্রাণের জন্যে এটা অধিকতর উত্তম।"

(সূরা নিসা : আয়াত-৩)

কুরআন বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা এ আয়াতের পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন- 'আরববাসীরা তখন ইয়াতীমদের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণে এজন্যেই ইতস্তত করত

যে, ঘটনাচক্রে তাদের ওপর যেন অবিচার, অত্যাচার না হয়ে যায়। কিন্তু নারীদের বেলায় তাদের কোনরকম ইতস্তত বোধ ছিল না। নারীদের সাথেও যে সুবিচার ও সমতাপূর্ণ ব্যবহার করা প্রয়োজন এটা তাদের কাছে দুর্বোধ্য কথা ছিল।

কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে এ শিক্ষা প্রদান করা হলো যে, যুলুম অবিচার যার ওপরেই করা হোক না কেন তা জুলুম এবং অবিচার বলেই গণ্য হবে, তা ইয়াতীমদের ওপর হোক বা নারীদের ওপর; সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষমতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পার এবং তোমাদের স্ত্রীদের সংখ্যা যত হবে তাদের অধিকারও ততটা বহাল থাকবে এবং তোমরাও তাদের সাথে সুবিচার করতে পারবে।

আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন–
"তোমরা যদি ইয়াতীমদের অধিকারের ক্ষেত্রে অবিচার করতে না চাও এবং তাকে বিরাট পাপ মনে কর তাহলে নারীদের ব্যাপারেও সেই একই অনুভূতি পোষণ কর এবং অন্ততপক্ষে বিয়ে কর, কারণ এতে করে নারীদের ওপর অবিচারের আশংকাও কমে যায়।"

তাবারীয় গ্রন্থকার ইবনে আব্বাস, সাঈদ বিন যুবাইর, কাতাদাহ এবং সুদ্দির বরাত দিয়ে এ আয়াতের পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন–
"অন্ধকার যুগেও লোকেরা ইয়াতীমদের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করাকে বিরাট পাপ মনে করত, কিন্তু নারীদের ব্যাপারে ধারণা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। তারা নারীর ওপর যুলুম অত্যাচারকে মোটেই অনুচিত মনে করত না, অতএব, এ আয়াতে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, যেভাবে তোমরা ইয়াতীমদের ধনসম্পদ আত্মসাৎকে বিরাট পাপ মনে কর এভাবে নারীদের অধিকারও সংরক্ষণ কর, আর এর সবচেয়ে উত্তমপন্থা হচ্ছে তোমরা অধিক সংখ্যায় বিয়ে কর এবং একান্ত প্রয়োজন হলে চারটা পর্যন্ত স্ত্রী রেখো, এর চেয়ে বেশি কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি এটাও ভয় থাকে যে তোমরা চারজন স্ত্রীর সাথে সুবিচার করতে পারবে না তাহলে শুধু একটা বিয়ে কর যতটার সাথে সমতাপূর্ণ ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে পার। তাবারীর গ্রন্থকার এ ভাষ্যকে অন্যান্য ভাষ্যের তুলনায় অধিকতর পছন্দ করেছেন।

কিন্তু যেহেতু স্ত্রীদের ব্যাপারে সম্পর্কটা আবেগ ও আন্তরিকার সাথে সম্পৃক্ত এবং প্রত্যেক স্ত্রীকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করা এবং একই রকম ব্যবহার করা অত্যন্ত দুরহ ব্যাপার। এ জন্যে স্ত্রীদের সাথে সুবিচারের মানদণ্ড হবে এই যে, কোন স্ত্রীকে বিশেষভাবে ভালোবাসতে গিয়ে অন্য স্ত্রীর অধিকার খর্ব হওয়ার আশংকা যেন না দেখা যায়।

কুরতুবী, যাহহাক এবং অন্যান্য মুফাসসির থেকে এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তার ইবারত হলো–

"এ আয়াতে সুবিচার করার অর্থ হচ্ছে এই যে, সব স্ত্রীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তাদের মধ্যে কোন রকমের পার্থক্য করবে না; এমন যেন না হয় যে, কাউকে অতিমাত্রায় ভালোবাসবে এবং অন্যের জীবনকে দুঃখে ভরে দেবে। এটা করা শরীয়তের আইনে হারাম (নিষিদ্ধ)। বাকি রইলো আন্তরিকতার কথা। সেক্ষেত্রে সবার সাথে সমতা রক্ষা করা মানব প্রকৃতির বিরোধী।"

যাইহোক, প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত সেসব জুলুম অত্যাচারের অবসানের জন্যে নাযিল হয়েছিল যা অন্ধকার যুগের লোকেরা একাধিক বিয়ে করে নারীদের ওপর চালিয়ে থাকত। আর এ আয়াতে একাধিক বিয়ের আদেশ দেয়া হচ্ছে না বরং নারীদের ওপর সুবিচার প্রতিষ্ঠার ওপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন বিশেষে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হচ্ছে মাত্র।

কুরতবী যাহহাক, তাবারী, যামাখশারী প্রমুখ এবং পূর্ববর্তীদের মধ্যে ইবনে আব্বাস, সাঈদ বিন জবীর, সুদ্দি, কাতাদাহ এবং অন্যান্য মুফাসসিররা এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। তাবারী তো এতটুকু বলেন যে, এ আয়াত বস্তুতপক্ষে অধিক বিবাহের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছে কেননা তাতে করে সুবিচারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

দারিদ্র্যে একাধিক স্ত্রী নিষিদ্ধ

পবিত্র কুরআনে কোন কোন আয়াতে একাধিক স্ত্রীর অনুমতি দেয়া হলেও সাথে সাথে অন্যান্য শর্ত– শরায়েতও আরোপ করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম শর্ত হচ্ছে ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা।

কাজেই আয়াতে বলা হয়েছে–

"এটা তোমাদেরকে অভাব-অনটন থেকে বাঁচানোর জন্যে এক উত্তমপন্থা।"

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (র) বলেন: আরবি ভাষায় "রাজুলুন আয়েলুন" অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অর্থে ব্যবহার করা হয়। এর মূল অক্ষর সমষ্টি হলো আইন-ওয়াও-লাম। এথেকে বহুবাচক আয়াল শব্দ গচ্ছিত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে মানুষের সন্তান-সন্ততি যত কম হবে তার ব্যয়ও তত কম হবে। আর ব্যয় কম হলে মানুষ অনটনেও পড়বে না। এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একটিমাত্র বিয়ে করলে যেখানে অবিচার অত্যাচারের আশংকা থাকে না তেমনি তাতে করে দারিদ্র্যের আশংকাও কমে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন : "পরিবার-পরিজন কমানোর জন্য এটা উত্তম পন্থা।"

অন্যান্য মুফাসসিররা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন : "নারীদের ওপর অবিচার করা থেকে বাঁচার জন্যে এটা সবচেয়ে উত্তমপন্থা।" ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (র) এ অর্থ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করে বলেন যে, অধিকাংশ মুফাসসিরের কাছে এটাই হচ্ছে পছন্দীয় অভিমত। কিন্তু ইমাম রাজী নিজে আগে গিয়ে কাজীর মাধ্যমে শাফেয়ীর মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

এভাবে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্যে ব্যক্তির আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা শর্তসাপেক্ষ।

আভিধানিক অর্থের দিক থেকেও ইমাম শাফেয়ীর মতামত সঠিক ও যথার্থ। তিনি আভিধানিক ব্যাপারেও ছিলেন অনেক বিশেষজ্ঞ। কারণ তিনি শৈশব থেকেই অকৃত্রিম পল্লী পরিবেশে থাকতেন। আর পল্লীর ভাষা ছিল বিশুদ্ধ আরবি–সহজ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেখানে থাকার কারণে তিনি প্রাঞ্জল, সাবলীল ও বিশুদ্ধ আরবি শেখেন।

আলোচ্য বিষয়ে পবিত্র কুরআনের শব্দাবলিও তাঁর অভিমতের সমর্থন করে। এছাড়া পূর্বেকার আমলের কুরআন বিশেষজ্ঞ যায়েদ ইবনে আসলাম সাহাবী (রা), তাউস এবং জাবের ইবনে যায়েদের মতো বিখ্যাত তাবেঈনদের মতের সাথে তাঁর মতের সামঞ্জস্য রয়েছে। এছাড়া কুরতুবী এবং ফখরুদ্দিন রাজীর মতো কুরআন বিশেষজ্ঞদের একটি দলও তাঁর বর্ণিত মতের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

ইমাম বুখারী বলেন যে, ইমাম শাফেয়ীর বর্ণিত কুরআনী আয়াতের উদ্দেশ্যগত অর্থ হলো, ব্যক্তি নিজের সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও দেখাশুনা করবে, তাদের চাহিদা পূরণ করবে। এখন যে ব্যক্তির পরিবার পরিজন বড় আকার হবে তার ব্যয়ও হবে বেশি এবং তার পক্ষে হালাল ও সম্মানজনক উপায়ে উপার্জন কঠিন হয়ে পড়ে।

এসব বিশ্লেষণ থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম একাধিক বিয়ে করার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। একথা আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে। আমরা চাই, এ বিষয়ের সব দিক ও বিভাগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। তাহলে এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষার তাৎপর্য খুব ভালো করে প্রকাশ পাবে।

একাধিক স্ত্রীর অনুমতি কেবল বিশেষ প্রয়োজনে

পবিত্র কুরআনে প্রয়োজন বোধে চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি দানের সাথে সাথে বিভিন্ন আয়াতে এর জন্য বিভিন্ন শর্তও আরোপ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে একাধিক বিয়েকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে–
"এবং যদি তোমাদের সুবিচার না করতে পারার আশংকা থাকে তাহলে একটি বিয়েই কর।" (আল কুরআন)

"(কোন এক জনের প্রতি) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে যেও না।" (আল কুরআন)

বাস্তবতার প্রতি ঈঙ্গিত করে বলা হচ্ছে–
"(তোমরা নিজেদের) সব স্ত্রীদের মধ্যে একই রকম সুবিচার করতে পারবে না, তোমরা এর যতই ইচ্ছে পোষণ কর না কেন।" (আল কুরআন)

উপরে বর্ণিত প্রথম আয়াতের সারমর্ম হলো, "যদি তোমরা কোন একজন স্ত্রীর ওপর অবিচার বা অত্যাচারের আশংকাবোধ কর তাহলে একটার বেশি বিয়ে কর না। কারণ অত্যাচার করা যে হারাম এবং নিষিদ্ধ সে ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানই মতৈক্য পোষণ করে। আর অত্যাচার এমন এক জঘন্য ব্যাপার যা আল্লাহ নিজেই নিজের ওপর এবং তাঁর সব বান্দার ওপর হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

এক হাদীসে কুদসীতে স্বয়ং আল্লাহ বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন–
"হে আমার বান্দারা!" আমি অত্যাচারকে স্বয়ং নিজের ওপর এবং নিজের সব বান্দাদের ওপর হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের ওপরে অত্যাচার কর না।" (হাদীসে কুদসী)

এভাবে কুরআন শুরুতেই একাধিক বিয়ের উদ্দেশ্য পোষণকারীদের সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে দেয় যে– দেখ, স্ত্রীদের ওপর যেন কোন রকম জুলুম-অত্যাচার অবিচার না করা হয়। কারণ জুলুম অত্যাচার আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম ও নিষিদ্ধ। অতএব বিয়ের আগেই সব কিছু ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিয়ে করার পরে একথা ভাবলে চলবে না যে, যদি জুলুম অত্যাচারের আশংকা দেখা যায় তাহলে সংশ্লিষ্টজনকে তালাক দিয়ে দেবো!–তা চলবে না। কারণ এতে আরো অধিকতর জুলুমের আশংকা বিদ্যমান থাকে। এমন ব্যক্তির জন্যে একাধিক বিয়ে করা সম্পূর্ণ অবৈধ বা নিষিদ্ধ যে নিজের আবেগ-অনুভূতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম নয়।

দ্বিতীয় আয়াতে মানব স্বভাবের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, কোন এক স্ত্রীর দিকে আন্তরিকতার প্রাধান্য আংশিকভাবে হতেও পারে কিন্তু শুধু একজনের দিকে পুরো ধ্যান দিয়ে অন্যান্যদের অবহেলা করা চলবে না। সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসা সম্ভব না হলেও অধিকার কিন্তু সবাইকে সমানই দিতে হবে। ভালোবাসার ব্যতিক্রমটা স্বাভাবিক।

তৃতীয় আয়াতে স্পষ্টই বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যতই সম-সুবিচারের কথা বলনা কেন, প্রত্যক স্ত্রীর সাথে সমতাপূর্ণ সুবিচার করা কঠিন ও দুরহ। সুতরাং সাবধান! একটার বেশি বিয়ে করতে গিয়ে অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিও না।

বলাবাহুল্য, ইসলাম নিছক যৌনবিলাসিতার জন্যে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয় না। কাজেই একান্ত অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদেই এর অমুমতি রাখা হয়েছে।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির উদ্দেশ্য

কোনো বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী ব্যক্তির জন্যে একাধিক বিয়ের অনুমতির পিছনে ইসলামের মহত্তম উদ্দেশ্যটি খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন নয়। একটু চিন্তা করলেই সবাই বুঝতে সক্ষম যে, ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দানের অবকাশ কেন রেখেছে। আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি বাস্তব কারণ উল্লেখ করছি।

ক. মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সন্তান কামনা করে। বিয়ের পর প্রত্যেক পুরুষই পিতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। কিন্তু বিয়ের পর যদি সে জানতে পারে যে তার স্ত্রী সন্তান উৎপাদনে অক্ষম তাহলে সে কি সন্তান কামনার স্বাভাবিক স্বপ্ন পরিত্যাগ করবে নাকি বিকল্পপন্থা অবলম্বন করবে? ইসলাম এক্ষেত্রে পুরুষকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দান করেছে। কারণ এ বিপদের সময় ব্যক্তিকে চিরদিনের জন্যে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি না দিয়ে তাকে সন্তান লাভের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। কাজেই স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে পুরুষকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিয়ে ইসলাম স্বাভাবসিদ্ধ সঠিক কর্মপন্থাই গ্রহণ করেছে।

অনেক সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, স্বয়ং প্রথম স্ত্রী স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য বাধ্য করে এবং স্বয়ং তার স্বামীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে সতীনের সন্ধানে বের হয়। এমনকি নিজেই বিয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। নিজের স্বামীর সন্তান লাভের বাসনা পূরণের জন্যে সে সন্তুষ্টচিত্তে তার গৃহে সতীনকে বরণ করে নেয়।

এটাও দেখা গেছে যে, প্রথম স্ত্রী তার গৃহে সতীনের সন্তানদের নিজ সন্তানের মতোই আদর-যত্ন করে লালন-পালন করে এবং নিজের শূন্য কোলে সতীনের

সন্তান তুলে নিয়ে নারীত্বের পরম তৃপ্তি অনুভব করে। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অতএব স্বভাবের ধর্ম ইসলাম এ স্বাভাবিকতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন?

খ. খোদা না করুন স্ত্রী যদি এমন কোন দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যার কারণে তার স্ত্রীত্বের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন স্বামী বেচারা কি করবে?

পাশ্চাত্যের যৌন বিলাসী গোষ্ঠী হয়তো এর জবাবে বলবে যে, বিয়ে করা ব্যতীতই সে পরনারীর সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, কারণ পাশ্চাত্যবাসীরা ব্যভিচারকে কোন রকমের অপরাধ বলে মনে করে না। কিন্তু ইসলাম হলো শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলাপূর্ণ আদর্শের প্রতীক। সমাজকে সুন্দর কাঠামোর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই এর আবির্ভাব ঘটেছে। তাই অবৈধ, লজ্জাকর ও অসম্মানজনক এবং কোন রকমের ইতরামী নোংরামীপূর্ণ অশ্লীল কার্যকলাপের অনুমতি দিতে পারে না। সুতরাং যৌন নোংরামী ও ব্যভিচারের মূলোচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ইসলাম দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত স্ত্রীর স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিয়েছে।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজকাল মুসলমান নামধারী এমন কিছু জ্ঞানপাপী পাশ্চাত্য কুশিক্ষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে একান্ত নির্লজ্জভাবে ইসলামের একাধিক বিয়ের অনুমতিদানকে সমালোচনা করে। অথচ তারা তাদের পশ্চিমা প্রভুদের মতো পরনারী ও বেশ্যাদের সাথে কারো যৌন নোংরামীকে অপরাধ তো মনেই করে না, বরং সবরকমের ব্যভিচারকে উন্নতি ও প্রগতির লক্ষণ বলে বিবেচনা করে।

যাহোক, দূরারোগ্য রোগিনীর স্বামীর কাছে এ দুটি পথই উন্মুক্ত রয়েছে। এখন চাইলে সে ইসলামের অনুমতি অনুযায়ী দ্বিতীয় বিয়ে করে সম্মানজনক ও পরিচ্ছন্ন জীবন অধ্যায় শুরু করতে পারে– কিংবা নোংরামীর পথ বেছে নিতে পারে। এখন সম্মান ও কল্যাণের পথ কোনটা তা তাকে নির্বাচন করে নিতে হবে।

আমাদের মতে সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে শুদ্ধ রাখার জন্যে এবং নারী পুরুষকে পবিত্র ও সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্যে বিয়ের থেকে উত্তম আর কোন পন্থা নেই। এজন্যে জ্ঞান পাপীদের মতো না জেনে না বুঝে ইসলামের সমালোচনা না করে বিয়ের উত্তম পন্থা অবলম্বন করাই উচিত। কাউকে এত নীচে নেমে যাওয়া উচিত নয় যে, সে বিয়ে আর বেশ্যালয়ের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতেই অপারগতা প্রকাশ করবে। কোন কোন লোক মনে করে যে দ্বিতীয় বিয়ে প্রথম স্ত্রীর ওপর এক অস্বাভাবিক বোঝা। কিন্তু যারা একথা বলেন তাঁরা একই প্রশ্নের

কি জবাব দেবেন যে, বন্ধ্যা ও দুরারোগ্য রোগিনী স্ত্রীর স্বামীরা কোন স্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ করবে?

গ. কোন কোন মহিলা এমনও হয়ে থাকে যারা প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষের সংস্পর্শ পছন্দ করে না। স্বামী যতই চেষ্টা ও আবেগ প্রকাশ করুক না কেন এ ধরনের নারীরা কোনক্রমেই যৌন আবেগ অনুভব করে না। স্বভাবে তারা নিষ্ক্রিয় থাকে। ফলে স্বামী স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আসলে এটা হচ্ছে এক ধরনের স্ত্রীরোগ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এধরনের স্ত্রীরোগী বেশ পরিলক্ষিত হয়। এখন প্রশ্ন জাগে- প্রথমা স্ত্রীর মিলন থেকে বঞ্চিত স্বামী যদি এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে সেটা কি অন্যায় হতে পারে?

এভাবে আরো অনিবার্য কারণ দেখা যেতে পারে- যেখানে কোন না কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধ্য হয়।

ইসলাম স্বাভাবসম্মত ও বাস্তববাদী জীবনাদর্শ হিসেবে যেখানে পূর্ণাঙ্গ সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেয় সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যাবলি সমাধানের প্রয়োজনকেও গুরুত্ব দেয় এবং সাধারণ ও বিশেষ উভয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি সমস্যার সঠিক সমাধান দিয়ে থাকে।

বস্তুত, ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের স্বার্থকে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং পরস্পরকে পরিপূরক মনে করে। এতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, আমরা প্রত্যেকেই মুসলিম উম্মার সার্বিক উন্নতি অগ্রগতির জন্যে তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য মনে করি। আর এর সহজ ও স্বাভাবিক পথ হচ্ছে বিয়ে। এরই মাধ্যমে যে কোন জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। কাজেই শক্তি, সম্মান ও উন্নতির এতোবড় প্রভাবশালী মাধ্যমকে কোন মুসলমানই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ মিশরের উত্তরাঞ্চলের কথা উল্লেখ করতে পারি। সেখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বর। এখানকার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত এমনকি এখানে কাজ কর্মের জন্যে বাইরের কোন লোকেরও দরকার হয় না। এখানকার জনবসতি অত্যন্ত ঘন এবং সন্তান প্রজননের হারও বেশি। ক্ষেতখামার এতো বেশি হয় যে কোথাও এক টুকরো খালি জায়গা পড়ে থাকার উপায় নেই। কিন্তু সেখানকার কোন লোক একাধিক স্ত্রী ব্যতীত আর্থিক সমৃদ্ধি লাভের চিন্তাই করতে পারে না। একাধিক স্ত্রী যাদের আছে তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে সক্ষম। অথচ অবিবাহিত অবস্থায় সেখানকার পুরুষেরা দারিদ্র্যকেই নিজেদের কপালের লিখন বলে মনে করত- মিশরের উত্তরাঞ্চলের পর্যটনকারী যে কোন ব্যক্তি একথার সত্যতা স্বীকার করেন।

ঘ. প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান এ দিনটি পর্যন্ত জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ–বিগ্রহ চলে আসছে। এ যুদ্ধকালীন অবস্থায় রণাঙ্গণে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যে এর পিছনে জাতীয় অর্থনীতির গতিধারাকে অব্যাহত রাখার জন্যে সক্ষম লোকের প্রয়োজন যে কত বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ প্রসঙ্গে এটা উল্লেখযোগ্য যে, একাধিক বিয়ের কারণে প্রথম যুগের মুসলমানরা বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছিলেন। তাদের জনশক্তি সুসংগঠিত সুসংহত ছিল বলে একদিকে তারা অর্থনৈতিক অগ্রগতি সমৃদ্ধি অর্জন করেন এবং অপরদিকে শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা করে শত্রুকে পরাজিত করেন। দেশের পর দেশ তাঁদের পতাকাতলে একত্রিত হয়ে যায়। সে যুগে কখনো কোন ক্ষেত্রে সক্ষম লোকের অভাব দেখা যায়নি। তখন মুসলমানদের জনসংখ্যা ছিল যেমন পর্যাপ্ত তেমনি তারা সবাই ছিল সংগঠিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

আমাদের এ আধুনিক যুগে জার্মানির দৃষ্টান্ত সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে যখন একের পর এক যুদ্ধবিগ্রহের পরিণামে যুবকের বিরাট একটি অংশ নিতে হলে হিটলারের টনক নড়ে ওঠে। হিটলার তখন এটা চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, সে অসংখ্য লোক মারা গেছে তাতে জার্মানির জাতীয় অস্তিত্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন, আর এ সমস্যার একমাত্র প্রতিকার হিসেবে জার্মান জাতি একাধিক বিয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করে। ১৯৬০-এর ১৩ ডিসেম্বর দৈনিক আল আহরামে হিটলারের ওপর প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুরমানের ১৯৪৪ সালে লিখিত একটি প্রামাণ্যপত্র প্রকাশিত হয়। তাতে জার্মান উপ-প্রধানমন্ত্রী লেখেন যে, হিটলার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করেছিলেন যে, "জার্মান জাতির ভবিষ্যত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জার্মানির প্রতিটি পুরুষকে আইনগতভাবে দুটি বিয়ে করার জন্যে বাধ্য করা জরুরি।"

এ ছাড়া আরো একটি বাস্তবতা হলো এই যে, মহিলাদের তুলনায় যদি পুরুষদের সংখ্যা কমে যায় তাহলে এক মারাত্মক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। সমাজে বিবাহযোগ্য মেয়েদের সংখ্যা অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলে তখন একজন পুরুষ যদি কেবল একটি মাত্র বিয়ে করে তাহলে অন্যান্য অবশিষ্ট বিবাহযোগ্য মেয়েদের পরিণতি কি হবে? বলাবাহুল্য সমাজ যদি তাদের স্বাভাবিক দাবি পূরণের বৈধ পথ পরিহার না করে তাহলে তারা বিপথগামী হতে বাধ্য হবে। এভাবে সমাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য হবে। যুবতী মেয়েরা শুধু খেয়ে পরেই তো সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাদের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা পূরণও জরুরি।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিরোধিরাও এসব বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন। তাঁরা এটাও জানেন যে, বিয়ে ও একাধিক বিয়ের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ থাকার কারণে পাশ্চাত্য সমাজে যৌন নোংরামীর অবাধ স্রোত বয়ে চলেছে। আজ গোটা পাশ্চাত্য সমাজ যৌন অপরাধ প্রবণতার উন্মুক্ত বাজারে পরিণত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ বাস্তব অবস্থা জানা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক বর্ণচোরা লোক বৈধভাবে একাধিক বিয়ে করাকে অবৈধভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক পাপ বলে মনে করে। এদের কাছে পাপটাই প্রশংসনীয় এবং ন্যায়টা নিন্দনীয়।

এসব লোক বৈধ উপায়ে সন্তান উৎপাদনে নাক সিটকায় আর অবৈধ জারজ সন্তানদের সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণের দাবি করে। যেন বৈধ পিতার সন্তানেরা অবৈধ জারজ সন্তানের চেয়ে হীন কিছু! তথাকথিত আধুনিক আধুনিকাদেরই এসব হাস্যকর আন্দোলনগুলোর পরিণাম যে কি হবে তা খুবই পরিষ্কার অনুমান যোগ্য। এরা পাশ্চাত্যের মতো আমাদের সমাজকেও আবর্জনা পূর্ণ ডাস্টবিনে পরিণত করতে চায়।

এখানে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানির মহিলারা ব্যভিচার (যেনা)-কে আইনগত মর্যাদার দাবি তোলে এবং সারাজীবন নির্দিষ্ট কোন বেশ্যালয়ে কাটাতে এবং সামাজিক কোন মর্যাদা থেকে বঞ্চিত শিশুর মা হতে অস্বীকার জ্ঞাপন করে। তারা দাবি করে যে, তাদেরকে সাময়িকভাবে এক একবার এক একজন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দিতে হবে এবং এক মহিলা যে পুরুষকে পরিত্যাগ করবে অন্য মহিলা এসে তার স্থান পূরণ করবে।

তারা তাদের এ দাবি পুরুষের জন্যে একটি আন্দোলন গড়ে তোলে যাতে তাদের আওয়াজকে সর্বত্র পৌঁছানো যায় এবং ব্যভিচারের আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাদের এ হাস্যকর ও অবাস্তব দাবি ইউরোপে তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি, কিন্তু গোটা পাশ্চাত্য একদিকে বৈধ পন্থায় একাধিক বিয়েকে কঠোর সমালোচনা করে তার অন্যদিকে অবৈধ উপায়ে একই পুরুষকে কয়েকটি নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে আপত্তিকর কিছু মনে করে না। বলাবাহুল্য, পাশ্চাত্যের পুরুষদের মতো নারীরাও অবৈধভাবে বিভিন্ন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক রক্ষাকে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার বলে মনে করে।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আইনগত অনুমতি আসলে আপত্তিকর যা ভোগবাদী মানুষ নিছক যৌনকামনা চরিতার্থ করার জন্যে করে থাকে। বস্তুবাদী ও ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজে খাওয়া পরা আর স্ফূর্তি করাটাই হলো তাদের আসল উদ্দেশ্য। সেখানে বিয়ের স্বাভাবিক ব্যবস্থা অবহেলিত পদদলিত। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই বিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাদের ব্যভিচার ও যৌন নোংরামীর ফলে সমাজের কি ক্ষতি সাধন হচ্ছে তা ভেবে দেখার অবকাশ তাদের নেই। মোটকথা, যৌনস্বার্থ ব্যতীত পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের অন্য কোনোরকম মর্যাদা বা গুরুত্ব নেই।

এ পাপাচারের অবসান ও সমাজের সংস্কার কেবল আল্লাহর নির্দেশিত স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করেই করা যেতে পারে। এজন্যে আল্লাহর জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা একান্তই অপরিহার্য। ইসলামী শিক্ষার আলোকে মানুষের মনমস্তিষ্ক ও চিন্তাভাবনার পরিশুদ্ধি সাধন করতে হবে। লোকদেরকে ইসলামী আদর্শের সাথে পরিচিত করে সুন্দর আদর্শের অনুপ্রেরণা জাগাতে হবে। এরপরই এসব নোংরামীর উচ্ছেদ সহজ-সম্ভব হবে।

আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, আগেকার যুগের তুলনায় একাধিক বিয়ের প্রচলন আজকাল ক্রমশ কমে আসছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ আজ তার দায়িত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন এবং জীবনের উন্নতি সম্পর্কে ভালো করে অবহিত। এমন অনেক লোকও রয়েছেন যাঁরা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির জ্ঞান অর্জন করে নিজেদের মন-মানসিকতাও ক্ষমতাকে মহত্তম উদ্দেশ্য অর্জনের অভিষ্ট লক্ষ্যে উৎসর্গ করে রেখেছেন।

এ যে সারা বিশ্বে নতুন ইসলামী জাগরণ এবং জ্ঞানী বুদ্ধিমান ও আলোকপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে যে ব্যাপক ইসলামী অনুভূতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা অত্যন্ত আশাব্যক। এতে করে এটাও আশা করা যায় যে, কেউ বিনা কারণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করবে না এবং অদূর ভবিষ্যতে কেবল অনিবার্য কারণবশতঃ তারা একাধিক সুফল সর্বত্র দেখতে পাবে এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম ও মতাবলম্বীদের ওপরও ইসলামের ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফল। প্রত্যেকের সামনেই ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে যাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তালাক

"আল্লাহর কাছে হালাল বিষয়াবলির মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয় হলো তালাক।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাফেজ)

ইসলাম তালাককে অপছন্দ করার কারণ

তালাকের সহজ-সরল অর্থ হচ্ছে, স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক হয়ে যাওয়া এবং তারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী পরস্পর যে সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল তা বাতিল বা ছিন্ন করে দেয়া।

মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর আইন বাতিল করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর মধ্যস্থতাকে ভঙ্গ করা। যারা এমন করে তারা নিজেরাই নিজেদের ভালোবাসা ও স্বস্তির অবসান ঘটায়। কোন রকম অনিবার্য ও অপরিহার্য কারণ ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা আল্লাহর আইনের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শামিল সমতুল্য ধৃষ্টতা।

এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন-

" তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমার সাথে খেল-তামাশা করছ, কখনো বলো যে তালাক দিয়েছি, আবার কখনো তা ফিরিয়ে নাও।" (ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

"আল্লাহর কিতাবের সাথে কি খেল-তামাশা করা হচ্ছে? অথচ আমি এখনো তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছি।" (নাসায়ী)

এসব কথা প্রিয়নবী ﷺ এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন যে তার স্ত্রীকে বিনা কারণে তালাক প্রদান করেছিল।

আজকাল সাধারণতভাবে লোক যেমন মনে করে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক দেয়া এত সহজ ব্যাপার নয়। এটা একটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। ইসলামী শরীয়ত একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় তালাকের অনুমতি দিয়েছে। আসলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের চরম অবনতিশীল অবস্থায়- যখন মিলেমিশে দাম্পত্য জীবন যাপনের অন্য কোন বিকল্প পথই অবশিষ্ট না থাকে- ঠিক তখনই স্বামীকে এ শেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে।

তালাকের প্রতি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে মহানবী ﷺ বলেছেন-

"আল্লাহর কাছে হালাল বিষয়াবলির মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয় হচ্ছে তালাক।"
(আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, হাফেয)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন–

"আল্লাহ তালাকের চেয়ে বেশি নিন্দনীয় বিষয় আর কিছুই সৃষ্টি করেননি।" (দারেকুতনী)

আলী (রা) প্রিয়নবীর বরাত দিয়ে বলেন–

"বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিও না, কারণ তালাক এমন জিনিস যার কারণে আরশও কেঁপে ওঠে।" (দায়লামী)

তালাক ও যৌন বিলাসিতা

কোন কোন লোক জীবনের বাস্তবতার ব্যাপারে চরম উদাসীন হয়ে থাকে। জীবনের সকল ব্যাপারেই তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। জীবন ও তার বাস্তবতাকে গভীরতার সাথে গভীরভাবে উপলব্ধি ও বিবেচনা করতে তারা অক্ষমতার পরিচয় দেয়। যেমন এ ধরনের লোকেরা বিয়েকে নিছক যৌন বিলাসিতারই একটা মাধ্যম মনে করে। কাজেই, যখনই কোন নারীর ওপর তাদের আবেগ উত্তেজনায় ভাঁটা পড়ে যায়, তখন তারা তাদের যৌনক্ষুধা মেটানোর জন্যে অন্য নারীর অনুসন্ধান করে।

কিছুদিন পর যখন এটার ওপরও তাদের বিরক্তি এসে পড়ে তখন তারা আবার নতুন একজনের দিকে হানা দেয়। এভাবে তাদের যৌন বিলাসিতার ঘৃণ্য অভিযান অব্যাহত থাকে। তারা তাদের পাশবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে অসংখ্য নারীর জীবন ও মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তাদের এ জঘন্য যৌন বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়ে যে কতো অসংখ্য নারীর জীবন ব্যর্থ ও বিনষ্ট হচ্ছে, তাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক তাকে বিবেচনাযোগ্য মনে করে না।

এ ধরনের লোকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

"বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিও না, কেন না আল্লাহ সম্ভোগকারী ও সম্ভোগকারিণীদের ভালোবাসেন না।" (দায়লামী ও দারে কুতনী)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাশ্চাত্য সমাজে যৌন নির্লজ্জতা ও ব্যভিচার একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এখন তারা তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের এ বিভৎস দিকটির প্রকাশ্য প্রচারটাকেও আর লজ্জাকর বা অপমানজনক বলে মনে করে না। এমনকি পাশ্চাত্যের নারী পুরুষ বিয়ের পরেও অন্যান্যদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে কোনোরূপ আপত্তিকর মনে করে না। বরং তারা বিজ্ঞ দার্শনিকের মতো অবাধ যৌন মিলনকে একটা স্বাভাবিক প্রয়োজন বলে যুক্তি দেয়। এভাবে পাশ্চাত্যের যে কোন স্বামী বিয়ের পরও বিভিন্ন পর-নারীর সাথে প্রকাশ্যে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদের স্ত্রীরাও স্বামী থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পর-পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।

এটাকেই তারা 'আধুনিকতা' এবং 'প্রগতিশীলতা' বলে মনে করে। প্রকৃতভাবে এটা হচ্ছে মানবতার অবনতির সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অবদান। পাশ্চাত্যের এ তথাকথিত ঘৃণ্য আধুনিকতা ও জঘন্য প্রগতিশীলতা মানুষের জ্ঞান বিবেক সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাকে সব রকমের মানবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। নারীও মানুষ– পুরুষও মানুষ এবং একজন মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ ও মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তার মানবিকতা। আর মানবিকতার অর্থ হচ্ছে উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর থেকে বড় সম্পদ ও বড় সম্মান মানুষের আর কিছুই হতে পারে না। এর থেকে সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য আর কিছুতেই নেই। বিশেষ করে আত্মসম্মান ও লজ্জাশীলতা হচ্ছে নারীর সবচেয়ে বড় সম্পদ, আর এটাই তার প্রধান রূপ ও গুণ। যদি এ গুণবৈশিষ্ট্য থেকে নারী বঞ্চিত হয়ে পড়ে তাহলে সে এক জঘন্যতম প্রাণীতে পরিণত হয়। আত্মমর্যাদাবোধহীন এবং নির্লজ্জ নারী হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম, নীচ প্রকৃতি নারী।

তালাক ও মতপার্থক্য

হতে পারে, কোন কোন নারীর মধ্যে কিছু অপছন্দনীয় অভ্যাস পাওয়া যেতে পারে। যার কারণে সে নিন্দনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু তার প্রতিকারের উপায় তালাক নয়। ইসলাম চায় স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক ছোটখাট খুঁতগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের মধ্যেকার মিলগুলো নিয়ে সুখী সুন্দর ও স্বস্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যাপন করুক। এক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে বিশেষ রেয়াত (ছাড়) দেয়ার পরামর্শ দেয়। নারীর ছোটখাট ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করার সুপারিশ করে।

প্রিয়নবী তুলনামূলক উদাহরণের মাধ্যমে নারীর পক্ষ সমর্থন করে বলেছেন–
"নারী পাঁজরের মতো বাঁকা, যদি তোমরা তাকে সোজা করতে যাও তাহলে সে ভেঙে যাবে। আর যদি তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও তাহলে তাদের বাঁকাপনা সত্ত্বেও তোমরা তা থেকে উপকৃত হতে পারবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীস শরীফের শেষ অংশটি সম্পর্কে ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে, পুরুষকে নারীর ছোটখাট দোষত্রুটির দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে। ক্ষমাই যে মহৎ ও সুখী জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটাও বলে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা যদি ক্ষমা ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের পরিবর্তে নারীদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করতে থাক তাহলে দাম্পত্য জীবন তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে পড়বে।

কিন্তু তাই বলে কেউ যেন এটা মনে করেন যে, ইসলাম নারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করার বা চরিত্রবিরোধী ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে অথবা নারীকে আপাদ-মস্তক অপরাধিনী বলে ধারণা করছে। না, তা নয়। আসলে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষকে এটা বোঝানো যে– ঘটনাচক্রে নারীর মধ্যে যদি

কোন দোষ দেখা যায় তাহলে তাকে পৃথক করে দেয়ার ব্যাপারে যেন তড়িঘড়ি না করা হয়। কারণ, হতে পারে একদিকে তার কোন খুঁত থাকলেও অপর কোন দিকে হয়তো অনেক ভালো বিদ্যমান রয়েছে– যা তোমাদের পছন্দনীয়। কারণ দোষগুণ নিয়েই মানুষ, আর নারী মানুষ ছাড়া কিছু নয়।

এ বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন–

"কোন মু'মিন পুরুষ কোন মুমিনা নারীকে যেন ঘৃণা না করে। কেন না হতে পারে তার কোন কর্ম অপছন্দ তাহলে অন্য কর্ম পছন্দও হতে পারে।" (আহমদ, মুসলিম)

এ হাদীস থেকেও অনুমান করা যায় যে, ইসলাম কিভাবে মুসলমানদেরকে তালাকের নিন্দনীয় পন্থা থেকে বিরত রাখতে চায়। যদি স্ত্রীর কোন দোষ থেকেই থাকে তাহলেও পুরুষকে সমঝোতা ও সম্প্রীতির পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ইসলাম এ ব্যাপারে পুরুষকে কেবল পরামর্শই দেয় না বরং স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করার আদেশই দিচ্ছে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

"তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদয় সুন্দর ব্যবহার কর। যদি তারা তোমাদের অপছন্দও হয় তাহলে হতে পারে যে তোমরা কোন একটা জিনিসকে অপছন্দ করবে আর আল্লাহ তার মধ্যেই অনেক কল্যাণ নিহিত রাখবেন।" (সূরা নিসা : আয়াত-১৯)

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আবু বকর জাসসাস (রা) তাঁর তাফসীরে আহকামুল কুরআনে বলেন–

"এ আয়াতও একথার প্রমাণ যে, ইসলামী শরিয়ত, স্বামীর অপছন্দ সত্ত্বেও স্ত্রীকে টিকিয়ে রাখার উপদেশ দেয় কেন না আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে আমাদেরকে এ শিক্ষা দিচ্ছেন যে তাতে তিনি বিরাট কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"

কিন্তু এতোসব সত্ত্বেও স্ত্রী যদি সত্যিসত্যিই কোন অপ্রিয় কর্মে অভ্যস্ত হয়ে থাকে যা সামাজিক জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে এবং স্বামীর শান্তি ও স্বস্তি নষ্ট করছে; এবং যদি কোন আলাপ-আলোচনা ও শলা-পরামর্শও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়, প্রীতি ভালোবাসা ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির পরও যদি স্ত্রী তার বদঅভ্যাস পরিত্যাগ না করে থাকে তাহলে ইসলাম একেবারে শেষ পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রী এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে দাম্পত্য সম্পর্ক পৃথকীকরণের অনুমতি দেয়। কিন্তু শেষ পর্যায়েও প্রিয়নবী সতর্ক উপদেশ দিয়ে বলেন যে, "নারীদেরকে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তালাক প্রদান করিও না। কেননা, আল্লাহ সম্ভোগকারী এবং সম্ভোগকারিণীদের ভালোবাসেন না।" (তাবরানী)

আভিধানিক ও পারিভাষিকভাবে হাদীসটির সারমর্ম হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তালাকের বিকল্প ব্যবস্থা বর্তমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত নারীদের তালাক দিও না। বস্তুত, তালাক হবে একান্ত উপায়হীন পরিস্থিতির শেষ ব্যবস্থা।

যে সব কারণে তালাক অকার্যকরী হয়ে যাবে

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী যেসব কারণ ও অবস্থায় তালাক কার্যকরী হবে না, ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

১. তীব্র ক্রোধের অবস্থায় দেয়া তালাক কার্যকরী হবে না। তীব্র ক্রোধের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তির সেই অবস্থা যখন সাময়িক উত্তেজনায় সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং যা সে বলতে চায় তা বলতে পারে না এবং তার মুখ থেকে সেসব কথা বেরিয়ে আসে, যা বলার কোন উদ্দেশ্যই তার মনে ছিল না।

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা নিম্নের হাদীস থেকে এ যুক্তিপ্রমাণ গ্রহণ করেছেন। প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন–

"ক্রোধের অবস্থায় তালাক কার্যকরী হয় না, আর যুক্তিও নয়।"

মূল হাদীসে আরবি 'এখলাক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, মনীষী ইবনে কাইউম 'এখলাক'–এর অর্থ করেছেন 'গযব' বা ক্রোধ বলে। ইমাম আবু দাউদও তাঁর 'সুনান' এ একই অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে গবেষণামূলক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'গলক' সে ধরনের লোকদের বলা হয় যাদের চিন্তা ও বোধশক্তি লোপ পায়, যেমন মদখোর, পাগল এবং অত্যধিক উৎপীড়িত ব্যক্তি বা ভীষণ রোগে আক্রান্ত থাকে না। এজন্যে "যদি জেনেবুঝে তালাক না দেয়া হয় তাহলে এসব অবস্থায় তালাক কার্যকরী হবে না।"

২. যদি কোন ব্যক্তি এভাবে বলে যে, "যদি আমি অমুক কর্ম করি বা না করি তাহলে আমার তালাক জরুরি।" তা এ ধরনের কথা ও তালাক কার্যকর হবে না।

মনীষী ইবনে কাইউম তাঁর "এলামুল মোকেয়ীন" গ্রন্থে লিখেছেন : "ইমাম আবু হানীফা (র) এবং তাঁর দলভুক্ত কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতামতও তাই। "আমার ওপর তালাক জরুরি হবে"– এ কথা বলার ব্যাপারে তাঁদের অভিমতও একই। এর মূল কারণ হলো যে, এ ধরনের বক্তব্য উচ্চারণকারী ব্যক্তি আসলে ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করে, অথচ তালাক কেবল তখনই কার্যকরী হয় যখন কোন ব্যক্তি সুস্থ ও স্বজ্ঞানে বর্তমান অবস্থায় উদ্দেশ্য সহকারে (তালাক) দেয়। যদি এসব শর্ত পাওয়া না যায় তাহলে তালাক কার্যকরী হবে না।" ইবনে কাইউম বলেন : "এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশকারী যেন এ কথাই বলতে চায় যে– 'তোমাকে তালাক দেয়া আমার ওপর জরুরি হবে।" আর একথা সর্বজনসম্মত যে, যদি সে ব্যক্তি এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয় তাহলেও তালাক কার্যকরী হয় না।"

৩. যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে যে, "যদি তুমি অমুকের সাথে কথাবার্তা বল অথবা আমার অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাইরে বের হও তাহলে তোমাকে তালাক। এখন এরপর যদি সেই স্ত্রী কারো সাথে কথাবার্তা বলে বা স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘর থেকে বের হয় তাহলে তালাক কার্যকরী হবে না। ইবনে কাইউম ইমাম শাফেয়ী মতের অনুসারী বিভিন্ন ইমামের বক্তব্যের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গে নিজের অভিমত প্রকাশ প্রসঙ্গে বলেন– এ বক্তব্য আসলে ফিকাহ্ পর্যায়ের ইমাম মালেক, ইমাম আহমদের 'উসূলে ফিকাহ'য় এর সমর্থন রয়েছে। এরপর তিনি দীর্ঘ আলোচনা করে এটা প্রমাণ করেছেন যে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের উসূলে ফিকাহ্ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়।

৪. যে ব্যক্তি তালাকের মাধ্যমে কসম করে তার কসম লঘু মনে করা হবে। অথবা যদি কেউ কসম করে এবং সে কসম ভঙ্গ করে তাহলে তার তালাকও কার্যকরী হবে না। আর সে কসম ভঙ্গকারীও হবে না। ইবনে কাইউম 'এলামুল মোকেয়ীন' গ্রন্থে লিখেছেন, "এটা পূর্বসূরীদের পছন্দনীয় অভিমত– যাকে হযরত আলী (রা)-এর মতো মহান সাহাবীও সমর্থন করেছেন। আর কোন কোন মালেকী ফকীহ্ ও পর্যালোচকের অভিমত হলো যে, এ ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে কোন মতভেদ ছিল বলেও উল্লেখ নেই। এ শব্দসমষ্টি হচ্ছে আবুল কাশেম আল ইয়েমেনীর যা "আহকামে আবদুল হকে" উল্লেখ রয়েছে। আর এর আগে আবু মোহাম্মদ ইবনে হাজমের এর অভিমতও অনুরূপ ছিল– যার সমর্থন তাউসের মতো মহান তাবেঈ এবং ইবনে আব্বাসের কোন কোন বিশ্বস্ত সাথীরাও করেছেন।"

আল্লামা আবদুর রাজ্জাক তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন, "আমাদেরকে জানিয়েছেন ইবনে জবীহ; তিনি বলেন, "আমাদেরকে অবহিত করেছেন তাউস তাঁর পিতার মধ্যস্থতার; তিনি বলে থাকতেন যে, তালাকের মাধ্যমে কসম খাওয়ার কোন অর্থ হয় না।" উল্লেখযোগ্য যে, এ অভিমত প্রকাশ করেছেন এমন এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি – যিনি তাবেঈনদের মধ্যে অন্যতম মহান তাবেঈ বলে বিবেচিত হন। আর তাঁর সমর্থনে রয়েছেন চারশোরও বেশি ইসলামী বিশেষজ্ঞ এবং এরা সবাই কুরআন ও সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ হিসেবেও বিবেচিত হয়ে থাকেন। তাঁদেরই ধারাবাহিকতার শেষ স্তম্ভগুলোর মধ্য আল্লামা আবু মোহাম্মদ ইবনে হাজমের মতো মনীষীরা রয়েছেন।

কোন কোন ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ এ ধারণাও পোষণ করেন যে, তালাকের মাধ্যমে কসম খাওয়া একেবারে লঘুর পর্যায়ে পড়ে না। এর শরীয়তী মান হয়ে যায় এবং কসম ভঙ্গকারীকে কাফ্ফারা আদায় করতে হয়।

আর কাফ্ফারা ওটাই হবে যা কুরআনের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে–
"(কসম ভাঙ্গার) কাফ্ফারা হলো, দশজন দরিদ্রকে মধ্যম মানের খাবার পরিবেশন করবে যা তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে আহার করায়ে থাক, অথবা তাদেরকে বস্ত্র পরাও, অথবা একজন গোলাম মুক্ত কর। আর যারা এসবের ক্ষমতা রাখে না তারা তিনদিনের রোযা রাখবে।" (সূরা মায়েদা: আয়াত-৮৯)

কিন্তু এতে করে তালাক কার্যকরী হবে না। কারণ কাফ্ফারা এবং তালাকের কার্যকারিতার মধ্যে কোন রকমের সম্পর্ক নেই। যদি কাফ্ফারা আদায় না কর তাহলে গুনাহের ভাগী হবে আর যদি আদায় করে দেয় তাহলে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

উপরিউল্লিখিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করুন যে, ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে কতখানি মজবুত ও স্থিতিশীল করে দিয়েছে। এ সম্পর্ক কোন পাগলের প্রলাপ অথবা ক্রোধগ্রস্তের ক্রোধ ছিন্ন করতে পারে না। বলাবাহুল্য, ইসলাম নারীকে তার সন্তান-সন্ততি এবং স্বামীর সাথে শান্তিতে বসবাস করার এক সম্মানজনক সুযোগ অবারিত করেছে। আর এ সম্পর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত অটুট তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের সামাজিক জীবনে ভুল বুঝা বুঝি ও তিক্ততার সৃষ্টি না হয়।

তালাকের নিয়ম-নীতি

ইসলাম জটিল সমস্যাবলিকে বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্যের সাথে সমাধান করার শিক্ষা দেয়। মানুষ যদি ইসলামের পন্থায় অনুসরণ করে এবং শিক্ষা অনুযায়ী মেনে চলে তাহলে তালাকের দুর্ঘটনা কমে যাবে এবং বিয়ে একটি অটুট ও স্থায়ী বন্ধনে পরিণত হবে।

মতভেদের সূত্রপাত স্বামীর পক্ষ থেকে অথবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে অথবা এর মধ্যে উভয়েরই কিছু না কিছু হাত থাকে। যদি সূত্রপাত স্ত্রীর দিক থেকে হয় এবং স্বামীর উপর চাপানোর চেষ্টা করে থাকে, তাহলে এমন স্ত্রীকে কুরআনী পরিভাষায় 'নাসেজ' অর্থাৎ অবাধ্য বলা হবে আর যদি স্বামীই সূত্রপাত করে থাকে আর স্ত্রীর উপর চাপানোর চেষ্টা করে থাকে– তাহলে স্বামীকেই 'নাসেজ' অর্থাৎ অবাধ্য বলা হবে। কিন্তু মতভেদে যদি উভয়ের হাত বরাবর থাকে তাহলে উভয়কে কুরআনী পরিভাষা অনুযায়ী 'শেকাক' বলা হবে। ইসলাম এ তিনটি সমস্যারই সমাধান পেশ করেছে এবং কল্যাণকামী আপোষ মীমাংসাকারী হিসেবে অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের জ্ঞানবুদ্ধি ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এসব সমস্যার সন্তোষজনক প্রতিকার বিধান করেছে। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

স্ত্রীর অবাধ্যতা

'নসূজ' এমন অবস্থাকে বলা হয় যখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন অন্যজনের প্রতি অবাধ্যতা ও ঘৃণা প্রদর্শন করে, আর স্ত্রীর 'নাসেজ' বা অবাধ্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে সে স্বামীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং তার অধিকারকে উপেক্ষা করতে শুরু করে।

পবিত্র কুরআনে এ সমস্যার নিম্নলিখিত সমাধান পেশ করেছে–

১. স্বামী তার স্ত্রীকে প্রীতি ভালোবাসার মাধ্যমে উপদেশ দেবে এবং সহানুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে তার ভুলত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেবে এবং শোধরায়ে দিবে। তাকে এটা বলবে যে তার এ অবাধ্যতা আল্লাহর অপছন্দনীয় এবং তার পরিণামও ভালো নয়। এভাবে স্বামী উদাহরণের মাধ্যমে আদর্শ স্ত্রীদের পন্থা অবলম্বনের উপদেশ দেবে।

   এধরনের অবস্থায় স্বামীকে অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে হবে। উপযুক্ত সময় ও অবস্থা অনুযায়ী উপদেশ প্রদান করবে। এমন সময় ও অবস্থায় স্ত্রীকে উপদেশ দেবে যখন তা গ্রহণের জন্যে স্ত্রী মানসিকভাবে তৈরি থাকবে। এভাবে হতে পারে স্ত্রী তার কথায় প্রভাবান্বিতা হবে এবং পরিবার এক অবাঞ্ছিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

২. স্বামী যদি উপদেশ দিতে দিতে তিক্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং কিছুতেই স্ত্রীকে পথে তোলা সম্ভব না হয় তাহলে ইসলাম এ ক্ষেত্রে শাস্তির পরামর্শ দেয়। আর শাস্তি এভাবে হবে যে, প্রথমে স্বামী পৃথক কক্ষে শয়ন করবে এবং পৃথক বিছানায় শোবে এবং স্ত্রীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবে– তার কাছে যাওয়া সামাজিকভাবে বন্ধ করবে এবং তার চলাফেরায় এটা দেখাবে যে, সে তার ওপর ভীষণভাবে অভিমান করে আছে। এতে করে স্ত্রীর নারীসুলভ অহঙ্কারে আঘাত লাগবে এবং এভাবে সে অবাধ্যতার পথ পরিত্যাগ করতে পারে। কারণ নারী সবকিছু সহ্য করতে পারে কিন্তু তার নারীত্বের অবমাননা কখনো সহ্য করতে পারে না। একবার যদি সে তার অমর্যাদা বুঝে নিতে পারে তাহলে অবাধ্যতার পথে অবিচল থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৩. স্বামী যদি এভাবে নিজের উদ্দেশ্য সফল করতে পারে তো ভালোই। যদি সে পন্থাও ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয় তাহলে একটু তিরস্কারের সাথে হালকা মারধোর করবে কিন্তু এমনভাবে মারা চলবে না যাতে তার শরীরে দাগ পড়ে, আসলে হালকা মারধোরটা হবে ক্ষণিকের জন্যে কষ্টদায়ক।

এ হচ্ছে, স্ত্রীর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে স্বামীকে দেয়া কয়েকটি কার্যকরী পদ্ধতি। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন তড়িঘড়ি বা বাড়াবাড়ি করা চলবে না এবং ধৈর্যের সাথে ফলাফলের অপেক্ষা করতে হবে। যদি উল্লেখিত কোন এক পন্থায় স্ত্রী অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে তাহলে স্ত্রীকে আগের মতো প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসা দেবে এবং তার সাথে পূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করবে। কিন্তু যদি অবস্থা তার উল্টো হয় তাহলে উভয়ের পৃথক হয়ে যাওয়াই উত্তম।

উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের এতক্ষণের আলোচনা কুরআনের এ আয়াতের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। আল্লাহ বলেছেন–

"এবং যেসব নারী থেকে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে বুঝাও, শয়নকক্ষে তাদের কাছ থেকে আলাদা থাক এবং মারধোর কর যদি তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তাহলে অনর্থক তাদেরকে মারপিট করার বাহানা তৈরি করো না। বিশ্বাস রেখো, উপরে আল্লাহ রয়েছে, তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ।"

(সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

এখানে একটি বিষয় যা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহলে এমন অবস্থায়ও ইসলাম আকার-ঈঙ্গিতেও তালাকের কথা উল্লেখ করেনি বরং স্বামীকে আদেশ দেয়া হচ্ছে যে, যেন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সাথে স্ত্রীকে বুঝিয়ে সমস্যাটি সমাধানের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করে। এর জন্যে আলাদা শয়ন, অভিমান প্রকাশ এবং একান্ত দরকার দেখা দিলে খুব হালকা মারার আঘাত পরামর্শ দেয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তালাকের মতো চরমপন্থা অবলম্বনের কথা বলে না বরং স্বামীকে সাবধান করে দিয়ে বলে যে, "অনর্থক তাদেরকে মারপিট করার বাহানা খুঁজ না।" এথেকে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

খোলয়া

এমনভাবে মার যার আঘাতে দাগ না পড়ে। এ হলো সেই শেষ ধাপ যেখানে এসে স্বামীর সকল প্রচেষ্টা শেষ হয়ে যায়। এরপর স্ত্রীর অবাধ্যতার প্রতিকার করার কোন পন্থাই স্বামী খুঁজে পায় না। এখানে এসে প্রশ্ন উঠতে পারে, এরপর ইসলামের উপদেশ ও শিক্ষা কি? বলাবাহুল্য এরপরেও তালাকের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে না। এখন স্ত্রী যদি সত্যিই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে থাকে এবং কোনরকমেই স্বামীর ঘর করতে রাজী না হয় এবং একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে স্বামীর দাম্পত্য অধিকার পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় তাহলে তখন ইসলাম এ অধিকার দেয় যে, সে তার স্বামীর কাছে পৃথক হয়ে যাওয়ার দাবি করবে এবং এর পরিণামের দায়িত্ব তার ওপরেই বর্তাবে।

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যে স্বামী স্ত্রীর পেছনে এত টাকা-পয়সা ব্যয় করছে এবং তার ব্যয়ভার নির্বাহ করছে সে এত সহজে কিভাবে স্ত্রীকে ত্যাগ করবে? কজেই সুবিচারের দাবি হচ্ছে স্ত্রী মোহর হিসেবে স্বামীর কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছে তা ফিরিয়ে দেবে।

তবে স্ত্রী কি পরিমাণ অর্থ আদায় করে খোলয়া অর্জন করবে যে ব্যাপারে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, খোলয়ার পরিমাণ মোহরের সমান হবে এবং কেউ কেউ এর চেয়েও বেশি গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন।

খোলয়ার যুক্তি

নিম্নবর্ণিত কুরআনের আয়াত থেকে খোলয়ার যুক্তি প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

"তোমাদের জন্যে হালাল নয় যা কিছু তোমরা স্ত্রীদের দিয়েছ তা থেকে কিছুমাত্র ফেরত নেয়া। অবশ্য এ অবস্থা স্বতন্ত্র স্বামী-স্ত্রী (যদি) এ আশংকা করে যে, আল্লাহর সীমায় কায়েম থাকতে পারবে না এবং এমন অবস্থায় যখন তুমি ভয় কর যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না তখন কোন বাধা নেই যদি নারী কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করে নেয়।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২২৯)

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দরবারে খোলয়ায় সর্বপ্রথম মামলা দায়ের করা হয় জামীলা বিনতে সালুলের পক্ষ থেকে। তিনি তাঁর স্বামী সাবেত ইবনে কায়েসকে কিছু লোকের সাথে যখন আসতে দেখেন তখন তাঁকে অত্যন্ত কুৎসিত ও কদাকার মনে করেন এবং স্বামীর প্রতি তাঁর মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি এ ঘটনার পরে প্রিয় নবীর দরবারে এসে নিম্নের বিবৃতি দেন–

"আল্লাহর শপথ, আমি দ্বীনি অথবা চারিত্রিক কোন দোষের কারণে তাকে অপছন্দ করছি না, বরং তাঁর সৌন্দর্যহীনতাই আমার অপছন্দ।" (ইবনে জবীর)

প্রিয় নবী অভিযোগ শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন–

"সে যে বাগানটি তোমাকে মোহর হিসেবে দিয়েছিল তা তাকে ফিরিয়ে দেবে?"

তিনি জবাব দিলেন– "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!"

এরপর প্রিয়নবী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, "সাবেতকে তার বাগান ফিরিয়ে দাও" এবং সাবেতকে বললেন, "তুমি তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।"

ইমাম কুরতুবী সমস্যাটির বিস্তারিত বিবরণে বলেন, "বর্ণিত আছে যে সাবেতকে স্ত্রী অত্যন্ত অপছন্দ করতেন আর তিনি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মামলাটি প্রিয়নবীর কাছে গেলে তিনি খোলয়ার মাধ্যমে উভয়কে পৃথক করে দেন– আর এটা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রে খোলয়ার প্রথম ঘটনা।" তিনি আরো লিখেন– "আসলে এ হাদীসটিই হলো খোলয়ার বুনিয়াদ। অধিকাংশ ফকীহ এ ব্যাপারে এ হাদীসটিকেই তাদের যুক্তি প্রমাণের দলিল বানিয়েছেন।

এ সম্পর্কে ইমাম মালেক (র) বলেন : "আমাদের কাছে এটা একটা সর্বজন সম্মত সিদ্ধান্ত যা আমি বিদ্বানদের মুখে প্রায় সময় শুনে আসছি। অর্থাৎ এই যে, স্বামী স্ত্রীকে কোন রকমের দুঃখ-কষ্ট দেয়নি এবং কোন রকমের দুর্ব্যবহারও করেনি– তা সত্ত্বেও সে তার স্বামী থেকে পৃথক হতে চায় তাহলে তখন স্বামীর জন্যে এটা বৈধ যে, সে তার দেয়া ধনসম্পদ স্ত্রীর কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নেবে এবং স্ত্রীকে (বৈবাহিক বন্ধন থেকে) মুক্ত করে দিবে। যেমন প্রিয়নবী সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রীর ব্যাপারে করেছেন।"

ইবনে কোদামা তাঁর গ্রন্থ আল মুগনীতে এ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর তার আলোচনার মূল কথা হচ্ছে, স্ত্রী যখন তার স্বামীকে চেহারা, চরিত্র অথবা অন্য কোন কারণে অপছন্দ করে কিংবা স্বামীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত অধিকার উপেক্ষিত হওয়ার আশংকা দেখা যায় তখন স্ত্রী খোলয়া অর্জনের অনুমতি পাবে। এর মাধ্যমে স্ত্রী কিছু সম্পদ বা অর্থের বিনিময়ে নিজেকে স্বামীর কাছ থেকে মুক্ত করে নেবে। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি হচ্ছে তার যুক্তিগত প্রমাণ।

"যখন তোমার ভয় হয় যে স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তখন কোন বাধা নেই যখন নারী কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করে নেবে।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২২৯)

খোলয়ার সমস্যায় কাজীর ক্ষমতা

খোলয়ার কারণসমূহ গভীরভাবে তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখাটা কাজীর (বিচারপতির) দায়িত্ব। তিনি এটা দেখবেন যে, স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ঘৃণার মাত্রা কতখানি এবং এর প্রতিকারের বিকল্প কোন পন্থা আছে কিনা তাও তিনি বিবেচনা করে দেখবেন।

ইবনে কাসীর (র) এ সম্পর্কিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন–

"উমরের আদালতে এক নারী তার মামলা দায়ের করে। সে বলে যে, সে তার স্বামীকে অপছন্দ করে এবং কোনভাবেই তার সাথে থাকতে সম্মত নয়। তিনি মহিলাটিকে উপদেশ দিয়ে তার স্বামীর সাথে অবস্থানের পরামর্শ দান করেন।

কিন্তু মহিলাটি তা গ্রহণ করল না। এরপর তিনি তাকে আবর্জনাময় এক কক্ষে আবদ্ধ করে রাখেন। একরাত ওখানে কাটানোর পর তিনি তাকে বের করে এনে জিজ্ঞেস করলেন : "রাত কেমন কেটেছে?" মহিলাটি বলল : "আল্লাহ্‌র শপথ, বিয়ের পর থেকে এমন আরামের ঘুম আমার আর কখনো হয়নি।" একথা শুনে উমর মহিলাটির স্বামীকে ডেকে পাঠিয়ে অবিলম্বে তালাক দেয়ার আদেশ দিয়ে বলেছেন, "একে খোলয়া দিয়ে দাও তা তার কানের বালির বিনিময়েই হোকনা কেন।"

তাই বলে এটা বোঝানো হচ্ছে না যে, খোলয়ার প্রত্যাশী নারী মাত্রকেই আবর্জনার কক্ষে বন্ধ করে পরীক্ষা নিতে হবে। না, তা নয়। উমর (রা) তাঁর বুদ্ধিমত যা করেছেন তা সেই সময় ও পরিবেশ মোতাবেক ঠিকই ছিল। আজকালও যে তেমনভাবে পরীক্ষা করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবে, উমরের এ ঘটনাকে সামনে রেখে এটা অবশ্যই জরুরি যে, কাজী বিষয়টির খুঁটিনাটি তদন্ত করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহিলার স্বভাব ও আবেগ-অনুভূতির দিকে লক্ষ্য রাখাও জরুরি হবে। কারণ একটি ব্যাপার বাহ্যতঃ তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও সেটাই যদি প্রতিদিন ঘটে থাকে তাহলে তা তার জন্যে অসহ্য শাস্তির মতো প্রমাণিত হয়।

স্বামীর অবাধ্যতা

অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীকেও বেশ বুদ্ধিমত্তা ও বিজ্ঞতার সাথে কাজ করতে হবে এবং অত্যন্ত প্রেমপ্রীতি ও কৌশলের সাথে স্বামীর অবাধ্যতার কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে স্বামীর মনের ঘৃণাবোধ দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এজন্যে যদি দৈহিক বা মানসিক বা আর্থিকভাবে কিছু ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করার দরকার হয় তাহলে তাতেও যেন ইতস্ততঃ না করা হয়। কারণ স্বামীর সম্মান একজন স্ত্রীর কাছে একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি।

এখানে, দাম্পত্য সমস্যার সৃষ্টি কিভাবে হয় বা স্বামীর মনে ঘৃণা বা অবাধ্যতার বীজ কিভাবে প্রবেশ করে তা নিয়ে আলোচনা করার কোন লাভ বা প্রয়োজন নেই। এখানে এতটুকুই বলব যে, স্ত্রীর সব সমস্যার সমাধান সূত্র শুধু এই যে, সে সব দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে পালন করবে এবং স্বামীর মনমেজাজের দিকে লক্ষ্য রাখবে। স্ত্রীকে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও সংবেদনশীলতার পরিচয় দেয়া উচিত। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর কাছে তার পছন্দ-অপছন্দ বর্ণনা করাকে তার পৌরুষের বিরোধী মনে করে। এজন্যে স্ত্রীকে স্বামীর চোখ আর চেহারা দেখেই অনেক কিছু বুঝে নেয়ার দক্ষতা অর্জন করা উচিত।

আবার অনেক সময় স্ত্রী তার স্বামীকে বুঝতে দারুণভাবে ভুল করে বসে। ফলে পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদাহ বিনতে জাময়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন প্রিয়নবীর দৃষ্টিতে নিজের প্রতি কিছুটা উদাসীনতার ভাব লক্ষ্য করেন এবং এটা অনুমান করেন যে, প্রিয়নবী তাঁকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা করছেন– তখন তিনি প্রিয়নবীর সামনে গিয়ে সেই উপেক্ষার কারণ জিজ্ঞেস করতে যাননি বরং তাঁর নারীত্বই সেই আবেগ অনুভব করে নেয় এবং তিনি বুঝে নেন যে এ উপেক্ষা ও উদাসীনতার কারণ তাঁর মধ্যে কোন দোষক্রটির জন্যে নয়, বরং ব্যাপারটি অন্য কিছু। আর তা এই যে, তিনি ছিলেন প্রিয়নবীর স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োঃজ্যেষ্ঠা। এ কারণে তিনি স্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে অপরাগ ছিলেন। এজন্যে তিনি তাঁকে ছাড়তে চাচ্ছেন।

একথা ভেবে তিনি প্রিয়নবীর কাছে গিয়ে নিজেই বললেন–
"হে আল্লাহর রাসূল! আমি বন্ধ্যা (অক্ষম) হয়ে গেছি এবং স্ত্রীত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্য নই। আমি আমার বরাদ্দের দিন আপনার প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশাকে দিচ্ছি। আমার এছাড়া কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, কিয়ামতের দিন যখন উঠানো হবে তখন আপনার স্ত্রীদের তালিকায় যেন আমারও নাম থাকে।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদাহ বিনতে জামায়ার প্রশংসায় কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়–

"যদি কোন স্ত্রী নিজ স্বামী থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে কোনো তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে কোনো গুনাহ্ নেই এবং সমঝোতা সব অবস্থাতেই উত্তম। প্রবৃত্তি সংকীর্ণ মনের দিকে শীঘ্রই আকর্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা যদি দয়া প্রদর্শন কর এবং খোদাভীরুতা অবলম্বন কর তাহলে বিশ্বাস রেখো যে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তোমার খবর রাখেন।"

(সূরা নিসা : আয়াত-১২৮)

উপরের আয়াতটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তখনই এটা অনুভব করবেন যে– ইসলাম একদিকে যেমন নারীকে তার নিজ সমস্যার সমাধান করার পূর্ণাঙ্গ অধিকার দিয়েছে সেখানে সমঝোতার ওপরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অন্য কথায়, ইসলাম দাম্পত্য ও পারিবারিক সমস্যাবলিকে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধান করাকে উত্তম মনে করে।

এজন্যেই আল্লাহ্ বলেছেন–
"... কোন গুণাহ নেই যে, স্বামী ও স্ত্রী (কোন কোন অধিকারের বেশি কম করার ব্যাপারে) পরস্পর সমঝোতা করে নেবে। সমঝোতাই সব অবস্থাতেই উত্তম।"

(সূরা নিসা : আয়াত-১২৮)

স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ

এটা একটা তৃতীয় অবস্থা। এটাকে আমরা "নুসূজ" বা অবাধ্যতার অর্থে ব্যবহার করতে পারি না। কারণ 'নুসূজ' বা অবাধ্যতার প্রশ্ন তখন ওঠে যখন স্বামী বা স্ত্রীর কোন একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা অবাধ্যতা প্রকাশ করে।

'নুসূজ' অর্থাৎ অবাধ্যতার ক্ষেত্রে উভয়ে পরস্পরের সাথে কেমন ব্যবহার করবে– তা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঘৃণা ও অবাধ্যতার প্রকাশ যদি উভয় পক্ষ থেকে হয়ে থাকে– তাহলে ইসলাম তার প্রতিকার কিভাবে করবে? তাদেরকে তো আর তাদের ইচ্ছার ওপর ছাড়া যায় না!

শরীয়তের বিধিবিধান

আল্ মুগনীর গ্রন্থকার লিখেছেন– "যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে বিচারপতি বিষয়টিকে খুব ভালো করে তদন্ত করার পর কোন সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি এটা প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীই দোষী তাহলে স্ত্রী 'নাসেজ' বা অবাধ্য বলে গণ্য হবে। (এ সম্পর্কে সে কি কর্মপন্থা অবলম্বন করবে তার বিবরণ পূর্বেই দেয়া হয়েছে)। কিন্তু যদি তদন্তের পর এটা জানা যায় যে, স্বামীই দোষী, তাহলে বিচারপতি এমন কোন সমাধান খুঁজে বের করবেন যাতে তিনি স্ত্রীকে স্বামীর বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচতে পারেন।

যদি এ অবস্থার উল্টো ব্যাপার এটা বোঝা যায় যে, উভয়পক্ষ থেকেই বাড়াবাড়ি হচ্ছে এবং উভয়ই এ ধরনের দাবি উত্থাপন করছে, অপরপক্ষ জুলুম অত্যাচার করছে– তখন সেই অবস্থায় বিচারপতি বিষয়টিকে ভালো করে ভেবেচিন্তে পৃষ্ঠপোষকদের উপর সোপর্দ করবেন যেন তারা ভালো করে ভেবেচিন্তে চিন্তা-ভাবনা কর সুবিচার দান করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি উভয়ের ব্যাপারে জুলুম ও নিষ্ঠুরতার আশংকা থাকে আর এ ভয়ে বিচারপতি উভয়পক্ষের পরিবার থেকে একজন শালিস নির্বাচন করে উভয়কে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রেরণ করবেন।"

(আলমুগনী (ইবনে কোদামা) ৬ষ্ঠ খণ্ড অষ্টাদশ পৃষ্ঠা) ইসলাম যে কত আন্তরিকতার সাথে সমস্যাবলির সমাধান করতে চায় এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে চায় তা এ থেকে প্রমাণিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মতভেদের নিষ্পত্তির শেষ হিসেবে ইসলাম একাধিক বিকল্প পেশ করে বলে যে, স্বামী-স্ত্রী নিজেরা যদি পারস্পরিক সমঝোতার অবস্থায় না থাকে তাহলে উভয়ের পরিবারের পৃষ্ঠপোষকরা মিলে তাদেরকে বোঝাবে যেন একটি সুখী পরিবার অশান্তির কালো মেঘে পরিণত না হয়।

আর এতে করে যদি সমঝোতা না হয়ে থাকে তাহ্‌লে ইসলাম স্বামীকে এটা বলে না যে, স্ত্রীকে আশ্রিতা হিসেবে কোথাও ঠাঁই দিক। কারণ এতে বড় জটিল সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এমতাবস্থায় ইসলাম বিচারপতিকে বিষয়টিকে ব্যাপক তদন্ত করার পরমার্শ দেয় কেন তাদের মনে ইতিবাচক রেখাপাত করে। এরপরও যদি ব্যাপারটি আরো অবনতিশীল হয়ে পড়ে তাহলে উভয় পক্ষের পরিবার থেকে দুজন নির্বাচিত শালিসকে তাদের ব্যাপারাদি আলোচনা-পর্যালোচনা করে মতভেদের মূল কারণ খুঁজে বের করার জন্যে পাঠাবে। এরা তাদেরকে উপদেশ দেবেন এবং পারস্পরিক মতভেদের কুফল সম্পর্কে অবহিত করাবেন এবং অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাদেরকে সঠিকভাবে দাম্পত্য জীবন পুনর্বহাল করার পরামর্শ দেবেন। এরপর যদি স্বামী-স্ত্রী তাদের পরমার্শ মেনে নেয় তাহলে আল্লাহ্ তাদের সংশোধনের সুযোগ দেবেন।

এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন–

"আর যদি তোমরা কখনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা কর তাহলে একজন শালিস পুরুষের আত্মীয়দের মধ্য থেকে এবং একজন নারীর আত্মীয়দের মধ্যে থেকে নিযুক্ত কর ওরা দুজন সংশোধন করাতে চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মিলের সুযোগ দেবেন। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং সব ব্যাপারে ওয়াকিফহাল।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩৫)

পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি সমঝোতা করানোর আবেদন বিচারপতি নিজে করবেন। আবার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধেও তাঁরা এ গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারেন। কেননা একটি পরিবারকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে তাদেরকে সমঝোতায় অনুপ্রাণিত করানোর এটাই উত্তমপন্থা। সমঝোতা করার এ প্রচেষ্টা যদি আন্তরিকততার সাথে করা হয় তাহলে তাদের মধ্যে ভালোবাসা সম্প্রীতি পুনর্বহাল না হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না।

ফ্রান্সেও ইদানিং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা করানোর উদ্দেশ্যে এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী বিচারপতি স্বামী-স্ত্রী উভয় পরিবার থেকে দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচিত করে তাদের মধ্যে সমঝোতা করানোর জন্যে পাঠাবেন। বলাবাহুল্য, এ সম্পর্কিত ইসলামী আইন ও পদ্ধতি অধিকতর বাস্তবানুগ ও কার্যকর। ইসলাম এক্ষেত্রে মতভেদের মূল কারণ খুঁজে বের করে তারই প্রতিকার করে।

ফলে সমস্যাটির স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধান হয়ে যায়। বর্ণিত আয়াতের এ অংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ–

"যদি তারা উভয়ে সংশোধন করাতে চায় তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলের সুযোগ করে দেবেন।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩৫)

উল্লেখযোগ্য যে, এখানে সমস্যাটির ইতিবাচক দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা বলা হয়নি যে, যদি তারা উভয়ে সংশোধন হতে না চায়, তাহলে পৃথক হওয়া উত্তম। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলামের আন্তরিক প্রচেষ্টা, বিশৃঙ্খলা, ঘৃণা ও বিদ্বেষকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বিবেচনা করে।

এখানে আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বিভিন্ন ইসলামী বিশেষজ্ঞ উপরের আয়াতটিকে নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখে থাকেন। তাঁদের ধারণা এই যে, যদি সমঝোতাকারীদের উদ্দেশ্য সৎ হয় এবং তাঁরা সমঝোতা করানোর ইচ্ছা পোষণ করেন তাহলে এ আয়াত আসলে এ প্রতিশ্রুতিই দান করে যে, সমঝোতা অবশ্যই হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আল্লামা যামাখশারী লিখেছেন, "যদি উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার উদ্দেশ্য থাকে এবং উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয়, মনে আন্তরিকতা ও শুভাকাঙ্ক্ষার অনুভূতি থাকে তাহলে আল্লাহ সে কাজে সাহায্য দান করবেন এবং প্রীতি-ভালোবাসার পথ সুগম করে দেবেন এবং তাদের সম্পর্ককে পুনর্বহাল করে দেবেন।"

এক্ষেত্রে উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-একটি ঘটনা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। তিনি দুই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা করানোর উদ্দেশ্যে দুজন শালিস প্রেরণ করেন। তারা নিজের মতো চেষ্টা করে ফিরে এসে জানান যে, "হে আমীরুল মু'মিনিন! আমরা উভয়ে একথা শোনার পর উমর (রা) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, তোমরা উভয়েই মিথ্যে বলছ। আসল কথা হচ্ছে, তোমাদের উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করানোর সত্যিকার আগ্রহ ছিল না। কেননা তোমাদের আগ্রহ যদি যথার্থ হতো তাহলে আল্লাহ তোমাদের এ কাজে সাহায্য করতেন এবং তোমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে না।

এ জন্যেই যে আল্লাহ বলেছেন–

"যদি তারা উভয়ে সংশোধন করাতে চায় তা হলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন।"

বস্তুত: উমর (রা)-এর কথা শতকরা শতভাগ সঠিক ছিল। সুতরাং সংশ্লিষ্ট শালিস দুজন লজ্জিত হয়ে আবার গিয়ে আন্তরিকতার সাথে সমঝোতা করানোর চেষ্টা শুরু করেন। বলাবাহুল্য এবার তাঁরা সফল হলেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহব্বত পুনর্বহাল হয়ে যায়।

তালাকের শরীয়তি নিয়মনীতি

এর আগের পৃষ্ঠাগুলোতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সৃষ্ট মনোমালিন্যের ক্ষেত্রে ইসলামী সমাধান পেশ করা হয়েছে। এখন সমস্যাটির দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করে দেখুন। মনে করুন উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের দেওয়াল যদি এতই দুর্লঙ্ঘ হয়ে থাকে এবং পারিবারিক জীবনে নিত্যকার তিক্ত অভিজ্ঞতায় যদি একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, এ দুয়ের একত্রে থাকা অসম্ভব– তখন এ অবস্থায় ইসলামের বিধান?

এ সমস্যার সমাধান তালাক নয় কি?

জী হ্যাঁ, এর একমাত্র সমাধান– শুধু তালাক। কিন্তু এ তালাক কী? এটা কখন কিভাবে দিতে হয় এবং এর নিয়মনীতিই বা কি?

আমাদের অধিকাংশ ভাই এটাও জানেন না যে, কোন সময় তালাক দেয়া বৈধ এবং কোন সময় অবৈধ।

ইসলাম তালাকের নিম্নলিখিত নীতি প্রণয়ন করেছে–

১. হায়েয (মাসিক ঋতু) অবস্থায় তালাক দেয়া বৈধ নয়।
২. পবিত্র অবস্থায়– যখন উভয়ে সহবাস করেছে– তাতেও তালাক দেয়া সঠিক নয়।

এ দুটি নীতি পবিত্র কুরআনের এ আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে–

"হে নবী! যখন তোমরা নারীদের তালাক দাও, তাদেরকে তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দিও।" (সূরা তালাক : আয়াত-১)

এই আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যা ছিল নবী করীম ﷺ সেই বিখ্যাত সিদ্ধান্ত যা তিনি আবদুল্লাহ বিন উমরের ব্যাপারে দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ বিন উমর নিজের স্ত্রীকে হায়েযের সময় তালাক দিয়েছিলেন।

একথা জানতে পেরে নবী করীম ﷺ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন যে–

"তার উচিত দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করা। এরপর তাকে নিবৃত রাখে যতক্ষণ না সে পাক হয়ে যায়। এরপর আবার হায়েয হবে, আবার পাক হবে এরপর যদি সহবাসের আগে পাক অবস্থায় তাকে তালাক দেয় তাহলে এটাই তার সেই ইদ্দত হবে যার হুকুম আল্লাহ তাঁর বাণীতে দিয়েছেন।"

এরপর তিনি কুরআনের সে আয়াত পড়েন–

"তাদেরকে তাদের ইদ্দতের মধ্যে তালাক দিও।"

সানআনী তাঁর গ্রন্থ "সবলু-স্-সালাম"– এ হাদীস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "এ হাদীস একথার প্রমাণ যে স্বামী প্রথম তুহুরে (পবিত্রতাতে) নয় বরং দ্বিতীয় তুহুরে তালাক দেবে। এভাবে ইদ্দতের গণনা সেই পবিত্রতা থেকে করা হবে যাতে সহবাস করা হয়নি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনী আয়াতটির মর্মার্থ এ হবে যে, নিজ স্ত্রীদের এমন তুহুরে তালাক দিও যাতে তুমি তার সাথে সহবাস করনি।

তালাকের ব্যাপারে ইসলামের এ আইন ও নীতির মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এখানে তার কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ উপকারী প্রমাণিত হবে বলে আশা করি। তালাক দেয়ার ব্যাপারে এত বিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, হতে পারে এ সময়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমপ্রীতির সম্পর্ক পুনর্বহাল হয়ে যাবে যা এর আগে চিন্তা করাই যেত না।

এছাড়া নারী সব সময় দুটি অবস্থায় থাকে। একটি পাক (পবিত্র) অবস্থায় আর অন্যটি হায়েযের অবস্থায়। এখন স্বামী যদি হায়েযের অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে তার তালাক হারাম হবে। এজন্যে স্বামীকে তালাক দেয়ার জন্যে পুরো দুটি হায়েয ও একটি পবিত্র অবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আর এতে করে প্রায় একমাসের অধিক সময় লাগে। এ সময়ের মধ্যে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যাতে তার সিদ্ধান্ত পাল্টে যেতে পারে এবং সে তালাক দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। এ কারণেই কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের শেষাংশ আশাব্যঞ্জক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে– যখন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এবং এজন্যে এক মাসের অপেক্ষায় থাকে যেন স্ত্রীর পবিত্রতা এসে যায়– এমতাবস্থায় সে যদি জানতে পারে যে, যে স্ত্রীকে সে তালাক দিচ্ছে সে গর্ভবতী হয়ে গেছে এবং তারই সন্তানের মা হতে যাচ্ছে– তখন তাকে তালাক দেয়া থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রমাণিত হয়।

সুন্নাতী তালাক ও বিদআতী তালাক

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, "ফকীহরা উল্লিখিত কুরআনী আয়াত ও হাদীস থেকে তালাকের আইন-প্রণয়ন করেছেন আর এ থেকেই তাঁরা তালাককে সুন্নাত ও বিদয়াতে বিভক্ত করেছেন। অতএব, তালাকে সুন্নাত বলা হবে ঐ তালাককে যা পবিত্র অবস্থায় (সহবাসের আগে) অথবা গর্ভাবস্থায় দেয়া হয় যখন গর্ভের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে যায়। আর তালাকে বিদয়াত হচ্ছে সেই তালাক যা হায়েযের অবস্থায় দেখা হয় অথবা পবিত্র অবস্থায় সহবাসের পরে দেয়া হয়, এবং এটা জানা যায়নি যে স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে বা গর্ভহীন আছে।

ইসলামে তালাকের এ প্রকারভেদ সম্পর্কে অনেক লোকই জ্ঞাত নয়। এজন্যে অনেকেই সুন্নাত ও বিদয়াতের পরওয়া না করেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে। তারা হারাম হালালেরও কোন বাদ-বিচার করে না। তালাক কখন দেয়া যায় আর কখন যায় না এটা জানে না বলেই তারা ভুলের পর ভুল করেই যায়। মুসলমানদের জন্যে এ অজ্ঞতা বড়ই লজ্জার কথা। আজকাল অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, এমনকি দাম্পত্য ও পারিবারিক ব্যাপারে ইসলামের স্পষ্ট শিক্ষা সম্পর্কেও অনবহিত। ইসলামী শিক্ষা ও নীতি সম্পর্কে মুসলিম নর-নারীর এ অজ্ঞতা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রতিটি মুসলমানকে ইসলামের এসব শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা খুবই জরুরি। কারণ আল্লাহ্ নিজেই তাদেরকে তালাক সম্পর্কিত আয়াতেই সাবধান করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করে, আর যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করে।

আল্লাহ্ বলেছেন–
"এটা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, আর যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারা স্বয়ং নিজেদের ওপর অত্যাচার করবে। তোমরা জান না, হতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলা এর পরে কোনো নতুন পন্থা সৃষ্টি করে দেবেন।"

একপক্ষ মনে করেন তালাকে বিদয়াত হারাম হওয়া সত্ত্বেও তা তালাক হিসেবে কার্যকরী হয়ে যায়। তাঁদের মতে তালাকদাতা হারাম কর্ম করেছে সত্য, কিন্তু তাতে তালাক কার্যকরী হয়ে যায়। আর শাস্তির বিষয়টি শুধু আল্লাহরই এখতিয়ারে রয়েছে।

অন্যপক্ষ বলেন, এভাবে তালাক কার্যকরী হয় না। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণিত হাদীস। এ হাদীস স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের বর্ণনা মোতাবেক আল্লাহর রাসূল ﷺ তা নাকচ করে দেন এবং তাকে অকার্যকর ঘোষণা করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, "তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একে অর্থহীন ব্যাপার বলে অভিহিত করেন।"

আল্লামা ইবনে বারী বলেন–

"এর বিরোধিতা বিদয়াতী এবং হীন লোকেরা ছাড়া আর কেউ করেনি।"

শওকানী তাঁর 'নায়লুল আওতারে' তালাক বিরোধীদের বর্ণনাকে তালাক সমর্থকদের বর্ণনা থেকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এবং 'সামআনী' ও তাঁর 'সুবিলুস সালাম' এ শওকানীর কথা সমর্থন করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে– "তালাকে বিদয়াত"-কে আল্লাহ্ হারাম ঘোষণা করেছেন এবং এ কর্ম আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমতি ছাড়াই করা হয়। এজন্য এ ধরনের কর্ম বাতিল হবে যার ওপর কোনো রকমের শরীয়তী আইন প্রবর্তিত করা যাবে না।

এর যুক্তি-প্রমাণ হচ্ছে প্রিয় নবী ﷺ-এর এ বাণী–

"যে কাজ সম্পর্কে শরীয়তের কোনো নির্দেশ নেই তা পরিত্যক্ত।"

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে–
"এটা বিদয়াত এবং প্রত্যেক বিদয়াতই ভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তির ওপর কোন শরীয়তী আইন প্রবর্তিত করা যায় না। এজন্যে এ তালাক কার্যকরী হবে না বরং বাতিল হয়ে যাবে।

যাহোক, এসব মতভেদের কথা বাদ দিলেও, আমরা যদি তালাক সম্পর্কিত সর্বসম্মত আইন ও নীতির ওপর দৃষ্টিপাত করি তাহলে একথা স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, ইসলামী সমাজে ব্যক্তির দাম্পত্য ও সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির ব্যবস্থাবলি যেভাবে করা হয় অন্য কোথাও তার চিন্তাও করা যেতে পারে না। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি– তিনি যেন এ সহজ-সরল ও সত্যপথে আমাদের পরিচালিত করেন।

তালাকের শিষ্টাচার

প্রশ্ন ওঠে, যদি স্বামীর শেষ আপোষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায় এবং তার জন্যে স্ত্রীকে তালাক দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে– তাহলে তার পন্থা ও উপায় কী?

এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর বাণীকে বুনিয়াদ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে–
"তালাক দু'বার। এরপর হয়তো সহজভাবে নারীকে রেখে দেয়া হবে অথবা ভদ্রভাবে বিদায় করে দেয়া হবে।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২২৯)

উপরের বর্ণিত আয়াতের অর্থ মোতাবেক শরীয়তী তালাক তখনি স্বীকার করা হবে যখন তা কিছু সময়ের ব্যবধানে দেয়া হবে। আয়াতের শাব্দিক অর্থেও তাই

বুঝা যাচ্ছে। এজন্যে আয়াতের ইঙ্গিত এ কথার দিকে রয়েছে যে, স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক পুনর্বহালের অধিকার শুধু দু'বার পাওয়া যাবে– এ শর্তে যে, তালাক কিছুদিন পরপর দেবে। কোন কোন উলামা এ প্রসঙ্গে উমর, উসমান, আলী, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ বিন উমর, ইমরান বিন হোসাইন, আবু মূসা আশয়ারী, আবু দারদা এবং হুজাইফা বিন আল ইয়ামান (রা) প্রমুখের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এজন্য একই সময়ে তিন তালাককে শুধু এক তালাক বলে মানা হয়েছে। রাসূলের আমল, আবু বকরের খিলাফতকাল এবং উমরের খিলাফতকালীন দু'বছর পর্যন্ত এ বিধান ও নীতিই প্রচলিত ছিল। (কিন্তু পরে এ সুযোগের অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের কারণে উমর কিছুটা কড়াকড়ি করার প্রয়োজন বোধ করেন।)

এ সম্পর্কে উমর নিজেই বলছেন–

"লোকেরা এমন এক ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে থাকে যাতে তাদের জন্য নমনীয় রাখা হয়েছিল, এজন্যে আমাদের মতে তা প্রবর্তন করে দেয়া উচিত, অতএব তা প্রবর্তন করে দেয়া হয়েছে।"

অত:পর উমরের আমলে এ পরিস্থিতি দাঁড়ায় যে, লোকেরা শরীয়তের নমনীয়তা থেকে অবৈধ উপায়ে ফায়দা হাসিল করতে শুরু করে এবং নবীর সুন্নাতের প্রতি উপেক্ষা করে বারংবার তালাক দিতে থাকে। কিন্তু রাসূলের ভক্ত ও প্রেমিক উমর (রা) রাসূলেরই সুন্নাতের প্রকাশ্য বিদ্রূপ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি একই সাথে দেয়া তিনটি তালাকই কার্যকরী হবে বলে আদেশ জারী করেন যাতে রাসূলের সুন্নাতের বাহানায় সুযোগের অপব্যবহার করতে না পারে। এভাবে একই সাথে একই বারে দেয়া তিনটি তালাককেই কার্যকরী হওয়ার কথা ঘোষণা করে তিনি তালাক নিয়ে ক্রীড়ারত লোকদের সতর্ক করে দেন যাতে করে তালাকের অনুপাত হ্রাস পেতে পারে।

ইমাম নাসাঈ মাহমুদ ইবনে লাবিদ (রা)-এর মাধ্যমে, একই বারে তিনটি তালাকের অবৈধতা সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন– প্রিয় নবীকে এমন এক লোকের ব্যাপারে জানানো হয় যে, একই সাথে নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়।

এ ঘটনা শুনে প্রিয়নবী রাগে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন–

"আল্লাহর কিতাবের সাথে কি এ ধরনের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হবে? অথচ, আমি এখনো তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছি।"

প্রিয়নবীর একথা শুনে দুই ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল–

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে কতল করে দেব না?"

উমরের জারীকৃত আদেশ সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় যে, স্বয়ং তাঁর বর্ণনা মোতাবেক, এর মাধ্যমে লোকদের তালাকের প্রবণতা থেকে রুখে দেয়াটাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটা দেখা যায় যে, উমরের এ নীতিও লোকদেরকে পুরোপুরি সংশোধন করতে পারেনি এবং তারা বরাবর একই ভুল করে যাচ্ছিল। এজন্যে এখন আমাদেরকে কেবল রাসূলের সুন্নাতের ওপরই অবিচল থাকা উচিত। কারণ এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অর্থাৎ একই সাথে দেয়া তিন তালাককে এক তালাক বলেই গণ্য করতে হবে।

কোন কোন ইসলাম বিশেষজ্ঞের এ অভিমতও রয়েছে যে, একই সাথে তৃতীয় তালাকটি আদতেই কার্যকারী হয় না। বস্তুত এটা এক তালাকও হয় না, আবার তিন তালাকও হয় না, কারণ এটা হচ্ছে তালাকে বিদয়াত এবং এ ব্যাপারে তাঁদের কাছে আরো যথাযথ যুক্তিপ্রমাণ রয়েছে।

যাহোক, এ বিস্তারিত আলোচনায় আমাদের আসল উদ্দেশ্যে হচ্ছে এটা দেখানো যে, তালাকের মতো বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। খোদা না করুন, কেউ যদি এ অবস্থার শিকারে পরিণত হয় তাকে অত্যন্ত ধৈর্য ও বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় দিতে হবে যেন এ ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়। বলাবাহুল্য ইসলাম মানব জীবনের স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা করে।

পাঠক, এবার এ ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে তাহলে কি তক্ষুনিই তাদের মধ্যেকার সব সম্পর্কের অবসান ঘটে? পর মুহূর্তেই কি তারা পরস্পরের কাছে অচেনা হয়ে যাবে? এসব প্রশ্নেরই বিস্তারিত জবাব সামনের আলোচনা তুলে ধরছি।

ইদ্দত

ইসলামী আইনশাস্ত্রে তালাকের পর একটি নির্ধারিত বিরতি-অপেক্ষাকে ইদ্দত বলা হয়। তালাক পাওয়ার পর স্ত্রী এ ইদ্দত পালন করে, এটা একটা শরীয়তী বিধান। এ বিধানের অধীনে তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ইদ্দত পালনকালে নিজের সাবেক দাম্পত্য অধিকার ও দায়িত্ব এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক সীমারেখা থেকে মুক্ত হয়ে এক নতুন জীবন শুরু করে। তখন তার ওপর স্বামীর প্রাধান্যেরও অবসান ঘটে এবং সে নিজের ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

ইদ্দতের বিধি-বিধানকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি−

১. সহবাসের আগেই যে তালাক দেয়া হয় তার আদৌ কোন 'ইদ্দত' নেই। এর যুক্তি-প্রমাণ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত−

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মু'মিন নারীর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হও এবং এরপর তাদের স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়ে থাক তাহলে তোমাদের পক্ষ থেকে ওদের ওপর কোন ইদ্দত জরুরি নয়− যার পূর্ণতার দাবি তোমরা করতে পার। অতএব, তাদেরকে কিছু সম্পদ দাও এবং ভদ্রভাবে বিদায় কর।" (সূরা আহযাব : আয়াত-৪৯)

২. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীটি যদি এমন বৃদ্ধা হয় যে, তার হায়েয (মাসিক ঋতু) আসাটাই বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা এত অল্পবয়স্কা যে তার হায়েয (মাসিক ঋতু) শুরুই হয়নি− তাহলে এমন নারীদের ইদ্দত হবে তিন মাস।

আর এর যুক্তি-প্রমাণ হচ্ছে এ আয়াত−

"এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা হায়েয সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয়ে থাকে, (তাহলে তোমরা জেনে রাখ) তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর একই আদেশ ওদের জন্যেও যাদের এখনো হায়েয আসেইনি।"

৩. হায়েযা বা ঋতুমতী নারীদের ইদ্দত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিছুটা মত-পার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন তিন হায়েয আর কেউ বলেন তিন তহুর।

তাঁদের মতপার্থক্যের বুনিয়াদ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি−

"যে সব নারীকে তালাক দেয়া হয়েছে তারা তিন কুরু' অপেক্ষা করবে।"

'কুরু' শব্দটি আরবিতে একইভাবে হায়েয এবং পবিত্র উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থের এ ঐক্যই হচ্ছে তাঁদের মতপার্থক্যের বুনিয়াদ।

৪. গর্ভবর্তী নারীর ইদ্দত হচ্ছে সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আর তার যুক্তি প্রমাণ হচ্ছে কুরআনের এ আয়াত−

"এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতের সীমা হচ্ছে (এই যে) তাদের গর্ভ খালাস হওয়া।" (সূরা তালাক : আয়াত-৪)

এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইদ্দতের সময়ও নেহায়েত কম অপেক্ষা নয়; বরং এটা এতো দীর্ঘ যে, তা একটি ভুলের সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট। এর দীর্ঘসূত্রিতার অন্যতম উদ্দেশ্য আসলে ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আরেকটি সুযোগ সরবরাহ করা।

ইদ্দতকালীন কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা

ইদ্দতকালীন নারীর মান তার স্বামীর জন্যে একেবারে অপরিচিত তার মতোও হবে না আবার স্ত্রীসুলভও হবে না, বলা যায় ঠিক মধ্যম অবস্থায় থাকে। এ মধ্যম অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ শরীয়তের নিম্নবর্ণিত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১. তালাকের পরও নারীর মান অন্যান্য সব ব্যাপারে স্ত্রীর মতোই থাকে এবং ইদ্দতকালে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়ার কোন অধিকারই স্বামীর নেই। এর যুক্তি প্রমাণ হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত ...

   "হে নবী! যখন তোমরা নিজেদের নারীদের তালাক দাও তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের মধ্যে তালাক দিও এবং ইদ্দতের সময় ঠিক ঠিক গণনা করো এবং আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদের প্রতিপালক। (ইদ্দতের সময়) তোমরা তাদেরকে ঘর থেকে বের করবে না এবং নিজেরা বের হবে না।"

   এতে সন্দেহ নেই যে, এক ঘরে উভয়ের একসাথে বসবাস করানো এবং এত নিকটে রাখাটা উদ্দেশ্যহীন নয় আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উভয়ের মধ্যে সমঝোতার উত্তম সুযোগ সরবরাহ করা।

২. তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্যে ইদ্দতের সময় স্বামীর ঘর থেকে বের হওয়া বৈধ নয়। অবশ্য খুব জরুরি কাজে বের হতে পারে। অন্যথায় উদ্দেশ্যহীন বের হলে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু তাতে তার ইদ্দত বাতিল হবে না।

৩. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত হচ্ছে, ইদ্দতের সময় নারীকে খুব সাজসজ্জা ও রূপচর্চার সাথে থাকা উচিত, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি পরা উচিত, উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত– এবং এভাবে থাকা উচিত যাতে তার স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৪. ইদ্দতের সময় যদি স্বামী অথবা স্ত্রীর মধ্যে কেউ মারা যায় তাহলে উভয়ই একে অন্যের উত্তরাধিকারী হবে।

৫. ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নারী বিয়ে করতে পারবে না ইদ্দতের সময় সে তার কাছেই থাকবে এবং ইদ্দতের সময় স্বামী যখনই ইচ্ছে করবে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে পারবে, আর স্ত্রী এটা পছন্দ করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে যায় না।

কেননা আল্লাহ বলেছেন–

"তাদের স্বামী সম্পর্ক পুনর্বহালের ব্যাপারে সম্মত হলে তারা এ ইদ্দতের সময়ে তাদেরকে আবার নিজেদের স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী রয়েছে।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-২২৮)

এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ইদ্দতকালীন স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করার অধিকার স্বামীর রয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে এ ব্যাপারে দু'জন সুবিচারককে সাক্ষী বানিয়ে নেবে।

আল্লাহ বলছেন–
"এবং নিজেদের মধ্যে থেকে এমন দুজন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে নাও যারা হবে সুবিচারক।" (সূরা তালাক : আয়াত-২)

কিন্তু ইদ্দতের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলে স্বামী যদি তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে চায় তাহলে সে অধিকার আর তার থাকবে না। ইদ্দতের পর নারী তার সাবেক স্বামীর জন্যে একেবারে অপর ও অপরিচিত নারীর মতো হয়ে যাবে এবং উভয়েই পরস্পরের অপর ও অপরিচিত জনের মতো হয়ে যাবে। এরপর নির্দিষ্ট আইন মোতাবেক নতুন করে বিয়ে করেই কেবল তারা আবার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কায়েম করতে পারে এবং এ ব্যাপারে সাবেক স্বামীর প্রস্তাব গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে।

দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের বিধিব্যবস্থা

ইদ্দতের সময়ে স্বামী যদি দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করে নতুন জীবন শুরু করে এবং এরপর কিছুদিন অতিবাহিত হলে আবার যদি এমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় যার ফলে দ্বিতীয়বার তালাক দিতে হয় তাহলে আবার সেই আইনগুলো নতুন করে পালন করতে হবে যা আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি। এমনকি দ্বিতীয় তালাকের পরও যদি সে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে চায় তাহলে সে দ্বিতীয় ইদ্দতকালীন তা করতে পারে।

কিন্তু তার জানা উচিত, এরপর যদি সে আবার তালাক দেয় তাহলে তার দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের আর কোন অধিকার থাকবে না। কেননা সে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সুযোগ ইতোমধ্যেই ব্যবহার করে নিয়েছে এবং তৃতীয়বার তালাক দেয়ার সময় তাকে এটা মনে রাখতে হবে যে এবার তার স্ত্রী জরুরিভাবে পৃথক হয়ে যাবে এবং হালাল করা ছাড়া সে আর তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে পারবে না। সুতরাং তৃতীয় তালাক দেয়ার আগে সে হয় স্ত্রীকে স্ত্রীত্বের মর্যাদা দিয়ে রাখবে অথবা ভদ্রভাবে বিদায় করে দেবে।

আল্লামা ইবনে কাসীর-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাসের এ বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়েছেন– "যখন স্বামী তার স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়ে দেয়, তাকে তৃতীয় তালাক দেয়ার সময় আল্লাহকে ভয় করা উচিত (এবং দুই তালাকের পরই তার উচিত) চাইলে সে ভদ্রভাবে তার স্ত্রীকে রাখবে অথবা চাইলে ভদ্রভাবে পৃথক করে দেবে এবং স্ত্রীর অধিকারের দিকে পুরোপুরি লক্ষ্য রাখবে।

পুরুষকে, আবার দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের সুযোগ দানের পেছনে শরীয়তের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, স্ত্রীর বিচ্ছেদ এবং তার একাকিত্বের পুরোপুরি অনুভূতি জাগানো। এসময় এমন বিরক্তি ও মানসিক পীড়া অনুভব করে যে তা বর্ণনার অতীত। তালাক দেয়ার আগে সে এ বিরক্তি ও মানসিক পীড়ার কথা পুরোপুরি অনুমান করতে পারেনি। আর এ অজ্ঞতার কারণেই হয়তো আল্লাহ্ তাকে এ দুঃখ ও মর্মপীড়ার হাত থেকে রেহাই দেয়ার জন্যেই এ বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। উপদেশ ও অভিজ্ঞতা একেবারেই পূর্ণ হয়ে যায় না বলে তাকে দু'দুবার এ সুযোগ দেয়া হয়, যাতে সে তার বিষয় বিবেচনায় ভুল না করে এবং তার একাধিক সুযোগ লাভের অধিকারও পূর্ণ হয়।

এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন ব্যক্তি দু'দুবার তালাকের ফলাফল সম্পর্কে অবগতি অর্জন করে তখন তৃতীয়বার তালাক সে সব কিছু জেনে বুঝে এবং দেখে শুনেই দেয়। সে যখন দেখে যে স্ত্রীর বিচ্ছেদেই তার কল্যাণ তখন সে তালাক দেয়– নয়তো সে ভদ্রভাবে স্ত্রীত্বের মর্যাদা দিয়ে তাকে রেখে দেয়। এটা বস্তুত অজ্ঞ ও অবুঝ বান্দাহদের প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ মেহেরবাণী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ পর্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি, তাদের দাম্পত্য বিভেদ ও সমস্যাবলির ইসলামী সমাধান এবং তালাকের শরীয়তী নীতি ও বিধিবিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। তালাকের প্রকারভেদ ও কার্যকারিতা এবং অকার্যকারিতা সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। এসব আলোচনার ফলে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও উপকারিতা এবং মানব সমস্যাবলি সমাধানে ইসলামের গভীর আন্তরিকতার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে করে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তব ভিত্তিরও ভারসাম্যপূর্ণতার ছবি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইসলাম যে সহজ ও উদারনৈতিক জীবনাদর্শ এবং এতে যে চরমপন্থার কোন স্থান নেই– আমাদের আলোচনা থেকে সেই সত্যতাও ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে আমরা নারী সমস্যা নিয়ে হৈ-চৈকারী এবং দাম্পত্য ও পারিবারিক ব্যবস্থার ষোল আনাই মেকী উদ্বেগ প্রকাশকারী ভাই-বোনদের বলব যে, কৃত্রিম মায়াকান্নার অভিনয় না করে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করুন। বুদ্ধি-বিবেক সহকারে ইসলামী সমাধান সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন এবং ইসলাম সম্পর্কে মূর্খতাপূর্ণ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। সত্যিকার অর্থে পড়াশুনা করে থাকলে আপনারাও এটা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, নারী সমস্যা তথা

দাম্পত্য ও পারিবারিক সমস্যার সবচেয়ে সহজ ও উত্তম সমাধান শুধু ইসলামই পেশ করেছে। এ সত্যতা সম্পর্কে যদি আপনাদের কারো সংশয় বা ভিন্নমত থাকে তাহলে বলুন যে, মানবিক মর্যাদা, মানুষের স্বভাব ও সুযোগ-সুবিধার সামগ্রিক দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আদর্শ রয়েছে যে এসব সমস্যাবলির স্থায়ী ও সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছে?

এখানে আমরা ওসব লোকদেরকে গঠনমূলক চিন্তাভাবনার আমন্ত্রণ জানাব, যারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে মুখের এক ঠুনকো ঝটকায় দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটাতে চায়। তাদের বোঝা উচিত যে, শরীয়তের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের জন্যে এক সুখী, সুন্দর ও কল্যাণকর ব্যবস্থা উপহার দিয়েছেন। এটা পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার জন্যে যে কত অপরিহার্য ও উপকারী তা খুব ভালো করেই যেন তারা জেনে-বুঝে রাখে।

ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের দৃষ্টিতে তালাক

পেছনের দীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা যে কেউ দাবি করে বলতে পারেন যে ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অবাঞ্ছিত কাজ। এর অনুমতি কেবল তখনই দেয়া হয় যখন এছাড়া অন্য কোন উপায় অবশিষ্ট থাকে না। আর এর অনুমতি দানের মাধ্যমে ইসলাম ব্যক্তিকে এক জটিল ও অসহ্যকর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয় এবং দুই চরমপন্থায় মাঝখানে স্বস্তি ও মুক্তির পথরেখা এঁকে দেয়। ইসলামের তালাক সংক্রান্ত পুরো ব্যবস্থাটি অধ্যয়নের পর যে কোন ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে, এটাই সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান এবং এটাই একান্ত বাস্তব উপযোগী জীবন ব্যবস্থা।

মনে করুন, ইসলাম যদি তালাকের অনুমতি না দিত তাহলে বাস্তব জীবনে যে কত কঠিন সমস্যাবলির সৃষ্টি হতো তার অনুমান করাও মুশকিল।

একটি পাগল বা ব্যধিগ্রস্ত, বা দুশ্চরিত্র বা অত্যাচারী ধরনের স্বামী অথবা স্ত্রী যদি একবার পরস্পরের গলায় বেঁধে দেয়া হতো তাহলে সারাটি জীবন সীমাহীন তিক্ততা আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে কেটে গেলেও পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে বাঁচার কোন পথ থাকত কি? এভাবে উভয়ের মধ্যে কোন একজন যদি বদ্ধপাগল অথবা ভ্রষ্ট অথবা মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ত অথবা কারো স্বামী যদি নির্মম নিষ্ঠুর অথবা স্ত্রী যদি কুলটা বা বদ-মেজাজী হতো তাহলে তালাকের উপায় না থাকলে

তাদের উভয়ের সারা জীবন অসহ্য মর্ম-পীড়ার যাতনায় ধুকে ধুকে কাটাতে বাধ্য হতো, উভয়ের মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব দারুণভাবে খর্ব হতো। এতে করে অত্যাচারী স্বামী তার অপছন্দনীয় স্ত্রীর সাথে জঘন্য জুলুম করতো এবং তাকে সবরকমের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জানোয়ারের মতো বেগার খাটাতে বাধ্য করত।

এ ধরনের আরো অনিবার্য কারণ রয়েছে যার ভিত্তিতে ইসলাম স্বামী স্ত্রীকে পৃথক হয়ে স্বাধীন জীবনযাপনের অনুমতি দিয়েছে। আর পৃথক হওয়ার দুটি আলাদা নীতি ও ব্যবস্থা দিয়েছে যা নারীর ক্ষেত্রে খোলায়া আর পুরুষের ক্ষেত্রে তালাক বলে পরিচিত। নিঃসন্দেহে এ দুটি নীতি এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের বৃহত্তর কল্যাণের পথ সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের মানবিক স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদার বিজ্ঞানসম্মত স্বীকৃতি দিয়েছে।

খৃস্টবাদের দিকে তাকালে আমরা দেখি সেখানে ধর্মীয়ভাবে তালাকের কোন ব্যবস্থা বা অবকাশই রাখা হয়নি। খৃস্টবাদী ধারণা মোতাবেক আল্লাহ পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যে একবার কোন পুরুষ ও নারী আল্লাহর নাম নিয়ে একসাথে জীবনযাপনের পদক্ষেপ নিলে তারা উভয়ে একই শরীরের মতো হয়ে যায়, এরপর তাদের পরস্পর আলাদা হওয়া মোটেই ঠিক নয়। কারণ যে বন্ধন আল্লাহর নাম নিয়ে বাঁধা হয়েছে তা ছিন্ন করার ক্ষমতা কোন মানুষেরই নেই।

কথিত আছে ঈসা (আ) তাঁর শিষ্যদের এ ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন–
"পুরুষকে তার স্ত্রীর সাথে এভাবে লেপ্টে যাওয়া উচিত যেন উভয় এক দেহ ও এক প্রাণ হয়ে যায়। তারা দুজন কখনো একে অন্য থেকে আলাদা হবে না। কেননা যাকে আল্লাহ একত্রিত করেছেন তাকে মানুষ বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।"

(অতি–১৯ : ৬)

খৃস্টবাদে তালাকের অবকাশ শুধু এক অবস্থায় দেয়া হয়েছে তা হলো, যখন তাদের মধ্যে কোন একজন দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করে (অর্থাৎ ব্যভিচার করে)। এছাড়া তালাক বৈধ হবার আর কোন উপায় নেই।

বলাবাহুল্য, এ ধরনের বিধিনিষেধ হচ্ছে এক ধরনের চরমপন্থা, যা বাস্তব জীবনে কার্যকর করা অত্যন্ত মুশকিল, এমনকি অসম্ভব বলা যেতে পারে। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, প্রোটেসট্যান্ট সম্প্রদায় এক্ষেত্রে কিছুটা উদারনৈতিক ব্যবস্থা

গ্রহণের প্রয়োজন মনে করেছে এবং ব্যভিচার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও তালাকের অবকাশ বের করেছে।

খৃস্টধর্মে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য বিয়ে করে তাহলে সে ব্যভিচারের অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়। এভাবে যদি নারী তার প্রথম স্বামীকে ছেড়ে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিয়ে করে তাহলে বাইবেলের আইন মোতাবেক সেও ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে।

মারকস-এর বাইবেলে বলা হচ্ছে–

"যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে তাহলে সে যেন তার সাথে ব্যাভিচার (যেনা) করেছে। এভাবে যদি স্ত্রী দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে সেও ব্যভিচারিণী সাব্যস্ত হবে।" (মারকস ১০, ১১, ১২)

কিন্তু ইসলাম ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর নারীকে নিজের ইচ্ছেমতো যে কোন পুরুষের সাথে বিয়ে করার স্বাধীনতা দান করে, তা তার প্রথম স্বামীর কাছ থেকে সে তালাক পেয়ে থাকুক বা খোলায়া অর্জন করে থাকুক। এভাবে পুরুষও দ্বিতীয় বিয়ে করার ব্যাপারে স্বাধীন।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ–

"স্বামী-স্ত্রী যদি একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ নিজের অফুরন্ত অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে প্রত্যেককে লালন পালন করবেন।" (সূরা নিসা : আয়াত-১৩)

উপরে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন, "এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, যদি শরীয়তের আইন মোতাবেক তালাক দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীকে সাবেক স্বামীর চেয়েও উত্তম স্বামী এবং স্বামীকে সাবেক স্ত্রীর চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করবেন এবং উভয়ে দ্বিতীয় বিয়ের পর নিজেদেরকে উত্তম অবস্থায় পাবে এবং তাদের যাবতীয় সমস্যাকে আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দিবেন।"

বস্তুত, ইসলামের এই শিক্ষা মানব স্বভাবের সাথে একান্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছার অনুকূল।

অসংখ্য ধন্যবাদ, সে মহান দয়াময় আল্লাহকে যিনি আমাদেরকে ইসলামের মতো সুন্দর ও সহজ জীবন-ব্যবস্থা দান করেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হালালা

উপস্থাপনা : আল্লাহ্ বলেছেন, "এরপর যদি (দ্বিতীয়বার তালাক দেয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয়বার) তালাক দিয়ে থাকে তাহলে সেই নারী এরপর ওর জন্যে হালাল হবে না। তবে যদি তার বিয়ে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে হয় এবং সে তাকে তালাক দিয়ে দেয় তখন যদি প্রথম স্বামী এবং এ নারী উভয়ে এ ধারণা করে যে, আল্লাহ্র সীমায় কায়েম থাকব তাহলে ওদের জন্যে একে অন্যের দিকে রুজু করাতে কোন বাধা নেই।"

উপরের আয়াত শরীফের অর্থ এই যে, যখন এক ব্যক্তির নিজের স্ত্রীকে নির্ধারিত ইসলামী আইনবিধি মোতাবেক দুই তালাক দিয়ে থাকে সে এভাবে তার অধিকার নাকচ করে দেয়। এখন যদি সে তৃতীয়বার তালাক দেয় : তাহলে এ নারী তার জন্যে হারাম (নিষিদ্ধ) হয়ে যায়। তবে যদি সে আরেক বিয়ে করে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথেও যদি তার বনিবনা না হয় এবং সেও তাকে তালাক দিয়ে দেয় তখন প্রথম স্বামী তার সাথে আবার বিয়ে করতে পারে।

ইসলামী বিশেষজ্ঞরা এ কঠিন শর্তের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামীকে শাস্তিদান এবং তার আক্কেল দুরস্ত করা। কেননা, কোন আত্মসম্মানী স্বামী তার স্ত্রীকে অন্য কোন ব্যক্তির অঙ্গশায়িনী হতে দেখাটা সহ্য করবে না এবং এজন্যে সে এ ধরনের কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে হাজারবার ভেবে দেখবে, যার কারণে সে চিরদিনের জন্যে তার স্ত্রীর থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে।"

হালালার শর্তাবলি

ইমাম মুজতাহেদিনদের ধারণা মোতাবেক, তিন তালাক দেয়ার পর স্ত্রীর তার প্রথম স্বামীর জন্যে কেবল তখনি হালাল হতে পারে যখন সে নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত পূরণ করবে তা হচ্ছে–

১. প্রথম স্বামীর তালাক দেয়ার পর সেই ইদ্দত পালন করবে।
২. এরপর অন্য কোন ব্যক্তির সাথে যথার্থ বিয়ে করবে।
৩. এবং তাদের উভয়ের মধ্যে সহবাস (দৈহিক মিলন) হবে।
৪. এরপর সে তাকে তালাক দেবে।
৫. এবং সে আবার ইদ্দত পালন করবে।

এরপর যদি প্রথম স্বামী চায় এবং সে নিজেও সম্মত হয় তাহলে উভয়ে আবার বিয়ে করতে পারে।

হালালার অর্থ

সাধারণত এমন হয় যে সাময়িক উত্তেজনার শিকার হয়ে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, এরপর যখন অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে, তার পরিবারে শান্তি শৃঙ্খলা তছনছ হয়ে যায় এবং স্ত্রীর বিচ্ছেদ তার জন্যে অসহ্য হয়ে ওঠে তখন সে শরীয়তের আইনের ফাঁক অনুসন্ধান করতে শুরু করে। সে এর একটি ব্যবস্থা এভাবে করে যে, কারো কাছে গিয়ে এটা ঠিক করে যে, সে তার সাবেক স্ত্রীকে এ শর্তে বিবাহ করবে যে একবার সহবাস করার পর তাকে তালাক দিয়ে দেবে, এভাবে সে তার সাবেক স্ত্রীকে নিজের জন্যে হালাল করার পন্থা খোঁজে এবং মনে করে যে, সে শরীয়তের বিধানের অনুসরণ করে অথচ আসল কথা হচ্ছে এভাবে সে শরীয়তের বিধানের সাথে ঠাট্টাই করছে।

এভাবে হালাল অর্থ যেন এ হয়- স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্যে হালাল করানো। শরীয়তের পরিভাষায় এ ধরনের কর্তাকে মুহাল্লাল এবং যার জন্যে এ কর্ম করা হয়েছে তাকে মুহাল্লালাহু বলা হয়।

হালালার বিধি-নিষেধ

উপরে হালালার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং শরীয়ত বিরুদ্ধ। কারণ এতে করে কুরআনে বর্ণিত শর্ত ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। আল্লাহ যে বিয়ের নির্দেশ দিয়েছেন তা হবে স্বাভাবিক সর্বজনীন সুন্নাত মোতাবেক বিয়ে। বিয়ের নামে কোন নাটক অভিনয়ের কথা বলা হয়নি। যারা এ ধরনের উদ্দেশ্যপূর্ণ বিয়ের অভিনয় করে, তার সাথে শরীয়তের নির্দেশিত বিয়ের কোন সামঞ্জস্য নেই।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ের আসল অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নারী ও একটি পুরুষ নতুন আবেগ ও স্বপ্নে উদ্বেলিত হয়ে নতুন জীবনের শুভসূচনা করে। একে অন্যকে দৈহিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শান্তি ও স্বস্তি দান করে এবং পরস্পরকে আনন্দ-উল্লাসে উজ্জীবিত করে তোলে।

যেমন আল্লাহ বলেছেন-
"এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি এই যে তিনি তোমাদের জন্যে স্বয়ং তোমাদেরই মধ্যে থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন তাদের কাছে শান্তি অর্জন কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া এবং রহমত সৃষ্টি করেছেন।"
(সূরা রুম : আয়াত-২১)

এভাবে বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশবিস্তার করা। পবত্রি কুরআন এবং বিভিন্ন হাদীসে এর স্পষ্টকরণ রয়েছে।

যেমন এক হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন–

"অধিকতর প্রেমময়ী এবং সন্তান উৎপাদনশীল নারী বিয়ে কর যেন আমার উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।"

অন্য একটি হাদীস হচ্ছে–

"বিয়ে কর, বংশবিস্তার কর এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাও যেন হাশরের দিন আমি তোমাদের নিয়ে অন্যান্য জাতির মোকাবিলায় গর্ব করতে পারি।"

এজন্যে আমরা দেখতে পাই যে, বিয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় তাতে এতো বেশি ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করা হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্ব স্থির করা হয় যেমন ভরণ-পোষণ মোহর-বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা...।

বিয়ের তাৎপর্য এবং এবং কিইবা তার উদ্দেশ্য? এ নিয়ে আমরা ইতো:পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ থেকে অবশ্যই বিয়ে ও হালালা মধ্যেকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। একদিকে বিয়ে হচ্ছে অত্যন্ত ফলপ্রসূ পবিত্র গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্ম, আর অন্যদিকে হালালা হচ্ছে একটি নির্লজ্জ নাটক অভিনয়।

প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন, "কর্ম তার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল" এবং হালালা সেই কর্ম যাতে কারো উদ্দেশ্যেই মোহর আদায় করা বা একসাথে জীবনযাপনের উদ্দেশ্য থাকে না। এখানে পাত্র-পাত্রী কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না এবং বৈধ সন্তান উৎপাদনের কোন উদ্দেশ্য তাদের থাকে না।

মোটকথা, বাহ্যতঃ হালালাকে বিয়ের মতো একটা রূপ দেয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে বিয়ের অর্থ ও উদ্দেশ্যের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। এজন্যে হালালাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এক ধরনের প্রকাশ্য তামাশা বলেই গণ্য করা যায়।

ওসমান (রা) বলেছেন–

"বিয়ে এমন এক ব্যাপার যাতে কোন লুকোচুরি থাকে না।"

আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে এক ব্যক্তি অন্য এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানালেন যে, সে নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিজেরই ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেয় যেন তার মাধ্যমে হালালা করা যায়। সে জিজ্ঞেস করল, এভাবে কি মহিলাটি তার প্রথম স্বামীর জন্যে বৈধ হয়ে যাবে? ইবনে ওমর জবাব দিলেন– 'হবে না। কারণ বিয়ে

এক ইচ্ছার নাম। আমরা তো রাসূলুল্লাহর আমলে এ ধরনের কাজকে (হালালাকে) যেনা (ব্যভিচার) বলে গণ্য করতাম।'

আর এ ভিত্তিতে উমর (রা) বলেছিলেন–

"হালালাকারী পুরুষ বা নারীকে যদি আমার আদালতে আনা হয় আমি তাদেরকে রজমের (পাথর বর্ষণ করে মৃত্যুদণ্ড) শাস্তি দেবো।"

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সে হালালাকারীর ওপর অভিসম্পাত করেছেন। এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হালালা বৈধ বিয়ে নয় : বরং ব্যভিচার। কেননা আল্লাহর রাসূল বিয়েকারীদের ওপর কখনও অভিসম্পাত করতে পারেন না, বরং বিয়েকে তিনি আশীর্বাদই করেছেন।

প্রিয়নবী ﷺ হালালাকারীকে "ভাড়াটে ষাঁড়" বলে অভিহিত করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, এখানে সমস্যাটির ইতিবাচক দিকটির ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা বলা হয়নি যে, যদি তারা উভয়ে সংশোধন হতে না চায়, তাহলে পৃথক হওয়া উত্তম। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলামের আন্তরিক প্রচেষ্টা, বিশৃঙ্খলা, ঘৃণা ও বিদ্বেষকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বিবেচনা করে।

উল্লেখযোগ্য যে, এখানে সমস্যাটির ইতিবাচক দিকটির ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা বলা হয়নি যে, যদি তারা উভয়ে সংশোধন হতে না চায়, তাহলে পৃথক হওয়া উত্তম। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলামের আন্তরিক প্রচেষ্টা, বিশৃঙ্খলা, ঘৃণা ও বিদ্বেষকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বিবেচনা করে।

উকবা বিন আমের (রা) বর্ণনা করেছেন–

প্রিয়নবী ﷺ একবার সাহাবীদের বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে বলব না?"

সাহাবীরা বললেন– "কেন নয়, হে আল্লাহর রাসূল।

প্রিয় নবী ﷺ বললেন, "সে হচ্ছে 'মুহাল্লাল' (হালালাকারী)। আল্লাহ তা'আলা মুহাল্লাল এবং মুহাল্লালাহু উভয়ের ওপর অভিসম্পাত করেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মা ও স্ত্রী হিসেবে নারী

উপস্থাপনা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ে নিছক নারী ও পুরুষের সহ-মিলনের নামই নয়, বরং আসলে এটা সেই আধ্যাত্মিক সম্পর্ক এবং সেই বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার নাম যার বন্ধনে থেকে তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক কামনা বাসনার পূর্ণতা অর্জন করে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় এ বাস্তব সত্য কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একই কথা মাতৃত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোন নারী শুধু সন্তান উৎপাদন করেই মাতৃত্বের মর্যাদা পেতে পারে না। এটা আসলে সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতির নাম যা নারীর অন্তরে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। এরই বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করতে যাচ্ছি।

এ সম্পর্কে বুনিয়াদী নীতি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতেই নির্ধারিত হয়েছে–
"এবং তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্যে সম-অস্তিত্ব স্ত্রীদের বানিয়েছেন এবং তিনিই ওসব স্ত্রীদের কাছ থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দান করেছেন এবং ভালো ভালো দ্রব্যাদি তোমাদের খেতে দিয়েছেন।" (সূরা নহল : আয়াত-৭২)

আমরা দেখতে পাই যে, পশু-পাখিরাও নর ও মাদী পরস্পর যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এর মাধ্যমে তাদেরও বংশবিস্তার হয়ে থাকে। আমরা এ ব্যাপারে অবিদিত নই যে, পশু-পাখিদের মধ্যেও মাতৃ সম্পর্ক বর্তমান থাকে। তাদের মায়েরাও একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত নিজের পেটে গর্ভধারণ করে রাখে, এরপর প্রসবের পরে সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহমমতা পোষণ কর, অত্যন্ত যত্নের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন করে এবং খাওয়া ও থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করে মানুষ যদি ঠিক এটাই করে থাকে তাহলে জীবজন্তু, পশুপাখি আর মানুষের মধ্যে পার্থক্যই বা কি থাকে? উভয়ের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থেকেই থাকে তাহলে তা হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক বা নৈতিক অনুভূতি যা কেবল মানুষেরই বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

আমরা ইতোপূর্বে প্রথম পরিচ্ছেদে বিয়ে শীর্ষক আলোচনায় এদিকে ইঙ্গিত করেছি যে, মানুষ দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর মধ্যে একটি হচ্ছে প্রাণী হিসেবে তার জৈবিক মান যা তাকে প্রাকৃতিক আইনের তাওতাভুক্ত রাখে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার চারিত্রিক মূল্যবোধের বুনিয়াদ সরবরাহ করে। এ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিধানের কোন ভূমিকা থাকে না। এর পরেও এটা কেবল আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী যে, এ দুটি ক্ষেত্রে তিনি উভয়কে একে অন্যের থেকে

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। জৈবিক দিক থেকে আল্লাহ্ মানুষকে নারী ও পুরুষে বিভক্ত করেছেন। উভয়ের সাংগঠনিক উপাদান এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি পেশী-কোষও পরস্পর থেকে বিভিন্ন।

একইভাবে আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উভয়েরই মানবিক গুরুত্ব সমান হলেও কার্যকারিতার দিক থেকে উভয়েই ভিন্নধর্মী। বলতে গেলে উভয়েই পরস্পরবিরোধী বা অন্য কথায় পরস্পরের পরিপূরক। ঠিক নেগেটিভ এবং পজেটিভের মতো। বিদ্যুতের জগতে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি, যদি নেগেটিভ ও পজেটিভ উভয়েই সমভাবে কাজ না করে, তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এ পার্থক্য সত্ত্বেও গঠন প্রক্রিয়ার দিক থেকে উভয়ে একই ধাতুর তৈরি। এটাই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিরহস্য। তিনি প্রতিটি বস্তুকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি জিনিসই পরস্পর দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ।

ইতোপূর্বেকার আলোচনায় আমরা নারী ও পুরুষের মানবিক মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন গুণাবলির দিকেও ইঙ্গিত করেছি। যার সারমর্ম হলো পুরুষ শান্তি ও স্বস্তির ব্যবস্থা করে এবং তার মাধ্যমে নারী শান্তি ও স্বস্তি অর্জন করে। এ সম্পর্কে আমরা পবিত্র কুরআনের ভাষ্যও পেশ করেছি। তাতে নারী ও পুরুষের শান্তি ও স্বস্তি অর্জনের ব্যাপারে উভয়ের আধ্যাত্মিক গুরুত্বও স্পষ্ট হয়েছে।

এ পর্যন্তকার আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানুষের দুটি দিক আছে। একটি বাহ্যিক আর অন্যটি অভ্যন্তরীণ এবং এ উভয় ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদা গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উভয়ের অনেক বড় বড় গঠনতান্ত্রিক ব্যবধান রয়েছে। যেমন নারীর নারীসুভল বিশেষ গঠন কাঠামো রয়েছে যার কারণে পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য এবং এ পার্থক্যের কারণেই নারী সন্তান উৎপাদন ও তার লালন-পালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ সেসব গুণাবলি থেকে বঞ্চিত। কিন্তু পুরুষের আলাদা যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা নারীর নেই। এতে করে নারী ও পুরুষের মধ্যকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কিন্তু এ পার্থক্য বা বৈপরীত্য ও স্বাতন্ত্র্য মানবতার বংশবিস্তারের জন্য একান্তই নির্ভরশীল। বৈদ্যুতিক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা প্রতিনিয়তই এ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করতে পারি। নেগেটিভ ও পজিটিভ তারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কিন্তু এ পার্থক্যই হচ্ছে তাদের সমমিলনের ভিত্তি। যদি তা না হতো তাহলে বিদ্যুৎ নামের কোন অস্তিত্ব দুনিয়ার বুকে কখনো পরিলক্ষিত হতো না।

কুরআনের পরিভাষায় একেই বলা হয় 'বিবাহবিধি'। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

"এবং প্রতিটি জিনিসকেই আমি জোড়া জোড়া বানিয়েছি।"

বস্তুত, এ জন্যেই এটা করা হয়েছে যাতে উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকে নিজের নির্ধারিত সীমায় অবস্থান করে এবং এভাবে তারা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় পর্যায়ে মানবজাতির জন্যে অধিকতর কল্যাণকর প্রমাণিত হয়।

বিবাহবিধি

বিবাহবিধির ইতিবাচকতা : মানব সমাজে নারী ও পুরুষের মান তাদের সব সামঞ্জস্য সত্ত্বেও ইতি ও নেতিবাচকতায় বিভক্ত। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ গুণবৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর উদ্দেশ্য হলো উভয়ে নিজের আসল লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হওয়া। এজন্যে এ পার্থক্যটা প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়; বরং বৃহত্তম উদ্দেশ্য অর্জনেরই একটি উপায় এবং উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এ উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে।

এ বিবাহবিধির প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন–
"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই সত্তা থেকে স্ত্রীদের বানিয়েছেন যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি অর্জন কর এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন।"
(সূরা রুম : আয়াত-২১)

এখানে তোমাদের শান্তি বা তৃপ্তির অর্থ আবেগ-প্রবণ অথবা যৌন তৃপ্তি নয়, যেমন কোন কোন লোক মনে করে তাকে, আসলে এর অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শান্তি বা মানসিক প্রশান্তি। ইমাম রাযী এ শান্তি প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এটা আন্তরিকতার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ আধ্যাত্মিক অথবা আন্তরিক শান্তি প্রকাশ্য হয় না বরং অদৃশ্য হয়। এটি মানুষের আত্মার সাথে সম্পৃক্ত।

যা হোক, কুরআনের উল্লিখিত আয়াতে শান্তির অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শান্তি, যার অন্বেষণ পুরুষ মাত্রই করে থাকে এবং বিয়ের অর্থ আধ্যাত্মিক বিয়ে এবং অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, নারী ও পুরুষ উভয়ে মানুষ হিসেবে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের মধ্যেকার যে পার্থক্য রয়েছে তা মানবতার জন্য অত্যন্ত উপকারী।

এতে করে বিয়ের উদ্দেশ্যে আরও স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এটা যথার্থভাবে জানা যায় যে, বিয়ের অর্থ শুধু দুটি দেহের মিলন নয়; বরং দুটি আত্মার মিলন। আর আত্মার সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগের মাধ্যম হিসেবে দৈহিক সম্পর্কের প্রয়োজন হয়। মূলত আধ্যাত্মিক মিলনটাই মুখ্য এবং দৈহিক মিলনটা গৌণ।

বিবাহ বিধির উপকারিতা

এ পুরো আলোচনার বিষয়বস্তুর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে 'বিবাহবিধির উপকারিতা।' পৃথিবীর যে কোন কাজকর্ম তা আধ্যাত্মিক হোক বা বস্তুগত– একটি নির্ধারিত উদ্দেশ্যের অধীনেই করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে 'বিবাহ বিধির উপকারিতা' সম্পর্কে বলেছেন– "যেন তোমরা শান্তি অর্জন কর এবং তোমাদের মধ্যে দয়া ও ভালোবাসার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।" অর্থাৎ যখন দুই দেহের মিলন হয় তখন বংশবিস্তার ঘটে। আর যখন দুই আত্মার মিলন হয় তখন তার ফলশ্রুতিতে শান্তি, ভালোবাসা এবং দয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

অতএব আমরা প্রত্যক্ষ করি যে– মানবতার যে বীজ মানব অস্তিত্বেই সুপ্ত থাকে, তাতে আত্মসজীবতা অর্জনের এবং সাফল্য লাভের কোন ক্ষমতা থাকে না তাকে বিবাহবিধিই শক্তিসঞ্চার করে এবং তার ক্রমবৃদ্ধির সুযোগ সরবরাহ করে। এমনকি এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে সেই বীজ একটি বৃক্ষের রূপ ধারণ করে একদিন তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। এরই ফুল ফলের মিষ্টি সৌরভে মুগ্ধ উদ্বেলিত হয়ে উঠে মানবতার মনমেজাজ।

যদি কোনো দুর্ভাগা মানুষের জীবনে এ ফুল আর ফল দেখা না দিয়ে থাকে, যদি সে তার মিষ্টি ঘ্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি মানবাত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে কোনোদিনই পরিচয় লাভ করতে পারবে না। তার অস্তিত্ব মানবিকতার মহোত্তম উপলব্ধি থেকে আজীবন বঞ্চিত থেকে যাবে। ফলে সে মহাপ্রকৃতির এমন এক নির্জীব ধুলোর মতো পড়ে থাকে যার না আছে কোনো উদ্দেশ্য আর না আছে কোন মর্যাদা। এভাবে কোন সমাজ যদি এ মানবিকতার অভ্যন্তরীণ গুণাবলি সম্পর্কে অজ্ঞাত ও অপরিচিত হয়ে থাকে, যদি তার মান-মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনবহিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই সমাজকে গুণবৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকারী মৌলিক উপাদান থেকেই বঞ্চিত বলেই মনে করতে হবে।

ইমাম রাযীর দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেকার প্রেম-প্রীতি ও মানবিকতার অনুভূতি হচ্ছে তাদের আধ্যাত্মিক সংযোগেরই প্রত্যক্ষ ফলাফল। তাঁর মতে এসব মহৎ ও পবিত্র অনুভূতি যৌন সম্পর্কের ফলশ্রুতি হতেই পারে না। বস্তুত: এটা একটা প্রাকৃতিক বিধি, যা আল্লাহর আদেশে প্রতিটি মানুষের মনে ঢেলে দেয়া হয়েছে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন অনন্য অনবদ্য প্রীতি-ভালোবাসার সৃষ্টি হয় যা অন্য কারো সাথে হয় না। তা সে যতই আপন হোকনা কেন। আসলে এটা হচ্ছে আল্লাহরই বিশেষ দান–যা তিনি স্বামী-স্ত্রীকে দান করে থাকেন।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী 'তাফসীরে কবীরে' আরও লিখেছেন– "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে দয়া-মায়া, ভালোবাসা ও একের জন্যে অন্যের প্রতি যে ত্যাগ-তিতিক্ষার আবেগ অনুভূতি পরিলক্ষিত হয় তা অন্য কোন আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে হয় না। এসব আবেগ অনুভূতি নিছক যৌন সম্পর্কের ফলাফল নয়। কারণ যৌন প্রবণতা তো যৌবন ঢলে পড়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার আবেগ-অনুভূতি বয়সের সাথে সাথে আরও বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতা লাভ করে। এটা এ জন্যেই হয় কারণ তা আল্লাহরই দান। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তি কেবল যৌন সম্পর্কই হতো তাহলে উভয়ের জীবন চরম তিক্ততা ও বিরক্তিতে ভরে যেত এবং তালাকের মাত্রা অধিকতর হতো। সুতরাং বলতেই হবে যে, ভালোবাসার এ আবেগ আল্লাহর পক্ষ থেকেই দান করা হয়। কেবল ভাবনা-চিন্তাকারী জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এ প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারেন। এ বাস্তবতাকেই আরো স্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ বলেছেন–

"নিঃসন্দেহে, চিন্তাভাবনাকারীদের জন্য এতে বিরাট নিদর্শনাবলি রয়েছে।"

(কুরআন)

ইমাম রাযীর উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর মতেও স্ত্রীর ভালোবাসার আবেগ অনুভূতি যৌন তৃপ্তির ফলাফল নয়। তিনি পরিষ্কারভাবে এটাকে আল্লাহরই রহমতের বিশেষ অবদান বলে ঘোষণা করেন। এতে বোঝা গেল যে, তাঁর কাছেও দাম্পত্যের অর্থ হলো আধ্যাত্মিক দাম্পত্য। এটা হচ্ছে মহাপ্রকৃতির স্রষ্টারই প্রবর্তিত বিধি যা সরাসরি মানবাত্মার সাথে সম্পৃক্ত। এ স্রষ্টা প্রদত্ত বিধিই আত্মাকে করে সজীব এবং তার মধ্যে প্রেম-প্রীতি, দয়া ও মহানুভবতার সৃষ্টি করে। জড়বাদিতার এ সংসারে এ বিধির যথার্থ নামকরণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

এটা এমন এক মহান পর্যায়, যেখানে পৌঁছানোর জন্যে আমাদের বিবেক ও বুদ্ধিকে আরো উদার ও প্রশস্ততার করতে হবে। তাছাড়া এর ব্যাপকতা ও গভীরতার অনুমান করা আমাদের পক্ষে মুশকিল হবে এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সীমার সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থেকে কেবল যৌন তৃপ্তি ও দৈহিক আনন্দ অর্জন পর্যন্তই সীমিত থেকে যাবে। এজন্য আল্লাহ আমাদের চিন্তাভাবনাকে গভীরতর ও ব্যাপকতর করার উপদেশ দিয়েছেন।

সুতরাং এ বাস্তবতা সম্পর্কে যথাযথ অবগতি অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি এবং আমাদের দাম্পত্য জীবনে সেই সভ্য সচেতনতাকে জাগ্রত করে, সেসব উপায় খুঁজে বের করতে হবে যাতে করে আমাদের মধ্যে সত্যিকার প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ও ত্যাগ তিতিক্ষার আবেগ সৃষ্টি হয়। আমরা যেন নিছক

যৌন সম্ভোগ আর দৈহিক আনন্দের সংকীর্ণ সীমানায় সীমিত না থাকি : বরং আমারা যেন একে অন্যের অন্তরের গভীরে প্রকাশ করি, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য ইত্যাদির পক্ষে বা বিপক্ষে যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যাতে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আধ্যাত্মিক ও দৈহিকভাবে আমরা পরস্পরের কতটুকু নিকটে আছি এবং আল্লাহ্ আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আমরা তার কতটুকু পালন করছি।

শুধু বিয়ে করে অথবা নিজের পারিবারিক অঙ্গনকে হাসি-খুশিতে ভরে দিলেই আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব পালনের কাজ শেষ হয়ে যায় না। স্বামী-স্ত্রীর উভয়কে এটা জেনে নিতে হবে যে তাদের প্রীতি-ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের বুনিয়াদ কী? তারা যদি একথা অনুভব করে থাকে যে, এ ভালোবাসার সম্পর্ক মানবিক বাসনা, রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও উন্নত মানবিক মূল্যবোধের পরিণতি– তাহলে তাদের জানা উচিত যে, এটাই সেই স্বাভাবিক সম্পর্ক যাকে আল্লাহর কুরআনে ভালোবাসা ও দয়া নাম দেয়া হয়েছে, এ সম্পর্ক নিঃসন্দেহে কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে। কিন্তু এছাড়া সম্পর্কের বুনিয়াদ যদি অন্যকিছু হয় তাহলে জেনে রাখতে হবে যে, এ সম্পর্ক আর এ ভালোবাসা কোনদিনই কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে না। কেন হবে না– তার কারণ নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব।

মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধি

মা ও সন্তানের মধ্যেকার প্রীতি-স্নেহের সম্পর্ক মানুষের প্রকৃতিগত। বস্তুগত বা বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এর কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব। এটাও সম্পূর্ণভাবে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার। সন্তান হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের আধ্যাত্মিক ফসল, এজন্যেই এ সম্পর্ক আধ্যাত্মিকতার ওপর ভিত্তিশীল। দুনিয়াতে এমন কোন মানদণ্ড নেই যার মাধ্যমে মা ও সন্তানের মধ্যকার প্রীতি পূর্ণ সম্পর্ককে ওজন করা যায়। আমরা কেবল এতটুকুই বলতে পারি যে, এসব এমন এক প্রাকৃতিক বিধানের অধীনে হচ্ছে যার উদ্দেশ্যে মানুষ তার আসল লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। আর যেহেতু এ সম্পর্কের মূল হচ্ছে হৃদয় তাই আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হৃদয়ের উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন।

এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

"ওদের কাছে হৃদয় আছে, কিন্তু তারা ভাবনা চিন্তা করে না।"

(সূরা আরাফ : আয়াত-১৭৯)

–"তিনিই যিনি মু'মিনদের হৃদয়ে স্বস্তি নাযিল করেছেন।" (সূরা ফাতাহ : আয়াত-৪)

–"শীঘ্রই আমি কুফরকারীদের হৃদয়ে ভীতির সৃষ্টি করব।"(সূরা আনফাল : আয়াত-১২)

–"এরপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। অতঃপর এটা পাথরের মতো হয়ে যায়।" (সূরা বাকারা : আয়াত-৭৪)

–"এরপর তাদের দেহ ও তাদের হৃদয় কোমল হয়ে আল্লাহর যিকিরের দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠে।" (সূরা যুমার : আয়াত-২৩)

– "ওসব (আগের পরের) পথভ্রষ্টদের হৃদয় একই রকম।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১১৮)

–"এবং আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ের কথা জানেন এবং তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।" (সূরা আহযাব : আয়াত-৫১)

হৃদয় বলতে সাধারণ অর্থে মানুষের বক্ষতলের হৃদপিণ্ডকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের হৃদয়ের অর্থ কোন বিশেষ অঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়নি বরং কুরআনের দৃষ্টিতে তার অর্থ মানব প্রকৃতির সেই বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হচ্ছে যার মাধ্যমে মানুষ মানুষের মধ্যে খোদাপ্রেম-খোদাভীতি এবং তার সান্নিধ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। এ হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক বাস্তবতা যার প্রভাব আমরা অনুভব করতে পারি। কিন্তু তার আসল অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা পূর্ণ অবগত অর্জন করতে পারি না, কারণ এর সম্পর্ক মানুষের আভ্যন্তরীণ আত্মার সাথে সম্পর্কিত। যেমন প্রিয়নবী বলেছেন–

"মানুষের হৃদয় খোদার অঙ্গুলির মাঝখানে রয়েছে। (আহমদ)

আল্লাহর কুরআনেও একই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে–

"জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝখানে রয়েছেন।"

(সূরা আনফাল : আয়াত-২৪)

এ হচ্ছে বাস্তবতা তার বিধিবিধান যা মানুষের বিবেকে ক্রিয়াশীল থাকে, আর এ উদাহরণের মাধ্যমেই আমরা বিবাহবিধি এবং মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধি বুঝতে পারি।

এভাবে মাতৃত্ব বলতে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব আর দুধ খাওয়ানোকেই শুধু বোঝাতে না বরং মাতৃত্বের স্থান আরো ওপরে, ঠিক আধ্যাত্মিক পর্যায়ের। মা কেবল গর্ভধারণ আর লালন-পালন করেন না বরং তাঁর সন্তানকে চারিত্রিক গুণাবলিতেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। আর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তার সন্তানকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করে। এ সত্যিকারের মানুষই বিশ্বমানবতার মঙ্গল ও কল্যাণের পথ সুগম করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন–

"এবং তিনি আল্লাহই যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের সত্তা থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং সেসব স্ত্রীদের থেকে পুত্র ও পৌত্রাদি তোমদের দান করেন এবং ভালো ভালো খাদ্যদ্রব্য তোমাদের দান করেন।" (সূরা নহল : আয়াত-৭২)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

"তোমাদের প্রতিপালক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা কারো ইবাদত করবে না কিন্তু শুধু তাঁর। মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর। যদি তোমাদের কাছে তাদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়জন থাকেন তাহলে তাদের 'উহ' পর্যন্ত বলবে না, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলবে না, বরং তাদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করবে এবং নম্রতা ও দয়ার সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে এবং দোয়া করবে যে, "(হে) প্রভু! এঁদের প্রতি রহমত কর, যেভাবে তাঁরা রহমত ও স্নেহের সাথে আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।"

(বনি ইসরাঈল-২৩, ২৪)

এ পবিত্র আয়াতে খোদাতা'আলা মাতা-পিতার আনুগত্য, তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার এবং তাঁদের সেবার যত দিক ও পর্যায়ে থাকতে পারে তার সব দিকেই ইঙ্গিত করেছেন এবং তিনি এ সব কিছুতেই নিজ ইবাদতের দিকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। মনীষী ফখরুদ্দিন রাযী বলেন, "মাতা-পিতার আনুগত্য এবং আল্লাহর ইবাদতের দিকে এ তীব্র তাগিদের আসল কারণ হচ্ছে মানব সৃষ্টির আসল কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হচ্ছে পিতা-মাতা। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তাঁকেই সম্মানদান এবং তাঁরই ইবাদত করার হুকুম দিয়েছেন এবং এরপরই মাতাপিতার প্রতি সম্মান দেখাতে বলেছেন। এতে করে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় পিতা-মাতার আনুগত্য করা বস্তুত আল্লাহর ইবাদতেরই এক পবিত্রতম অঙ্গ।

যেমন, পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে বলা হয়েছে–

"এবং বাস্তব কথা এই যে, আমরা মানুষকে নিজ মাতা-পিতার অধিকার জেনে রাখার জন্যে নিজেই তাগিদ করেছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে। (এজন্য আমরা তাকে উপদেশ দিয়েছি যে) আমার শোকর আদায় কর এবং নিজ পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

উপরের আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ মানুষকে মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার উপদেশ দিয়েছেন। এমনকি মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা

প্রকাশকে আল্লাহর শোকর আদায়ের সাথে সমান গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এভাবে মাতাপিতার সেবাও ইবাদাতের মান পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা একটি বিশেষ দিকনির্দেশ এ দিয়েছেন যে, মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে আনুগত্যের খোদায়ী পদ্ধতি। এর মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে মাতা-পিতার সেবার দায়িত্ব পালিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন– "আল্লাহ তাআলা, তাঁর ছাড়া অন্য কারো উপাসনাকে নিষিদ্ধ করেছেন, কিন্তু সেবার অনুমতি দিয়েছেন। সেবা হচ্ছে উপাসনার পরবর্তী স্থান। এ থেকে দেখা যায় যে, সেবা কেবল বৈধই নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরিও। যেমন মাতা-পিতার সেবা করা ওয়াজিব বা জরুরি।"

মোটকথা, সেবাপরায়ণতা এমন এক গুণ যা সন্তানের মনে মাতা-পিতার আনুগত্যের আবেগ সৃষ্টি করে। এ অনুভূতিতে উদ্বেলিত হয়ে সন্তান মাতা-পিতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। এভাবে মাতা-পিতার খেদমতের মাধ্যমেও সন্তান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের সেবাপরায়ণতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান সকল মানুষের মনে সৃষ্টি করে রেখেছেন। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিধি। সন্তান ও মাতা-পিতার মধ্যেকার এ সম্পর্ক আধ্যাত্মিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে অনুপ্রেরিত হয়ে মাতা-পিতা সন্তানদের লালন-পালন করেন এবং সেই একই আধ্যাত্মিক অনুভূতির তাগিদে সন্তানও পিতা-মাতার সেবা ও সম্মান করে।

এ আধ্যাত্মিক বা নৈতিক অনুভূতি আল্লাহই মানুষের মনে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যে আদিকাল থেকেই মাতা-পিতার সেবা ও সম্মান করা সমগ্র মানবতার কাছে অন্যতম স্বাভাবিক মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সভ্য অসভ্য সব জাতির সব মানুষই এ একটি ব্যাপারে একই অনুভূতি পোষণ করে। এতে জানা যায় যে, এ অনুভূতিটি মানব প্রকৃতিতেই শামিল থাকে।

এ যে স্বভাবগত অনভূতিতে সব মানুষই উদ্বেলিত, তার গোড়ায় পানি সেচ করেন কে? .... তিনিই হচ্ছেন মা। মা-ই তাঁর স্বাভাবিক মমতাগুণে বাধ্য হয়ে গর্ভধারণ, প্রসব, দুধ খাওয়ানো এবং তাকে লালন-পালন করে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করার জন্যে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেন। অবুঝ অবস্থায় একটি শিশুকে বুদ্ধিমান ও সক্ষম মানুষে পরিণত করার পেছনে একটি মায়ের কত যে সাধনা, ধৈর্য, পরিশ্রম ও সংকল্পের দুস্তর দিগন্ত অতিক্রম করে আসতে হয় তা কেবল মায়েরাই জানেন। আল্লাহই মায়ের অন্তরে এ ধৈর্য, সাধনা, পরিশ্রম ও সংকল্পের মনোভাব জাগিয়ে দেন এবং মায়েদের দুঃখ-কষ্ট আর ধৈর্যসাপেক্ষ দীর্ঘ সংগ্রামের গুরুত্বের স্বীকৃতি ও মর্যাদাও দেন তিনিই।

পবিত্র কুরআনের আয়াতে এ বাস্তবতাই যথার্থভাবে চিত্রিত হয়েছে। যখন আল্লাহ বলেছেন–

“এবং বাস্তব কথা এই যে, আমরা মানুষকে নিজ মাতা-পিতার অধিকার জেনে রাখার জন্যে নিজেই তাগিদ করেছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে। (এজন্য আমরা তাকে উপদেশ দিয়েছি যে) আমার শোকর আদায় কর এবং নিজ পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।”

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধির উপকারিতা

মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধির উপকারিতার মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, মানুষের মধ্যে আনুগত্য ও সেবাপরায়ণতার গুণ। এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা তার উপকারিতা ও প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারি যা মানবজীবনে পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্তান ও পিতা-মাতার মধ্যেকার স্নেহ-ভক্তির সম্পর্ক এবং সেবা ও আনুগত্যের সনাতন ঐতিহ্য অবক্ষয়মান দেখা যাচ্ছে। এখানে আমরা এ অভিশপ্ত পরিণতির কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমরা শুধু এ নিয়েই আলোচনা করবো যে, যদি আজকের মানবতা প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সেবা আনুগত্যের বৃহত্তম আবেগ অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে তাহলে মানুষ হিসেবে তারা গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে।

এ মানুষরাই যখন অতি সামান্য এক মাংসপিণ্ডের মতো অসহায় ও গুরুত্বহীন ছিল তখন মাতা-পিতা কিভাবে তাদের সাথে দয়া-নম্রতা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাদের অতি সামান্য দুঃখ-কষ্টেও তাঁরা অস্থির বিচলিত হয়ে উঠেছেন এবং নিজেরা শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে হলেও তাদেরকে সঠিকভাবে সুখে ও নিরাপদে রাখার পূর্ণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আজ সেই মাংসপিণ্ডের মতো অক্ষম অসহায় শিশুরা যখন সক্ষম সবলতা অর্জন করে বড় হয়েছে তখন পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবার দায়িত্বকে উপেক্ষা করে দারুণ অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে।

এখন অকৃতজ্ঞ মানুষ আজ মাতা-পিতার খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজনকে পর্যন্ত অস্বীকার করছে। বস্তুত এ ধরনের অকৃতজ্ঞ মানুষকে মানুষ বলাই ভুল। এরা বিবেকহীন হয়ে নিজেদেরকে শয়তানের অনুসারীতে পরিণত করেছে। আমরা দেখতে পাই যে, মাতা-পিতার অবাধ্যতাসহ সবরকমের নোংরামী এবং নৈতিক

ও চারিত্রিক অধঃপতন সত্ত্বেও এমন অনেক জাতি ও দেশ রয়েছে যারা বৈষয়িক দিক থেকে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি, আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে এবং যাদের মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার বা নিঃস্বার্থ সেবার কোন আবেগ উদ্দীপনা থাকে না– তারা বাহ্যিক যতই উন্নতি করুক না কেন, মানুষ হিসেবে কি তাদের কোনো গুরুত্ব আছে? নির্জীব জীবন্ত লাশের মতো এসব যান্ত্রিক লোকগুলোর কি আছে কোনো মান-মর্যাদা? যে সমাজে টাকাটাই আসল কথা, সেখানে স্বার্থপরতাই ব্যক্তির মৌলিক গুণ; যেখানে মানুষ অন্য মানুষের অধিকার আর মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, সেখানে সেই সমাজকে যান্ত্রিক বলা যেতে পারে সত্য কিন্তু মানব সমাজ বলা যেতে পারে না। কারণ সেখানে পবিত্রতা ও মূল্যবোধের কোন স্থান নেই। সত্যিকারের কোন মানুষ এ যান্ত্রিক সমাজে স্বস্তিতে থাকতে পারে না।

আমরা আমাদের যুগ ও সমাজের যতই পর্যালোচনা করি ততই ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় পর্যায়েই ইসলামী শিক্ষার প্রভাব আমাদের সামনে উজ্জ্বল রয়েছে। এ ইসলামের মাধ্যমেই আমরা এ সত্যের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারি যে, মায়ের পদতলেই সন্তানের বেহেশত।

এ থেকে শুধু এটা অনুধাবন করা উচিত হবে না যে, ইসলাম মাতা-পিতার সেবা ও আনুগত্যের উপকারিতা বলতে শুধু তার নৈতিক উপদেশ সম্পর্কিত বিষয়াবলি পর্যন্তই সীমিত রাখে না, বরং তাকে আল্লাহর ইবাদতেরই একটি অংশ হিসেবে দৈনন্দিন জীবনের কাজেকর্মে বাস্তবায়নের আদেশ দেয়।

এতে করে আমরা অনুমান করতে পারি যে, মানব জীবনে ইবাদাতের সীমা কতো ব্যাপক, এ ইবাদাতের সীমায় সব রকমের ন্যায় ও সৎকর্ম শামিল থাকে যা মানুষ মহৎ উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে পালন করে থাকে। এতে করে কর্তা ছাড়া অন্য কারো তেমন কোনো উপকার হয় না। বরং ন্যায়পরায়ণতা ও সৎকর্মের মাধ্যমে কর্তা নিজেই তার সেবা ও মহত্ত্বের মাধ্যমে সমাজে নিজের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে, তার মধ্যে এক নতুন ভদ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, যাবতীয় অর্থহীন ও গুরুত্বহীন তৎপরতা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তার সব কাজকর্ম মূল্য ও মর্যাদার দিক থেকে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে; মোট কথা তার পুরো জীবনটা হয়ে ওঠে অনন্য সুন্দর।

বলাবাহুল্য, মাতা-পিতা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিকতার ওপর নির্ভরশীল। এসব বিধি-বিধান প্রাকৃতিক আইন-বিধির তাবেদারী করে না।

এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আদেশের সাথে সম্পৃক্ত। কর্মেই তাঁর পরিচয়। এদিকে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে ইঙ্গিত করেন। এর আসল তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়। এসব কিছু মানুষের স্বাভাবিক আইন– কানুনের অতীত এবং সার্বজনীন ব্যাপার। মানুষ বস্তুত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে তখনই পূর্ণতা অর্জন করে এবং সত্যিকারের অর্থে মানব জীবন কল্যাণমুখী ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে যখন সে এসব বিধিবিধানের যথার্থ অনুসরণ করে।

কোন সন্দেহ নেই যে, যে সমাজে সততার সমাদর বৃদ্ধি পাবে, যেখানে মানুষ পরস্পরকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসবে, পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা সহানুভূতি প্রকাশ করবে। জনসাধারণের সৎকর্ম ইবাদতের মধ্যে শামিল হবে এবং তাদের পুরো জীবনের ওপর যখন বাস্তব ও অদৃশ্য জগতের আধ্যাত্মিক আলো ছড়িয়ে থাকে– তখন এ ধরনের সমাজ স্বাভাবিকভাবে সব ধরনের নোংরামি ও বেহায়াপনা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, এক একটি সমস্যা সহজেই সমাধান হয়ে যাবে, সমাজের প্রতিটি লোক নিরাপদ, সন্তুষ্ট ও সুখী জীবনের আমেজ অনুভূতি নিয়ে বাঁচবে। আর এটাই সত্যিকারের আদর্শ সমাজ বলে গণ্য হবে।

বিবাহবিধি ও সন্তান সংক্রান্ত বিধি বাস্তবায়নের শর্ত

পাঠকরা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে, আমরা বিবাহবিধি এবং সন্তান সংক্রান্ত বিধির এ দীর্ঘ আলোচনার কোথাও কুরআনী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাইনি। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বর্তমান যুগে এসব বিধিবিধানের বাস্তবায়ন ও তার উপকারিতার কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না কেন? আমরা যে চিত্র তুলে ধরেছি বাস্তবে তার কোনো ছাপ দেখা যায় না কেন? আমাদের কথা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণ কি? এসব প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। অথচ এটাও ঠিক যে, এসব বিধিবিধান থেকে উপকার অর্জনের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার কোথাও উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশ দেখা যায় না। বলুন তো, বীজ বপন না করে কি গাছ এবং তার ফলের আশা করা যায়?

উল্লেখযোগ্য যে, আধ্যাত্মিক বিধিবিধান ও তার ফলাফল দেখানোর জন্যে কিছু শর্ত-শরীয়তের দাবি রাখে। যেভাবে স্বাভাবিক বিধিবিধান ও নিজ কার্যকারিতার জন্যে পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রয়োজন বোধ করে। আমরা আগে যেমন বলেছি এ উভয় ধরনের বিধিবিধান ও আধ্যাত্মিকভাবে গোত্রভুক্ত। এজন্যে এ সবের প্রভাব ও ফলাফল এবং উপকারিতা কয়েকটি বিশেষ অবস্থা ও শর্তের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।

প্রথম শর্ত এই যে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন শরীয়তের শর্ত ও নীতি অনুযায়ী হবে। এরই মাধ্যমে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পবিত্রতার সৃষ্টি হতে পারে। এটা অত্যন্ত

মহৎ চিন্তা যা বিবাহবিধি এবং সন্তান সংক্রান্ত বিধিকে বলিষ্ঠতর করে এবং তাতে কোনো রকমে কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি হতে দেয় না। কেননা, এ উভয় বিধিবিধানের উন্নতির আসল কারণ ব্যক্তির যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহত্ত্বের অনুভূতি এবং এ মহত্ত্বের অনুভূতি যেনা বা ব্যভিচার থেকে কখনো সৃষ্টি হতে পারে না। কেননা, যে কোনো ধরনের যৌন নোংরামী মানুষের বিবেকে নিরাপত্তাবোধ এবং আত্মমর্যাদার কোনো অনুভূতি সৃষ্টি করে না।

সুতরাং যদি কোনো সমাজে যৌন নোংরামীর প্রচলন শুরু হয়ে থাকে এবং সেখানকার জনগণ যদি নোংরামীকে কোনো রকমের আপত্তিকর কিছু মনে না করে তাহলে তার অর্থ এ নয় যে, তাদের বিবেক সেই নোংরামীকে সমর্থন করছে অথবা তাকে কোনো রকমের মানবিক মূল্যবোধ বলে গণ্য করছে। বরং এ ধরনের যৌন নোংরামীকে যে কোন সমাজের লোকই অত্যন্ত ঘৃণা এবং নিকৃষ্ট পর্যায়ের অপরাধ বলে মনে করে। বিবাহবিধির বাস্তবায়নে এবং তার সম্প্রসারণে বিঘ্নতার এ ধরনের পরিস্থিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এতে করে মানুষের যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদার অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যেই আমরা দেখতে পাই ব্যভিচারকারী ও ব্যভিচারকারিণী অর্থাৎ অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারীদের মধ্যে কখনো প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা, সহানুভূতি, দয়া ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদি মহৎ আবেগ অনভূতি সৃষ্টি হয় না, যেমন বৈধ উপায়ে বিয়ের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকারী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়ে থাকে।

বলাবাহুল্য, যেসব বিষয়াবলি বিবাহবিধির পরিপন্থী তা সন্তান-সংক্রান্ত বিধিরও পরিপন্থী। সুতরাং যে সন্তান অবৈধ যৌন সম্পর্ক বা ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে, সেই অবৈধ সন্তানের জন্যে তার মায়ের মনে যথার্থ স্নেহ মমত্বের অনভূতি কখনো সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ, তার মন নিরাপত্তা ও পবিত্রতার অনুভূতি থেকে বঞ্চিত ছিল। ঠিক একইভাবে অবৈধ সন্তানের মনেও ব্যভিচারিণী মায়ের জন্য সেই গভীর ভালোবাসা ও আন্তরিক শ্রদ্ধার মনোভাব জন্মাতে পারে না। অপরদিকে একটি বৈধ সন্তান যেমন তার মাতা-পিতার পূর্ণ স্নেহ ভালোবাসা পায় তেমনি সেও যাথার্থভাবে তার মাতা-পিতাকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে।

অবৈধ মা এবং অবৈধ সন্তানের মধ্যেও যে এক ধরনের স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকতে পারে তা আমরা অস্বীকার করব না। কিন্তু সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন রকমের পবিত্র ভাব বা শ্রদ্ধার অনুভূতি থাকতে পারে না, সে ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আল্লাহ আনুগত্য ও শরীয়তের সীমায় থেকে যে, পবিত্রতা, স্নেহ, ভালোবাসা ও সম্মানবোধ অর্জিত হতে পারে তা অন্য কোনোভাবে অর্জন করা যায় না। মাতৃত্বের পবিত্রতা ও মর্যাদাবোধের ওপরই সন্তান ও

সমাজের পবিত্রতা ও মর্যাদা নির্ভরশীল। সুতরাং যে সমাজে মায়ের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও পবিত্রতা নিশ্চিত নয়, সে সমাজে কোন রকমের মহৎ মানবিক মূল্যবোধের অস্তিত্ব টিকে থাকা সম্ভব নয়।

সততঃ স্মরণযোগ্য যে, মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর পাঠানো জীবনধারণের বিধির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হচ্ছে বিবাহবিধি ও সন্তান সংক্রান্ত বিধির ভিত্তি। সুতরাং যে ব্যক্তির মন-প্রাণ আল্লাহর ভালোবাসা ও তার আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত, তার পক্ষে নিজ সন্তানদের মধ্যে আধ্যাত্মিক গুণাবলি সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে সৎ ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলা একান্তই অসম্ভব ব্যাপার।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখযোগ্য যে, এখানে সমস্যাটির ইতিবাচক দিকটির ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা বলা হয়নি যে, যদি তারা উভয়ে সংশোধন হতে না চায়, তাহলে পৃথক হওয়া উত্তম। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলামের আন্তরিক প্রচেষ্টা, বিশৃঙ্খলা, ঘৃণা ও বিদ্বেষকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বিবেচনা করে।

ইমরানের স্ত্রীর আদর্শকে একটি অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্ক এমনই গভীর ও অকৃত্রিম ছিল যে, তিনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকেও আল্লাহর সেবায় উৎসর্গ করেন। তাঁর সেই গভীর আন্তরিকতার পবিত্রতম ফলশ্রুতি ছিল তার সেই কন্যাসন্তান যিনি পরিণত বয়সে পৌঁছে পুরো বিশ্বমানবতাকে সততা ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন।

পবিত্র কুরআনে ইমরানের স্ত্রীর প্রার্থনাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–
"আমার প্রভু! আমি এ শিশুকে– যা আমার গর্ভস্থ রয়েছে তা তোমাকে উৎসর্গ করছি, যে তোমারই কাজের জন্যে উৎসর্গীকৃত থাকবে। আমার এ প্রস্তাবকে কবুল কর। তুমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩৫)

এভাবে তিনি নিজেই নিজের অধিকার ত্যাগ করেন এবং আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেন এবং আল্লাহও তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন এবং তাকে দুনিয়ার আদর্শ সন্তানের মর্যাদা দান করেন। নিঃসন্দেহে এটা মাতৃত্বের এক অনন্য সুন্দর উদাহরণ। এ আদর্শ সন্তান ছিলেন মরিয়ম (আ)।

তাঁর সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–
"অবশেষে তার প্রতিপালক সেই মেয়েটিকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করেন এবং তাকে অত্যন্ত সতী মেয়ে হিসেবে গড়ে তোলেন।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩৭)

শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর ছেলেকে গোটা দুনিয়াতে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছেন এবং সেই ছেলে অর্থাৎ ঈসা (আ)-কে যেসব গুণাবলি দান করেন সে ব্যাপারে তিনিই বলেন–

“এবং নিজ মায়ের অধিকার আদায়কারী বানিয়েছেন এবং আমাকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও কঠোর বানাননি।” (সূরা মরিয়ম : আয়াত-৩২)

তিনি আরো বলেন–

“এবং আমাকে কল্যাণময় করেছেন– যেখানেই আমি থাকি এবং সালাত ও যাকাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন– যতক্ষণ আমি জীবিত থাকি।”

(সূরা মরিয়ম : আয়াত-৩১)

আমরা জানি ঈসা (আ) আল্লাহর দেয়া গুণাবলিতে সমৃদ্ধ হয়ে ইহুদী জড়বাদী এবং অন্যান্য বাতিল-শক্তির শিবিরে কি প্রচণ্ড প্রকম্পন সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি দুনিয়ার মানুষের সামনে যে নৈতিক শিক্ষা দান করেছেন তা চিরদিন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের মতে এ বিষয়ের স্পষ্টিকরণের জন্যে এ উদাহরণটিই যথেষ্ট ছিল। এরপর অন্য কোনো উদাহরণ পেশ করার আদৌ দরকার নেই।

বিবাহবিধির কার্যকারী উপকার অর্জনের দ্বিতীয় শর্ত হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার মজবুত সম্পর্ক। উভয়ের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ছাড়া যথার্থ দাম্পত্য জীবনের কল্পনা করা যায় না। মানসিক সদ্ভাব ও সম্প্রীতি, পারস্পরিক আস্থা বিশ্বাস এবং মহত্ত্ব ও উদারতা দাম্পত্য সম্পর্কের অনিবার্য দাবি। তারা যে একজন অন্যজনের জন্যে অপরিহার্য এ অনুভূতিও তাদের থাকতে হবে।

আর সেই অনুভূতি অনেকটা এ রকমের হবে যে, স্বামী স্ত্রীকে শান্তি ও স্বস্তির উৎস মনে করবে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে প্রেমিক ও দায়িত্বশীল মনে করবে। স্বামী মনে করবে যে, স্বস্তি ও শান্তির জন্যে স্ত্রী অত্যন্ত প্রয়োজন, আর স্ত্রী এটা মনে রাখবে যে, তার নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সহায়তার জন্যে পুরুষের প্রাধান্য খুবই জরুরি। উভয়ে উভয়কে পরস্পরের পরিপূরক মনে করবে। স্ত্রী কখনো স্বামীর প্রয়োজন থেকে নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। সার্বিকভাবেই তার স্বামীর সহায়তা দরকার। কারণ, প্রকৃতিগতভাবে নারী এক দুর্বল অস্তিত্ব। গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও পালন এবং মাসিক ঋতু প্রভৃতি তার সামনে এক চিরন্তন ও স্বাভাবিক বিড়ম্বনা। এজন্যে সব সময় তার একটি মজবুত অবলম্বনের দরকার। নারীর এ দাবি ও চাহিদা কেবল তার স্বামীর মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে। এজন্যে সে পুরুষের পক্ষ থেকে কোনো রকমের নির্লিপ্ত উদাসীনতা বা অবহেলাকে কখনো সহ্য করতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের এ বুনিয়াদ যদি দুর্বল হয়ে যায়, তাদের পারস্পরিক আস্থা ও প্রতিশ্রুতি যদি ভঙ্গ হয়ে যায়, যদি তাদের আন্তরিক ভালোবাসা ও পবিত্র মহানুভবতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়– তাহলে বুঝতে হবে যে দাম্পত্যের মূল উদ্দেশ্যই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এরপর গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু যৌন সম্ভোগ আর বৈষয়িক স্বার্থের সংকীর্ণতায় সীমিত হয়ে পড়ে। এভাবে তারা মৌলিক মানিবক গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এরপর তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানূভূতি, দয়া, ভালোবাসা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কোনো মহৎ গুণই অবশিষ্ট থাকে না।

এ ধরনের সম্পর্ককে অবশ্য আমরা ব্যভিচারের পর্যায়ভুক্তও করতে পারি না। কারণ ব্যভিচারীদের মধ্যে কোনো রকমের দাম্পত্য সম্পর্ক থাকে না। অপরদিকে স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে কিন্তু ইসলামের নির্ধারিত নীতির প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের কারণে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক অনেকটা নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

বিষয়টিকে উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে বলা যেতে পারে, যেমন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আয় উপার্জন করে এবং দিনভর পরিশ্রম করে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে, তাদের চেষ্টা-সাধনা আর সংগ্রাম শুরু বেশি থেকে বেশি টাকা আয় করে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন পর্যন্ত সীমিত থাকে। ঝকঝকে চকচকে মোটরগাড়ী, প্রাচুর্যময় ঘরবাড়ি আর দামী পোশাক পরিচ্ছদ ও দামী বিলাসিতার সামগ্রী অর্জনই হয় তাদের এতো সব ব্যস্ত-তৎপরতাময় জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে প্রয়োজনবোধে তারা জীবনের বাজী লাগাতেও প্রস্তুত। বলাবাহুল্য, এ ধরনের মানসিকতায় আক্রান্ত স্বামী-স্ত্রীর ঘরে প্রকৃত সুখ-শান্তি, প্রেম-প্রীতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

তাদের জীবন স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে ওঠে এবং তারা এক নির্জীব নিস্পৃহতার শিকারে পরিণত হয়। যেহেতু স্ত্রী স্বামীর মতোই আয়-উপার্জন করে সেহেতু স্বামীর প্রতি তার মনে বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা বা গুরুত্বের ইমেজ অবশিষ্ট থাকে না। স্বামীও নিজেকে স্ত্রীর সামনে বড় অর্থহীন জীব মনে করে। এভাবে তাদের পারিবারিক জীবনে যে গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয় তাতে করে দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের মূল বুনিয়াদটাই ধ্বসে পড়ে, যা তারা বিয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আজকের আধুনিক সমাজে দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্কের যে দারুণ অধঃপতন পরিলক্ষিত হচ্ছে তার কারণ মূলত এটাই।

বস্তুত, পারিবারিক জীবনের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করছে স্ত্রী অর্থাৎ মহিলাদের ওপর। স্ত্রী বা মহিলারাই হচ্ছে পারিবারিক সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতা

অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। এখন যদি সে স্ত্রী বা মহিলারাই তাদের কর্মক্ষেত্রের সীমা ডিঙিয়ে কলকারখানায় বা অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে হেস্ত নেস্ত হতে থাকে তাহলে সারাদিনের অস্বাভাবিক খাটুনির পর তারা ঘরে ফিরে আর কি দায়িত্ব পালন করবে?

পারিবারিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ন রাখার দ্বিতীয় বুনিয়াদ হচ্ছে নারীর উপরে পুরুষের দায়িত্বশীলতা। এখন যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমানভাবে আর্থিক আয় উপার্জন করে অর্থাৎ স্ত্রীও স্বামীর মতো মেহনত মজদুরী করে আয়ের মাধ্যমে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করে তাহলে উপার্জনকারী হিসেবে স্বামীর যে গুরুত্ব ছিল তা বহাল থাকবে কোন যুক্তিতে?

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এখানে আমরা মহিলাদের চাকরি করার বৈধতা বা অবৈধতার প্রশ্ন নিয়ে কোনো আলোচনা করছি না। আমরা এখানে কেবল অবস্থা পরিবেশের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাই তুলে ধরছি যা বিবাহবিধির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হতে পারে এবং সে সব কারণও তুলে ধরছি যার পরিণতিতে বিভিন্ন রকমের দ্বন্দ্ব ও পারিবারিক বিশৃংঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। রইলো নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্যের কথা। তা সে সম্পর্কে বর্তমান পরিস্থিতিতে আলোচনা করারই অবকাশ কোথায়?

এ যে আজকের এসব জটিল সমস্যাবলি, এর জন্য কেবল নারীকেই দায়ী করা চলে না বরং পুরুষরা নারীদের চেয়ে বেশি অপরাধী। পুরুষ তার স্ত্রীর অর্থ উপার্জনের তৎপরতাকে শুধু যে শীতল মনে সহ্য করে তা নয় বরং স্ত্রীর উপার্জনে আর্থিক উন্নতি ঘটেছে বলে আত্মতুষ্টিও অনুভব করে। কিন্তু মামুলি কয়েকটা টাকার জন্যে তার দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি ও স্থিতিশীলতার ভিত্তি ধ্বসে পড়ছে সেদিকে সে দেখেও না দেখার ভান করে এবং বুঝেও না বুঝার ভান করে। আজ পুরুষ যে নারীর শান্তি ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছে সেজন্য পুরুষের বৈষয়িক লালসাই প্রধানতঃ দায়ী। আর এমন লোভী ও স্বার্থপর কাপুরুষরা নারীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে যে অসমর্থ ও অযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই? সে কারণেই আজ দাম্পত্য সম্পর্ক পারিবারিক জীবনে অভিশপ্ত পরিণতি ডেকে আনছে। যে জীবন মহৎ মানবিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত এবং শুধু অর্থ ও স্বার্থের গোলামে পরিণত হয়ে তাদের ভাগ্যে এ পরিণতিই স্বাভাবিক। তারা কোনো দিনই প্রকৃত সুখ-শান্তি, স্বস্তি ও সন্তুষ্টি পেতে পারে না। এরা ধনে-সম্পদে যত উন্নতিই করুক না কেন মানুষে সন্তুষ্টি পাবে না কোন দিন।

নিঃসন্দেহে এসব কারণেই ইসলামের নির্ধারিত বিবাহবিধির সেসব সুফল অর্জিত হচ্ছে না যা অর্জিত হবারই কথা। ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এসব অদূরদর্শী

তৎপরতার কারণেই আজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক এতোটা ঠুনকো ও দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, সামান্য মনোমালিন্যও বিচ্ছেদের কারণ হয়ে পড়ে।

এরপর এতে করে যে মায়ের মমতার ওপর কতো বিরাট প্রতিকূল প্রভাব পড়ে তা সহজেই অনুমান করা চলে যে মহিলা পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে কলে-কারখানায় অফিসে-আদালতে গলদঘর্ম হয় তার স্বাভাবিক অনুভূতি ও মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ধরনের মহিলারা নম্রতা-লজ্জাশীলতা ও নারীসুলভ কোমলতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তারা তখন নিজেদের আয়-উপার্জনের জন্যে গর্বিতা হয়ে পড়ে এবং আরো অধিক উপার্জনের নেশায় মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব নির্জীব-নিঃসাড় হয়ে পড়ে এবং কোনোরকম নৈতিক-চারিত্রিক বা ইসলামী শিক্ষা তাদের আর আকর্ষণ করে না। এরপর তাদের মধ্যে সততা ও পবিত্রতার ভাবমূর্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে– সে তো স্বাভাবিক কথা।

স্মরণ রাখা দরকার যে, কেবল যৌন ক্রিয়ার সক্ষমতার নামই বিয়ে নয় এবং কোনো মহিলা সন্তান উৎপাদন আর তার লালন-পালন করেই মাতৃত্বের মহান মর্যাদা পেতে পারে না। এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে বিয়ের ব্যাপারে ইসলামী আদর্শের নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যার অধীনে একজন পুরুষ ও একটি নারী পরস্পর দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ বন্ধন আসলে একজন নারী ও পুরুষের মধ্যেকার বন্ধন নয়, বরং এটা হচ্ছে দুটি মানুষের মধ্যেকার মিলনসেতু। এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ এতই মহান ও তাৎপর্যময় যে নিছক জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এর মাধ্যমে যে সুফল দেখা দেয় তাকে এক কথায় সদয় ভালোবাসা বলা যায়। মা ও সন্তান-সংক্রান্ত ব্যাপারটিও ঠিক একই পর্যায়ের।

মায়ের মমতার অর্থ শুধু সন্তান প্রসব আর দুধ খাওয়ানোই নয় বরং মায়ের মমতা হচ্ছে একটি নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এ আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে মা তার সন্তানের মধ্যে এমন অনির্বাণ আলোর স্ফুরণ ঘটায় যা গোটা সমাজ তথা বিশ্বমানবতাকে সুপথ দেখায়। ইসলামের শিক্ষা ও উদ্দেশ্যকে এ ব্যাপকপ্রসারী দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝার চেষ্টা করতে হবে। ইসলাম এভাবেই তার পারিবারিক নীতি ও ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবজীবনের সর্বত্র এমন এক সর্বাত্মক বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করতে চায় যা সমাজে প্রচলিত যাবতীয় বৈষয়িক বিড়ম্বনা ও কু-প্রথাকে ঝেঁটিয়ে দূর করে এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও শান্তির বুনিয়াদের ওপর সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আর মূল শক্তি হিসেবে সক্রিয় থাকে তার আধ্যাত্মিক রৌশনি।

উল্লেখিত বাস্তবতার আলোকে এটা আমরা ভালো করেই অনুমান করতে পারি যে, বিবাহ সংক্রান্ত এবং মা ও সন্তান সংক্রান্ত ইসলামিক বিধিবিধানের কার্যকরী

সুফল অর্জিত না হওয়ার কারণ কি? বিবাহ ব্যবস্থা থেকে আধ্যাত্মিকতার বিলুপ্তি ঘটলো কেন? এবং মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও আনুগত্যের সহানুভূতিই বা বিনষ্ট হলো কেন?

বিবাহবিধির কার্যকরী সুফল অর্জনের তৃতীয় শর্ত হলো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং তাদের সম্পর্ক বৈষয়িক স্বার্থপরতার উর্ধ্বে থাকবে। মোট কথা, বিয়ে-শাদীর উদ্দেশ্য এমন এক আধ্যাত্মিক ফল অর্জন করা যা পার্থিব কোনো উপায়ে লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন বলেছি, নিছক সন্তান উৎপাদনই বিয়ের উদ্দেশ্য নয় বরং বিয়ে হচ্ছে এক আধ্যাত্মিক সম্পর্কের নাম যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী পূত-পবিত্র এক বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং আল্লাহর ইবাদতের পর এটির গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি; কেন না, এ বিয়েই মানব সম্পর্কীয় ধারাবাহিকতায় এমন এক সুন্দর অধ্যায়ের সূচনা করে যা মানব অস্তিত্বকে পবিত্র এবং তার বিবেককে করে সজীব সুন্দর। আর এ সম্পর্কের সবচেয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই যে, মানবতাই হচ্ছে মানুষের সম্পদ অর্থাৎ তার আকীদা বিশ্বাস, তার কর্ম, তার নীতি ও চরিত্র যদি ঠিক হয় তাহলে সব কিছুই ঠিক।

এভাবে উভয়ের ভালোবাসা হয় আধ্যাত্মিক ভালোবাসা। যাবতীয় অবিলতা থেকে পবিত্র এ ভালোবাসা তার বিবেক ও আত্মার সাথে সম্পৃক্ত। এ কারণেই স্বামী ও স্ত্রীর জন্যে প্রথম ও প্রধান জরুরি ব্যাপার এ যে তারা পরস্পরকে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করবে এবং এসব ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। এর পরেই তারা উত্তম স্বামী ও স্ত্রী বলে বিবেচিত হবে।

বিবাহবিধি ও সন্তান বিধির সুফল অর্জনের জন্য উপরে বর্ণিত শর্তসমূহের বাস্তবায়নই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি।

উপরে আলোচিত গুণাবলির আলোকে যদি দেখা যায়, তাহলে নবী করীম ﷺ ও উম্মুল মু'মিনীন খদিজাতুল কুবরার মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক গোটা বিশ্বমানবতার জন্যে সবচেয়ে অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত। এ সম্পর্ক ছিল যাবতীয় অর্থ ও শর্তের উর্ধ্বে এক মহৎ আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। উভয়ের মধ্যেকার দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর আর তাঁদের ভালোবাসা ছিল গভীরতর। ভালোবাসার এ মহান আবেগ-অনুভূতি ছিল তাঁদের মহৎ চিন্তাধারা এবং উন্নত চরিত্রের উৎকৃষ্ট ফসল। বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য বা বয়সের ব্যবধান তাঁদের অনবদ্য দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র প্রতিকূলতার সৃষ্টিও করতে পারেনি। যাঁরা প্রিয়নবী ও খাদিজা (রা)-এর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা জানেন যে, নবী করীম ﷺ রিসালাত অর্জনের আগেও তাঁদের সম্পর্ক ছিল মজবুত ও স্থিতিশীল এবং নবী

করীম ﷺ-এর রিসালাত অর্জনের পর এ সম্পর্ক হয় আরো গভীর এবং আরো মধুর। এর অনুমান থেকেও বলা যেতে পারে, যখন প্রথম ওহী পেয়ে নবী করীম ﷺ অত্যন্ত আতঙ্কিত ও বিচলিত হয়ে খাদিজা (রা)-এর কাছে পৌঁছে বললেন যে, "হে খাদিজা! আমি নিজের প্রাণের আশংকা বোধ করছি।"

এমন অবস্থায় অন্য কোনো স্ত্রী হলে স্বামীকে সান্ত্বনা দেয়া তো দূরের কথা, নিজেই ভয়ে কেঁপে উঠতো।

কিন্তু খাদিজা (রা) নবী করীম ﷺ কি বলেন শুনুন–
"কখনো না; আল্লাহ্ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না, কেননা আপনি তো দয়ালু ব্যক্তি। দূর-দূরান্ত থেকে আগত অতিথিদের আপনি আতিথ্য করেন; যারা ক্লান্ত তাদের বোঝা তুলে নেন, দরিদ্রদের জন্যে আয়-উপার্জন করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় লোকদের সাহায্য করেন।"

এভাবে আমরা আরো দেখতে পাই যে, ইসলামী আদর্শ প্রচারের কঠিন মুহূর্তগুলোতে যখন নবী করীম কখনো কখনো চিন্তিত বা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন তখন এ খাদীজা (রা) নবী করীম ﷺ-কে সাহস যোগাতেন এবং সান্তনা দিতেন। এসব কারণেই, খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকালে নবী করীম এতোটা বিচলিত হন যে, ইতিহাসে সেই বছরটি "দুঃখের বছর" হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

নবী করীম ﷺ খাদীজা (রা)-এর মধ্যে যে গভীর ভালোবাসা ছিল তা ছিল অনন্য ও অনবদ্য। নবী করীম ﷺ কখনো খাদীজার স্মৃতি ভুলতে পারেননি। গভীর আন্তরিকতা ও সীমাহীন ভালোবাসার আবেগ সহকারে তিনি খাদীজাকে স্মরণ করতেন। খাদীজার প্রতি নবী করীম এ গভীর ভালোবাসা দেখে তাঁর কোনো কোনো স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করে বলতেন, "কি ভাগ্যবতী সেই স্ত্রী যাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর মহান স্বামী তাঁর প্রশংসা করেন।"

পূর্বের আলোচনায় আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিবাহবিধি এবং মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধিবিধানের বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় মানবিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক শর্ত ও ব্যবস্থাবলির দিকে ইঙ্গিত করেছি– যা এসব ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে এবং এসব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির সম্পর্ককে মজবুত ও স্থিতিশীল করা।

প্রসঙ্গত, আমরা আবার বলব যে, সেই উভয় বিধিবিধানের বাস্তবায়নে যদি বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ না করা হয় তাহলে তা থেকে কখনো কাঙ্ক্ষিত সুফল অর্জিত হবে না। ফলে তা বাগানের সেই ফুলগাছগুলোর মতো হবে যা রোপণের পর মালিকের আর স্পর্শই পায়নি এবং উপযুক্ত দেখাশুনার অভাবে তা শুকিয়ে গেছে।

গাছগুলোকে সজীব ও সতেজ রেখে ফুল উৎপাদনের ন্যূনতম শর্ত ও বিধানগুলো মানা হয়নি বলে– ফুল উৎপাদন তো দূরের কথা– গাছটিকেই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ মনে করুন– ওসব বিধিবিধানকে কার্যকরী করার জন্যে যে জিনিসটির দিকে প্রথম দৃষ্টি রাখতে হবে তা হলো আল্লাহর অধিকার। এরপর সেসব উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ যে সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এটা হচ্ছে উল্লেখিত বিধিবিধান বাস্তবায়নের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি। আর এর নিকৃষ্টতম পদ্ধতি হচ্ছে ব্যভিচার অথবা নারীর এমন চাকরি-বাকরী যাতে সে পর-পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা করতে বাধ্য হয় এবং সন্তানদের লালন পালন এবং স্বামীর সেবাযত্ন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে ছেলেমেয়েদের সম্পর্কও সন্তোষজনকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। পিতা-মাতার জন্যে তাদের মনে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সেই পবিত্র আবেগ অনুভূতিরও সৃষ্টি হয় না যা শরীয়ত সৃষ্টি করাতে চায়।

এসব বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমরা যখন আদর্শ ও দৃষ্টান্তমূলক দাম্পত্য জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে ইসলামী নীতি ও বিধিবিধানের সন্ধান ও পর্যালোচনা করি তখন তার সহজ-সুন্দর ও বাস্তবানুগ শিক্ষার সাথে পরিচিত হয়ে আমরা মুগ্ধচিত্তে আল্লাহর প্রশংসা করতে বাধ্য হই। দেখুন একটি ছোট্ট আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র কত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন–

"তোমাদের নারীরা তোমাদের ক্ষেতের মতো; তোমাদের স্বাধীনতা আছে যেভাবে চাও নিজের ক্ষেতে যাও। কিন্তু নিজের ভবিষ্যতের চিন্তা করো এবং আল্লার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচ। খুব ভালো করে জেনে রেখো যে, একদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। (এবং হে নবী! যারা তোমার হেদায়াত মেনে নিয়েছে) তাদেরকে (কল্যাণ ও সৌভাগ্যের) সংবাদ দিয়ে দাও।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-২২৩)

মায়ের অধিকার

ইসলাম মানুষকে ভালোবাসা, দয়া, আনুগত্য এবং ভদ্রতা ও নম্র ব্যবহার শিখায়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে এসব মহতি গুণের পরিচয় দিতে বলে। ইসলামের সব আদেশ-নিষেধ ও ব্যবস্থায় এবং সবরকমের পরামর্শ ও উপদেশে মানুষকে এসব মহতি গুণাবলি অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে। মা, মায়ের মহত্ত্ব, মায়ের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা কোনো কোনো জায়গায় স্বতন্ত্রভাবে, আবার কোনো কোনো জায়গায় মাতা-পিতার কথা একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সব জায়গাতেই মাতা-পিতার প্রতি অকৃত্রিম, স্থায়ী ও শর্তহীন ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ভক্তি ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মাতা-পিতার মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশি এবং মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও ভালোবাসার এ অনুভূতি সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে ইসলামের উদ্দেশ্য, বিশেষ করে প্রতিটি সন্তানের মনে এ পবিত্র ও মহৎ অনুভূতির স্থায়ী প্রকাশ ইসলাম দেখতে চায়। কারণ এ পৃথিবীতে সন্তানের অস্তিত্ব আসলে মাতা-পিতারই মহান অবদান। এখানে সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্যে পিতার শ্রম-সাধনা ও ত্যাগ তিতিক্ষা আর মায়ের স্নেহ মমতা ও দয়ার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার অবকাশ আমাদের নেই। মাতাও পিতার এসব স্নেহ-দয়ার কথা বাদ দিলেও সন্তানের অস্তিত্বটাই মাতা-পিতার পক্ষ থেকে এমন এক অবদান যার সত্যতা অস্বীকার করার সাধ্য কারো থাকতে পারে না।

মানুষের ঠুনকো অস্তিত্বটা আসলে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নয়। এসব খাওয়া-পরার আয়োজন, ফ্যাশন, বিলাসিতা সব কিছুই একান্ত অর্থহীন ব্যাপার। মানুষের মানবিক মূল্য ও গুরুত্ব তখনই হবে যখন সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তার চারপাশের পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলিকে দেখে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তার আদেশের সামনে মাথা নত করে দেবে। এ বিশেষ জ্ঞান ও উপলব্ধিই মানুষকে অন্যান্য জীব ও প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী করে। মানুষ এ আসল জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে মহাপ্রকৃতির পর্যবেক্ষণ করে, চিন্তা ভাবনা করে এবং শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে।

এরই মাধ্যমে সে পায় আত্মার সজীবতা। এ পর্যায়ে পৌঁছেই মানুষ পৃথিবীর সবরকম দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি অর্জন করে এবং এ পৃথিবীর জীবনেই সে জান্নাতের সুখ-শান্তি পবিত্রতা ও কল্যাণময়তার অধিকারী হয়ে ওঠে। জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মে এ মঞ্জিলে পৌঁছে মানুষ তার অমরত্ব অর্জন করে। এমতাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের মোকাবিলায় দুনিয়ার শক্তি ও সম্পদকে তার কাছে একান্ত তুচ্ছ মনে হয়। এ হচ্ছে সেই পরম কাম্য আধ্যাত্মিক মান যা একজন সত্যিকারের মু'মিন আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জন করে থাকে।

আর যে ব্যক্তি এ মহান নেয়ামতের একটি সামান্যতম অংশও পেয়ে যায় তাহলে জীবনকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত মনে করতে হবে। আর এ যে সৌভাগ্য মানুষ অর্জন করার সুযোগ পায় তার জন্যে সে প্রকৃতপক্ষে মাতা-পিতার কাছেই ঋণী থাকে। মাতা-পিতার মাধ্যমেই তো সে এ জীবন এবং জীবনের পরম স্বার্থকতা অর্জন করে থাকে। এ জন্যেই আল্লাহ মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার, তাঁদের সেবা করার এবং তাঁদের অনুগত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন–
"হে নবী! তাদের বল যে, 'এস, আমি তোমাদের শোনাবো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর কী বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর।"।
(সূরা আনআম : আয়াত-১৫১)

আরেকটি আয়াত হচ্ছে–
"এবং তোমরা সবাই আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং মাতা পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩৬)

শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি শোকর আদায়ের সাথে সাথে মাতা-পিতার শোকর আদায় করারও নির্দেশ দিচ্ছেন–

"এবং এটা সত্য কথা যে, আমরা মানুষকে নিজ মাতা-পিতার অধিকার জানার জন্যে নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা কষ্টের ওপর কষ্ট স্বীকার করে তাকে নিজের পেটে রেখেছে এবং দু বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে (এ জন্যেই আমরা তাকে উপদেশ দিয়েছি যে) আমার শোকর কর এবং নিজ মাতা-পিতার শোকর আদায় কর। আমার দিকেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।"
(সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

উপরের আয়াতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা করলে দুটি বাস্তবতা স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়–

এক. এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মাতা-পিতার সম্মান করার নির্দেশ দেয়া এবং তাও আল্লাহর পরস্পরই মাতা-পিতার সম্মান করার আদেশ এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মাতা-পিতা উভয়ই একই রকম মান মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত।

দুই. এই যে, তাঁদের শ্রদ্ধা করা, তাঁদের সেবায় সদাপ্রস্তুত থাকা এবং তাঁদের ব্যাপারকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং তাঁদের নিষেধকে শিগগীরই পালন করা প্রত্যেক সন্তানের জন্য ফরজ। (অবশ্য তাঁরা যদি ইসলাম বিরোধী কোনো হুকুম দেন তাহলে তা মানা সন্তানের জন্যে বৈধ নয়।)

উপরে বর্ণিত দুটি অধিকারের ক্ষেত্রে মা এবং বাবা উভয়ের স্থান সমান। এ ক্ষেত্রে উভয়েই সমান মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী। তবে দুটি স্থান এমন রয়েছে যেখানে মা স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারিণী।

প্রথম স্থান

গর্ভধারণ ও দুধ খাওয়ানো এমন দুটি স্বতন্ত্র দায়িত্ব যা কেবল মায়ের ওপরই বর্তায়। পবিত্র কুরআনেও মায়ের এ দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুটি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মাকে যে কতো দুঃখ কষ্ট ও ধৈর্য সাধনার পরীক্ষা দিতে হয় তা সবারই জানা কথা। এ জন্যে মায়ের স্বতন্ত্র মর্যাদা ও অধিকার খুবই যুক্তিসঙ্গত।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন–

"তার মা কষ্টের পর কষ্ট করে তাকে পেটে ধারণ করেছে" এর অর্থ হচ্ছে এ যে, আল্লাহর নির্ধারিত কলাকৌশল অনুযায়ী মা সন্তানের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য মাধ্যমে পরিণত হয়। আর "দু-বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে" এর অর্থ হলো, মা কেবল তার অস্তিত্বের মাধ্যমেই হয়নি বরং তার কারণে তার জীবনরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানও হয়েছে। আর এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে মা অত্যন্ত উচ্চতর ও বিশিষ্ট মর্যাদা পেয়েছে সুতরাং মায়ের সেবা আল্লাহর ইবাদতের মতো হয়ে যায়। এ জন্যেই নবী করীম ﷺ মায়ের সেবাকে ইবাদতেরই অন্যতম রূপ বলে বর্ণনা করেছেন। (সর্বসম্মত)

এভাবে মায়ের অবদান শুধু জন্মদান পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং তার চেয়ে এগিয়ে মা সন্তানের লালন-পালন এবং নিরপত্তার নিশ্চয়তা বিধানও করেন। এজন্যে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকা খুবই স্বাভাবিক, যার উল্লেখ আমরা ইমাম রাযীর কথায় পেয়েছি।

দ্বিতীয় স্থান

তার দ্বিতীয় মর্যাদা এই যে, সন্তান সংক্রান্ত বিধির বাস্তবায়ন তার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে আমরা শুধু এতটুকু বলব যে, এটি একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার নাম যা কেবল মায়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। এরই মাধ্যমে আল্লাহ সন্তানের স্বভাবে সেই গুণাবলির সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সে মাতা-পিতার অধিকার জানতে পারে এবং তার মনে মাতা-পিতার জন্যে শ্রদ্ধার অনুভূতি ও চেতনা জাগে।

মনে করুন ভবিষ্যতে কোনো সময় যদি প্রজনন বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা পুরুষের শুক্রাণু এবং নারীর ডিম্বানুর সংমিশ্রণে কৃত্রিম উপায়ে কিছু তৈরি করতে সক্ষমও হয়ে যায় তাহলে তা দেখতে শুনতে জীবন্তের মতো দেখালেও প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক সত্তার সৃষ্টি করতে ব্যর্থ থাকবে। কোনো শিশু এ স্তর

মায়ের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। এজন্যে মানবশিশুকে মায়ের পেট থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করে আসাটা একটি প্রাকৃতিক শর্ত। এছাড়া মানব শিশুর মধ্যে সেই মানবিক গুণবলির বিকাশ কখনো হবে না যার উল্লেখ কুরআনে করা হয়েছে।

মায়ের আর একটি বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা হচ্ছে– তিনি সন্তানের মধ্যে বিবেচনা ও অনুভূতি শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে থাকেন। এটা আল্লাহর এক অনন্য দান এই কারণেও মায়ের মর্যাদা পিতার তুলনায় অনেক বেশি।

সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তানের ওপর মায়ের অধিকার পিতার তুলনায় তিনগুণ বেশি। এর প্রমাণ হিসেবে আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের সেই সহীহ হাদীসটি উল্লেখযোগ্য যাতে বলা হয়েছে–

"এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সাথে অবস্থানকারীদের মধ্যে কে আমাদের উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি উপযুক্ত?" নবী করীম ﷺ বললেন, "তোমাদের মা।" লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল। নবী করীম ﷺ আবার একই জবাব দিলেন, "তোমাদের মা।" এরপর লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল। নবী করীম ﷺ বললেন– "তোমাদের পিতা।"

এজন্যে হাদীস মুহাদ্দিসগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, বাপের তুলনায় মায়ের অধিকার তিনগুণ বেশি।

উল্লেখ যে, আমরা এখানে মায়ের সেসব অধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করছি না যা আদায় করা প্রত্যেক সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। যেমন মায়ের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, তাঁর ব্যয়ভার বহন করা, সেবা করা ইত্যাদি। এ ব্যাপারে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে আমরা মায়ের বিশেষ মর্যাদা ও অধিকারেরই কথাই বলছি। নয়তো মায়ের সম্মান এবং মর্যাদা যে কতো বেশি তা নবী করীম ﷺ-এর হাদীস থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়–

একবার এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ দরবারে এসে বলল– হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাই, কিন্তু আমি তার উপযুক্ত নই। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? লোকটি জবাবে বলল– হ্যাঁ, আমার মা জীবিত আছেন।" নবী করীম ﷺ বললেন, "যাও, অকৃত্রিম আন্তরিকতার সাথে মায়ের খেদমত কর। যদি তুমি এমন কর তাহলে তুমি হজ্ব, ওমরা এবং জিহাদ তিনটির পুণ্য পাবে।" (তাবরানী)

এরই সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো একটি হাদীস ইবনে মাজা, নাসাঈ এবং হাফেজ প্রামাণ্য দলীলের সাথে বর্ণনা করেছেন–

এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসে বলল "হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে অংশ নিতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করতে উপস্থিত হয়েছি। প্রিয়নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মা কি বর্তমানে আছেন?" লোকটি জবাব দিল– হ্যাঁ!" নবী করীম ﷺ বললেন, "তাঁর সাথেই থাক এবং তাঁর সেবা কর, কেননা জান্নাত তাঁর চরণতলেই রয়েছে।" (হাদীস)

নবী করীম ﷺ-এর এসব বাণীর মাধ্যমে মায়ের উচ্চতর মর্যাদার কথা প্রমাণিত হয়। এভাবে ইসলাম মায়ের মর্যাদা ও সেবায় মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও মায়ের এমন উচ্চতর মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পর্দা

উপস্থাপনা : পর্দা শব্দটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলমানদের জন্যেই অপরিচিত এবং অস্পষ্টবোধক ছিল। অবস্থা ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পর্দার বিভিন্ন অর্থ বের করা হয়। সুতরাং অনেক লোক বিভ্রান্তিবশতঃ পর্দার অর্থ বলতে নারীকে অন্ধকার ঘরে বসিয়ে রাখাকে বুঝিয়েছে, যেখান থেকে নারী যেন কোথাও আসতে বা যেতে না পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, বিয়ের পর মেয়েরা শুধু নিজের পিতৃগৃহ ছাড়া আর কোথাও যাতায়াত করতে পারত না এবং স্বামীর গৃহ থেকেই শেষবারের মতো তার জানাযায় বের হতো। এটাকে তারা তাদের পারিবারিক আভিজাত্যের প্রতীক মনে করত এবং এটা ছিল তাদের কাছে বিশেষ প্রশংসনীয় বিষয়। এ ধরনের বিদঘুটে অবস্থায় নারী যদি কোনো মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়তো তাহলে এমনকি ডাক্তারকেও দেখার অনুমতি দেয়া হতো না। কেবল মেয়ের পিতা, ভাই এবং শ্বশুর তাকে দেখার সুযোগ পেতো। এছাড়া রুগিনীকে কেউ দেখতেও পেত না, তা কেউ ডাক্তার হোক বা কোনো নিকটাত্মীয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ কড়াকড়ি কিছুটা কম ছিল। সেক্ষেত্রে মেয়ে নিকটাত্মীয়দের বাড়ি যাতায়াত করতে পারত। তবে এ আসা যাওয়ার অনুমতি ছিল শুধু রাতের বেলায় কারণ তখন তার ওপর পর-পুরুষের দৃষ্টি পড়ার আশঙ্কা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। আর ধনী পরিবারের মেয়েরা পালকি বা পশুচালিত যানবাহনে যাতায়াত করত। কিন্তু এসব পালকি ও যানবাহনের দরজা জানালা

খুব ভালো করে বন্ধ রাখা হতো। যদি দরজা জানালা না থাকতো তাহলে পুরো পালকি বা বাহনটিকে কাপড় দিয়ে মুড়ে দেয়া হতো।

যাহোক, পদব্রজে হোক বা যানবাহনে উভয় অবস্থাতেই নারীকে কড়া পর্দার বিশেষ ব্যবস্থা মেনে চলেতে হতো। কাপড়ের ওপর আরো কাপড় ঢেকে তার পুরো অস্তিত্বটাকে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হতো যে, আপাদমস্তক শরীরের সবকিছুই পুরু পর্দার অন্তরালে হারিয়ে যেতো এবং পর্দাটা এতই লম্বা হতো যে, তার একটি অংশ মাটিতেই লুটোপুটি খেতো। এ কঠোর পর্দা ব্যবস্থা আজও কোথা কোথাও পরিলক্ষিত হয়। পর্দার এ স্ব-প্রবর্তিত ব্যবস্থা শহরে ও গ্রামের ধনী ও অভিজাত লোকদের একটি ফ্যাশনে পরিণত ছিল।

সুতরাং বিখ্যাত আধুনিকতাবাদী কাসেম আমীন বেগের মতো লোকেরা যখন নারী স্বাধীনতার পতাকা তোলেন তখন সমাজে পরিচালিত এ ধরনের কঠোর পর্দা ব্যবস্থারই সামলোচনা করে একে ইসলাম শরীয়তের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেন এবং এও বলেন যে, এটা ইসলামের নির্দেশিত মানবিক সাম্যের বিরোধী, কারণ এতে করে নারীর ব্যক্তিত্ব খর্ব করা হয়। এসব যুক্তি বুনিয়াদের ওপর তাঁরা চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী সমাজকে নিজেদের পক্ষে দলভুক্ত করেন।

উম্মুল মু'মিনীনদের পর্দা

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, পুরো কুরআন মাজীদে পর্দা সম্পর্কে একটিমাত্র আয়াত রয়েছে। আর এ আয়াত উম্মুল মু'মিনীন অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর পটভূমিতে রয়েছে সেই বিখ্যাত ঘটনা যা মুফাসসীরগণ তাঁদের তাফসীর গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করেছেন।

কুরআনের পর্দা সংক্রান্ত সেই আয়াতটি হচ্ছে–

'হে ঈমাদানগণ! নবীর গৃহসমূহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না, খাবার সময়ও উঁকি দিও না। তবে হ্যাঁ, তোমাদেরকে যদি খেতে ডাকা হয় তাহলে অবশ্যই আসবে। যখন খাবার খেয়ে নেবে তখন চলে যাবে। কথাবার্তায় লেগে থেক না। তোমাদের এ সব ব্যবহার নবীকে দুঃখ দেয় কিন্তু তিনি লজ্জার কারণে কিছু বলেন না, আর আল্লাহ সত্যকথা বলতে লজ্জা করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চেয়ে নিও। এটা তোমাদের এবং তাদের মনের পবিত্রতার জন্যে উত্তমপন্থা। তোমাদের জন্যে এটা কখনো বৈধ নয় যে, আল্লাহর রাসূলকে দুঃখ দেবে এবং তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করাও বৈধ নয়। এটা আল্লাহর কাছে বিরাট পাপ। তোমরা কোনো কথা প্রকাশ কর বা গোপন কর– আল্লাহ সব কথাই জানেন।"

(সূরা আহযাব : আয়াত-৫৩)

এ আয়াতকেই পর্দার আয়াত বলা হয়। এ আয়াত অবতরণের অনেক আগেই শুধু ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ অনুধাবনের আলোকেই এবং আল্লাহর ওহীর সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই উমর (রা) উম্মুল মু'মিনীনদের পর্দার প্রয়োজনীতা অনুভব করেন। সুতরাং উমর (রা) একাধিকবার নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করেন যে, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন যে, তাঁরা যেন পর্দা করেন।" কিন্তু যেহেতু আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি স্বাধীন ছিলেন না, তাই তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করেন। বোখারী ও মুসলিমে আনাস বিন মালেকের বর্ণনা রয়েছে।

তাতে রয়েছ, উমর (রা) নবী করীম ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন–
"হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার কাছে ভালোমন্দ সব রকমের লোক আসে। হয়তো ভালো হবে, যদি আপনি আপনার পবিত্র স্ত্রীদের পর্দা করার আদেশ দিয়ে দেন। 'সুতরাং এ পর্দার আয়াত নাযিল হয় এবং এর অবতরণ সেই প্রাতঃকালে হয় যেদিন নবী করীম ﷺ যয়নব বিনতে যায়েদকে বিয়ে করেন।

শুধু তাই নয়। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী উমর (রা)-এর অভিমত ছিল– এ পর্দা সে রকমের হবে যে, কেউ যেমন তাঁদের গৃহে যাবে না তেমনি তাঁরা নিজেরাও ঘর থেকে বের হবেন না। এমনকি কেউ যেন তাঁদের দেখতে না পায়।

হাদীসের বর্ণনায় আরো একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তা হচ্ছে উম্মুল মু'মিনীন সাওদাহ্ বিনতে জাময়া (রা) এক রাতে নিজের কোনো প্রয়োজনে পর্দা সহকারে বাইরে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে উমরের দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ে।

যেহেতু তিনি দীর্ঘাকৃতির ছিলেন এজন্যে উমর তাঁকে চিনেন এবং বলেন; "খোদার শপথ হে সাওদা (রা)! আপনি আমাদের দৃষ্টি থেকে লুকোতে পারেন না। দেখেই চেনা যায়, সুতরাং আপনি বাইরে বের হবেন না।"

একথা শুনে সাওদা (রা) নবী করীম ﷺ কাছে উপস্থিত হন এবং পুরো ঘটনা খুলে বলেন, নবী করীম ﷺ তখন আয়েশার গৃহে নৈশভোজ গ্রহণ করছিলেন।

একথা শুনে নবী করীম এলহামী অবস্থায় পড়েন এবং বলেন–
"তোমাদের জন্যে এ অনুভূতি রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের প্রয়োজনে বাইরে বের হতে পারবে।"

(এ ঘটনা, ইমাম বুখারীর সহীহ হাদীস এবং তাফসীরের বিভিন্ন গ্রন্থে যেমন তাবারী, ইবনে কাসীর এবং কুরতুবীতে দেখা যেতে পারে। প্রামাণ্য দলিলের জন্যে ওসব গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করুন।)

হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল বারীতে লিখেছেন–
"পর্দার আয়াত অবতরণের পর উমর (রা)-এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন যে, পর্দাবৃতা কোনো মহিলার ব্যক্তিত্ব যেন চেনা না যেতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেন। তাঁকে এ ধরনের বাড়াবাড়ি করতে বারণ করে দেয়া হয় এবং উম্মুল মু'মিনদেরকে নিজেদের প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয় যেন তাঁরা কোন অসুবিধায় না পড়েন।"

উপরের বিস্তারিত বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উম্মুল মু'মিনদের জন্যে যে ধরনের পর্দা ফরয করা হয়েছিল তা তাদের মুখমণ্ডল এবং হাতের পর্দা ছিল। তা তাঁদের পর্দাবৃত ব্যক্তিত্বের পর্দা ছিল না।

বিখ্যাত ফকীহ্ কাজী আয়াম এ প্রসঙ্গে বলেন–
"এ ব্যাপারে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই যে, উম্মুল মু'মিনীদের ওপর যে ধরনের পর্দা করা ফরয করা হয়েছিল তাতে মুখমণ্ডল ও হাত শামিল রয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রেও এসব খোলা রাখার অনুমতি ছিল না– তা স্বাস্থ্যের ব্যাপারই হোক বা অন্য কিছু।"

একই দেখাদেখি অভিজাত মহলের মহিলারাও নিজেদের জন্যেও সেই ধরনের পর্দা বেছে নেন যা আল্লাহ উম্মুল মু'মিনীনদের জন্যে পছন্দ করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শুধু উত্তম ব্যবহার অনুসরণ করা। অতএব, নবী করীম ﷺ-এর আমল থেকেই তার অনুসরণ চলছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে পর্দার ব্যাপারে আরো অতিরিক্ত বিধিনিষেধ ও বাড়াবাড়ির সমন্বয় ঘটে– যেমন আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। এভাবে পর্দার নামে কঠোর প্রথা সমাজে প্রচলিত হতে শুরু করে এবং এক শ্রেণির লোক এটাকে তাদের পারিবারিক আভিজাত্যের অংশে পরিণত করে নেয়। এভাবে তারা পর্দার ইসলামী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকেই খর্ব করে। তাদের পর্দাটা ইসলামী না হয়ে একটা প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়ে গেছে। (সুতরাং কেউ বিয়ের পয়গাম দিয়েও নিজের হবু স্ত্রীকে দেখার অনুমতি পায় না। অথচ শরীয়তে তার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু শরীয়তের বিধানের দিকে তাদের দৃষ্টি কি থাকবে তারা তো সামাজিক প্রচলন নিয়েই বেশি মাথা ঘামায়।)

মুসলিম নারীর পর্দা

পর্দা মুসলিম নারীর সেই স্বতন্ত্র ভুষণ যা ইসলাম তার জন্যে নির্ধারণ করেছে। ইসলাম পর্দার মাধ্যমে অন্ধকার যুগের অশ্লীলতা ও দেহপ্রদর্শনী প্রথার মূলোচ্ছেদ করেছে এবং পর্দাহীন সমাজে সৃষ্ট যাবতীয় বেহায়াপনা ও যৌন অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করে দেয়ার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

এখানে ইসলামের মহৎ উদ্দেশ্য প্রমাণিত করার জন্যে এবং ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব কার্যকরী করার জন্যে অন্ধকার যুগের কিছু ঘটনার উল্লেখ নারী জাতিকে কি দারুণ বিপর্যয় ও দূরবস্থা থেকে রক্ষা করেছে। এতে করে সে সব লোকদের মুখোশও উন্মোচিত হয়ে পড়ত যাঁরা নারীকে কেবল পাশবিক উল্লাসের সম্বল বলে মনে করে। কিন্তু সেসব ঘৃণ্য-জঘন্য-যৌন নোংরামীর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের পবিত্র মনকে তমসাচ্ছন্ন করতে চাই না।

তবে অন্ধকার যুগের সামাজিক পরিবেশের একটা চিত্র তুলে ধরার জন্যে পবিত্র কুরআনে যে সব প্রয়োজনীয় আয়াত বর্ণিত হয়েছে তা অধ্যয়ন করার পরামর্শ আমরা অবশ্যই দেবো। পবিত্র কুরআনের এসব আয়াতে অন্ধকার যুগের বিভিন্ন বদ-অভ্যাসে, কুসংস্কার ও অশ্লীলতার নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত নোংরামীর জন্যে তাদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে। সাথে সাথে এমন সব আইনবিধিও প্রণয়ন করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন করে ঐসব অপরাধ প্রবণতা, নোংরামী ও অশ্লীলতা থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে।

এসব আয়াত অধ্যয়ন করলে বুঝা যাবে যে, অন্ধকার যুগে নারীর অবস্থা কত বেদনাদায়ক ছিল এবং ইসলাম কিভাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। এর আগে নারী ছিল শোষিতা, নিপীড়িতা, নির্যাতিতা। ইসলাম নারীকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে অবনতির অতল তল থেকে উন্নতি ও মর্যাদার উচ্চতম পর্যায়ে এনে আসন দিয়েছে। ইসলাম নারীকে শিক্ষাদীক্ষায় ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমনকি আধ্যাত্মিকভাবেও উচ্চতর মর্যাদা দান করেছে। আগে যেখানে নারীকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতেও সবাই অপ্রস্তুত ছিল, সেখানে ইসলামই শুধু তাকে পূর্ণ মানুষ বলে ঘোষণা করেছে এবং তাকে সেবা করা ও শ্রদ্ধা করাকে আল্লাহ ইবাদাতের সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছে।

নিচে আমরা ইসলামের এমন কিছু বিশেষ মূলনীতির উল্লেখ করব যা সামগ্রিক ও মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোনো সমাজের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হবে।

১. সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলামই নারী ও পুরুষের মধ্যে যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ইসলামের সব বিধি-বিধানে নারী-পুরুষ উভয়কে একই গুরুত্ব দিয়ে সম্বোধন করা হয়েছে।

কুরআনে একদিকে যেমন বলা হয়েছে যে-

"হে নবী! মু'মিন নারীদের বলুন যে, তারা নিজেদের দৃষ্টি নিচে রাখবে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে।"

সেখানে সাথে সাথে এও বলা হয়েছে যে-

"হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলুন যে, তারা নিজেদের দৃষ্টি নিচে রাখবে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে।"

বলাবাহুল্য, পবিত্র কুরআনে নারী-পুরুষ উভয়কে একই বিষয়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে আহ্বান জানানো হয়েছে।

২. ইসলাম, মন মগজের পরিচ্ছন্নতা, মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং সামাজিক পরিবেশকে অশ্লীলতা ও অপরাধ প্রবণতা যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করতে চায়। কারণ যাবতীয় পাপ, অপরাধ ও নোংরামীর উৎস মানুষের মন্দ কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে ইসলাম নারী ও পুরুষকে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না। কারণ নারী ও পুরুষ উভয়ই সমাজের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুতরাং পবিত্র কুরআনে উভয়ের সংশোধনেই আইন জারী হয়েছে, যেমন আল্লাহ বলেছেন-

"নবীর স্ত্রীদের নিকট থেকে কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল হতে চাও। তোমাদের ও তাঁদের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এটাই উত্তমপন্থা।"

(সূরা আহযাব : আয়াত-৫৩)

এ আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, নারী ও পুরুষ উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ের পরিশোধন করা। সুতরাং আয়াতের পরবর্তী বাক্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামের আসল উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয়কে সবরকমের কলুষতা থেকে মুক্ত রাখা এবং হৃদয়কে পূতঃপবিত্র করে তোলা।

ইমাম এ কুরআনী বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন-

"... এর অর্থ এ যে, চোখের মাধ্যমে পাপের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং দৃষ্টির উল্লেখ বিশেষভাবে এজন্যে করা হয়েছে যে, হৃদয়ের আবেগকে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে

চোখ অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। পুরুষ হোক বা নারী– উভয়ই অতি সহজে ও অতি শিগগীর দৃষ্টির তীরে বিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, মানুষ সব সময় নিচের দিকে দৃষ্টি রাখবে– উপরে তাকাবেই না! না তা নয়। যদি তাই হতো তাহলে এটা ভীষণ কষ্টকর হতো, কারণ মানুষ সমাজে থাকে, তাকে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে হয়। এখন যদি সব সময় নিচের দিকেই চেয়ে হাঁটতে হয় তাহলে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। তাই ইসলামের এ কথা যে "নিচের দিকে দৃষ্টি রেখো" তার আসল অর্থ হচ্ছে মনকে সেসব চিন্তা ও বাসনা থেকে মুক্ত রাখ যাতে মন কলুষ ভাবনায় জড়িয়ে পড়তে পারে।

পবিত্র কুরআন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে এ শিক্ষা দেয় যে তারা যেন তাদের মন-মেজাজকে ভ্রান্ত বিষয়াবলিতে জড়িত না করে এমন সব কল্যাণমূলক কাজে মনোযোগ দেয় যাতে সমাজের উপকার ও উন্নতি হয়। তারা যেন এমন সব বিষয়াবলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে যাতে জীবনের উন্নত ও মহত্তম মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়, যেন নিজেকে নিজে চিনতে ও জানতে পারে। এসব বিষয় মানুষের সাহস ও উদ্যম বাড়ায়, চিন্তাকে সুদূর প্রসারী করে এবং হীন ও তুচ্ছ তৎপরতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

এসব আবেগ অনুভূতি নিয়ে ব্যক্তি যখন তার পরিবেশের দিকে তাকায় তখন তার মনে সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করে। এরপর সে তুচ্ছ ব্যাপারে আকর্ষণ বোধ করে না। যেমন হঠাৎ কোনো সুন্দরী রূপসী নারীর দিকে চোখ পড়লেও তার সে দিকে কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, সে তার দৃষ্টি ও চিন্তাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয় এবং সে দেখামাত্রই তার দৃষ্টিকে অন্যত্র ফিরিয়ে নেয়। একই অবস্থা একজন মু'মিনা নারীও।

৩. তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলাম মানুষকে সৎ, পুতঃপবিত্র, নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন করে গড়ে তোলে। অন্ধকার যুগে নরনারী যেমন অসংখ্য ধরনের পাপাচার, কুপ্রথা ও কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল তেমনি নৈতিক ও চারিত্রিকভাবেও তারা ছিল অধঃপতিত। সেই সমাজের নারী পুরুষ অবাধে অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত থাকত।

অন্ধকার যুগের অনেক কুপ্রথার মধ্যে একটি ছিল নারীদের সৌন্দর্য ও দেহপ্রদর্শনীর প্রথা। তারা পথ চলতে গিয়ে রূপের প্রদর্শনী করত। তারা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে লোকদের ব্যাভিচারের জন্য আহ্বান জানাত।

ইসলাম অন্ধকার যুগের এ কুপ্রথা ও অশ্লীলতাকে উচ্ছেদ করে ঘোষণা করে যে–

"বর্বর যুগের রূপচর্চা ও দেহপ্রদর্শনী করে ঘোরাফেরা করো না।"

(সূরা আহযাব, আয়াত-৪)

অর্থাৎ তাদের আদেশ দেয়া হলো যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যেভাবে তোমরা রূপচর্চা ও দেহ প্রদর্শনীর যেসব নীতি অবলম্বন করতে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দাও। প্রথমত, বের হতেই যদি হয় তাহলে এভাবে বের হবে যেন মর্যাদা ও শালীনতা বজায় থাকে। আর তার উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেদের ওপর চাদর ঢেকে পর্দা কর যেন মনে হয় যে তোমরা পুতঃপবিত্র এবং সম্ভ্রান্ত মহিলা।

যেমন আল্লাহ বলেছেন–
"হে নবী! নিজের স্ত্রীদের ও মেয়েদের এবং মুসলমান নারীদের বলে দাও যে, 'তারা যেন নিজেদের ওপর চাদরের ঘোমটা টেনে দেয়।' এ ব্যবস্থায় একথা অধিকতর গ্রহণযোগ্য যে, তাদের চিনে নেয়া যাবে এবং তাদের বিরক্ত করা হবে না।" (সূরা আহযাব : আয়াত-৫৯)

উল্লেখ্য যে, চাদর এবং ঘোমটা টানার অর্থ হলো, নারীর সব গোপন অঙ্গ তাতে ঢাকা পড়ে যাবে। এ ব্যাপারে ইবনে কাসীর ইকরামার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে– এর অর্থ হচ্ছে এমন চাদর যা তার মাথা, চুল এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঢেকে দেয়।

অন্ধকার যুগে আরেক নোংরামীর উল্লেখ করে ইবনে কাসীর বলেন–
"রাত্রিবেলা শহরের গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা বিভিন্নস্থানে ওঁৎ পেতে বসে থাকত এবং গমন করা নারীদের উত্যক্ত করত। কিন্তু কোনো মহিলা যদি পর্দায় থাকত তাহলে তাকে কোনো রকমের বিরক্ত না করে নিরাপদে চলে যেতে দিত।"

উক্ত আয়াতের পর এ নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এতে অসৎ লোকদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয় যে, তারা যদি তাদের মন্দ কার্যকলাপ পরিত্যাগ না করে তাহলে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

আল্লাহ বলেন–
"যদি মুনাফি করা এবং সেসব লোকেরা যাদের মনে অসৎ প্রবণতা রয়েছে এবং তারা যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে তারা নিজেদের কার্যকলাপ থেকে যদি বিরত না হয় তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তোমাদের দাঁড় করিয়ে দিব, এর পর তারা এ শহরে খুব সংখ্যকই তোমাদের সাথে অবস্থান করতে পারবে। তাদের ওপর সব দিক থেকে অভিশাপ বর্ষিত হবে, যেখানেই যাবে তাদের পাকড়াও করা হবে এবং শোচনীয়ভাবে মারা পড়বে।

(সূরা আহযাব : আয়াত ৬০-৬১)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উভয় শ্রেণীর অপরাধের মান একই রকম বর্ণনা করেছেন এবং তাদের জন্যে একই রকম শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। সাধারণত নারীদের সাথে খারাপ আচরণকারীদের অপরাধ রাজনৈতিক চক্রান্তকারীদের অপরাধের তুলনায় কিছুটা হাল্কা মনে করা হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে উভয়

ধরনের অপরাধ একই শাস্তির আওতায় পড়ে এবং দুটি অপরাধই সমানভাবে ঘৃণিত। এক ধরনের লোক রাজনৈতিক বিশৃংখলার মাধ্যমে দেশ ও সরকারের ক্ষতি করলে অন্য ধরনের লোকেরা তার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের গোড়ায় কুঠারাঘাত হানে।

এভাবে ইসলাম পুরো বিশ্বমানবতাকে অসৎ ও অশ্লীল কার্যকলাপের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। ইসলাম মানবতাকে শরীয়তের আইন রক্ষার অনুযায়ী পরিচালিত হবার আহ্বান জানায় যা নারীর শালীনতা ও সম্মান রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। ইসলাম সমাজকে অসৎ প্রকৃতির লোকদের তৎপরতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে অত্যন্ত বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এভাবে পুরো মানবতাপূর্ণ মর্যাদা ও পবিত্রতার সাথে নিরাপদে বাঁচার অধিকার পাবে।

৪. আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষকে সেই স্বাভাবিক বিধির নিরিখে সৃষ্টি করেছেন তারা যেন তারই আলোকে জীবন-যাপন করে। অর্থাৎ পুরুষ তার নির্ধারিত কর্মক্ষেত্র ও সীমালংঘন করবে না এবং নারীও তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র ও সীমা লংঘন করবে না। পুরুষের জন্যে নারীর বেশ ধরার এবং নারীর জন্যে তার স্বাভাবিক বেশ ছেড়ে পুরুষের বেশ ধরার কোনো বৈধতা ইসলাম দেয় না। পুরুষ ঠিক পুরুষের মতো থাকবে আর নারী ঠিক নারীসুলভ স্বাভাবিকতা নিয়ে থাকবে। কেউ কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ করবে না।

সহীহ হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি হাদীস এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন— "আল্লাহর রাসূল ﷺ নারীর বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন।" (হাদীস)

অন্য একটি হাদীসে আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন—

"আল্লাহর রাসূল, নারীদের মতো পোশাক পরিধানকারী পুরুষদের ওপর এবং পুরুষদের মতো পোশাক পরিধানকারিণী নারীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন।"

নারী ও পুরুষদের বেশধারণকারীদের ব্যাপারে অধিকাংশ লোকই বিরূপ মত পোষণ করে থাকে। এ ধরনের নর-নারীকে সবাই ঘৃণা করে। কেননা এতে করে একদিকে যেমন নারী ও পুরুষ উভয়ের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা খর্ব হয় তেমনি তাতে করে যৌন উত্তেজনাও সৃষ্টি হয়ে থাকে যা দর্শকমাত্রকেই উত্তেজিত করে। এ জন্যে যে কোনো রুচিবান ভদ্রলোক নারী পুরুষের ছদ্মবেশকে ঘৃণার চোখে দেখেন। ইসলাম যে এটাকে ঘৃণার চোখে দেখে তার আরো একটি কারণ আছে। তা হচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যকার প্রকৃতিগত বৈপরিত্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা। কারণ আল্লাহ প্রতিটি প্রাণি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

কেন যে তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন তা আমাদের বুঝে না আসলেও এর পেছনে যে আল্লাহর মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তাছাড়া নর-নারীর সৃষ্টি মহা প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল এবং তারা পরস্পরের কাছে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। এখন নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের বেশভূষা অবলম্বন করার মাধ্যমে শুধু যে তাদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা খর্ব হয় তাই নয়, আসলে এতে করে প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধাচরণও করা হয়। যার ফলে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘনের বিরাট অপরাধ হয়। এ দিক থেকে তা ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় ব্যাপার।

স্মরণে রাখা দরকার যে, মানবতা হচ্ছে এক ব্যাপকভিত্তিক আইন বিধির নাম, মানবতার অর্থ হচ্ছে এক সর্বব্যাপী বিধিবিধানেরই বাস্তব রূপ। এখন যদি কেউ মানুষ হয়ে মানবিক আইনবিধি লংঘন করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে নিজেই তার স্বাভাবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ করছে। আসলে এমন ব্যক্তি তার বিবেক-বুদ্ধির অসাড়তাই প্রমাণ করে– তার মানবিক জ্ঞানশক্তি যে লোপ পেয়েছে তা সে নিজেই তার কণ্ঠের মাধ্যমে প্রকাশ করে। এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব জীবনের আসল পথ থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই তাদের জন্মগত স্বভাবের পথে পরিচালিত করতে চায় এবং তাদেরকে সত্যিকার অর্থ খুঁজে বের করার আহ্বান জানায়। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রতিটি নর ও নারীকে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনুধাবনের জন্যে উৎসাহিত করে। পুরুষের বেশধারী নারী এবং নারীর বেশধারী পুরুষদের মনস্তত্ব পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তারা জীবনের সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে রেহাই পেতে চায়– যা নর বা নারী হিসেবে তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে। দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে পলায়নপরতার এ প্রবণতাই স্বাভাবিক আইনের বাস্তবায়নকে ব্যাহত করে। একটি সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গঠন ও তার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট অন্তরায়। বলাবাহুল্য, ইসলাম এ ধরনের যাবতীয় ক্ষতিকর প্রবণতা ও কার্যকলাপের সব উপায় ও মাধ্যমের বিলুপ্তি সাধনে বদ্ধপরিকর যা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে।

৫. ইসলামের বিবেচনায় নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘরবাড়ি। এটা নারীর স্বভাব-প্রকৃতির সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং এর সাথে বিদ্রোহ করার অর্থ হচ্ছে তার নিজের স্বভাব ও প্রকৃতির সাথেই বিদ্রোহ করা। নর বা নারী যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিজ নিজ স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোটা সমাজ সঠিকভাবে উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করবে।

নারীর স্বভাবের দাবি হচ্ছে সে ঘরবাড়ির সীমানায় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। এর ব্যতিক্রম করলে অর্থাৎ তার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করলে এর পরিণতি

হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এ জন্যেই আল্লাহ নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী, মেয়ে এবং মুসলিম নারীদেরকে নিজেদের মান-মর্যাদার সাথে ঘরবাড়িতে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ নিজেদের ঘড়বাড়িতে শান্তি ও সম্মানের সাথে অবস্থান করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন কর। বস্তুতঃ এটাই তোমাদের স্বভাব সম্মত পন্থা। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ক্ষতি অনিবার্য।

কোনো অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া পরপুরুষের সামনাসামনি হওয়া কোনোক্রমেই উচিত নয়। আর অপরিহার্য প্রয়োজনের কোনো সীমা কুরআন নির্ধারণ করেনি। এ ব্যাপারে বিবেচনার ভার মানুষের বিবেকের ওপরই বর্তাবে। কারণ বিবেকই উত্তম বিচারক।

এভাবে নারী তার অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং কোনো দ্বীনি প্রয়োজনেও বাইরে বের হতে পারে। যেমন সাওদাহ (রা)-এর ঘটনা আমরা উল্লেখ করেছি। প্রয়োজনীয় ব্যাপারে নবী করীম ﷺ নারীদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর তার তাফসীরে আরো বিস্তারিত প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন–

"আত্মমর্যাদার সাথে নারীদের নিজ নিজ গৃহে অবস্থানের।"

অর্থ হচ্ছে নিজেদের গৃহেই অবস্থান কর এবং কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যেও না। আর দ্বীনি প্রয়োজনের মধ্যে নামাযের জন্যে মসজিদে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত।

যদি কোনো প্রয়োজনে বা ঘটনাচক্রে পরপুরুষের সামনে যেতে হয় তবুও কোনো সমস্যা নেই যদি পরপুরুষের সাথে সাক্ষাতের সময় শরীয়তের সে সব আদেশ নিষেধ ও শর্ত সমূহের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কিত কিছু নিয়মনীতি আমরা এখানে তুলে ধরছি।

উম্মুল মু'মিনীন এবং অন্যান্য মুসলিম মহিলাদের ব্যাপারে জানা যায় যে, মদীনার পথে এবং হজ্জ আদায়ের সময় কোনো কোনো সাহাবাদের সাথে তাঁরা সামনাসামনি হয়ে পড়তেন। এতে কোনো রকমের বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়নি। তবে এ ধরনের অবস্থায় দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।

১. এ ধরনের সাক্ষাৎ যেন নির্জন একাকীত্বে না হয়। এ অবস্থা ঘরে বা বাইরেও হতে পারে। এ ব্যাপারে কোনো শর্ত নেই কিন্তু এ ধরনের সাক্ষাতের সময় স্বামী বা বাবা-ভাই যাতীয় মুহাররমদের মধ্যে কেউ সাথে থাকা খুবই জরুরি।

এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাসের বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী বলেছেন–

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে সে যেনো কোনো নারীর সাথে একাকীত্বে কখনো সাক্ষাৎ না করে; তবে হ্যাঁ, যদি তার সাথে মুহাররমদের মধ্যে কেউ থাকে।"

বুখারী শরীফের অন্য একটি হাদীস হচ্ছে–

"কেউ কোনো নারীর সাথে একাকীত্বে সাক্ষাৎ করবে না; অবশ্য যদি তার সাথে কোনো মুহাররম থাকে।"

"(উল্লেখ্য যে, মুহাররম হচ্ছে শরীয়তের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে নারীর সে সব নিকটাত্মীয় যাদের সাথে বিয়ে হারাম, যেমন– বাবা-ভাই, চাচা-মামা ইত্যাদি।)

তবে হাদীসের অর্থ বা উদ্দেশ্যে এ নয় যে, ইসলাম পুরুষ বা নারীর ওপর কোনো আস্থা পোষণ করে না। বিষয়টি তা নয়। আসলে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য পথকেও বন্ধ করে দেয়া। এ জন্যেই পর পুরুষ ও পর নারীর মধ্যে একাকীত্বে সাক্ষাৎকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বিনা অনুমতিতে কাউকে কারো ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এভাবে ইসলাম আরো কিছু নিষেধ আরোপ করে বিশৃংখলা ও বিপদের সব সম্ভাব্য পথকে বন্ধ করে দিয়েছে। নর-নারীর বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সুতরাং নবী করীম ﷺ এ উদ্দেশ্যেই পর নারী ও পর পুরুষকে পরস্পর একাকীত্বে দেখা সাক্ষাৎকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।

নবী করীম বলেছেন–

"সাবধান! নারীদের কাছে একাকীত্বে যেয়ো না। কসম সেই পবিত্র সত্তার যার অধিকারে রয়েছে আমার প্রাণ; কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একাকীত্বে সাক্ষাৎ করবে না– অবশ্য এ জন্য যে, তাদের দুজনের মাঝখানে একজন শয়তান থাকে।"

কিন্তু যদি একাকীত্ব না হয় বা একাকীত্ব হলেও নারীর সাথে তার কোনো মুহাররম উপস্থিত থাকে তাহলে এ ধরনের সাক্ষাতে কোনো আপত্তি নেই।

২. দ্বিতীয় শর্ত এই যে, নারী তার রূপের প্রকাশ দেহ প্রদর্শনী বর্জন করবে। সে শরীয়তের নির্ধারিত সীমায় থাকবে।

সে সীমা কি? তা নিচের আয়াতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে–

"এবং নিজের রূপসৌন্দর্য প্রকাশ করো না; সেই রূপ-সৌন্দর্য ছাড়া যা নিজ থেকে প্রকাশ হয়ে যায়।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী বলেন, "রূপসৌন্দর্য দু'ধরনের রয়েছে। একটি হচ্ছে স্বাভাবিক এবং অন্যটি কৃত্রিম। স্বাভাবিক রূপসৌন্দর্য বলতে বুঝায় সেই রূপসৌন্দর্য যা তাকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। আর কৃত্রিম

রূপসৌন্দর্য হচ্ছে তা যা নারী তার স্বাভাবিক রূপ সৌন্দর্যের পরিস্ফুটনের জন্যে সাজগোজ করে থাকে। যেমন পোশাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, প্রসাধনী ইত্যাদি।

(কুরতুবী দ্বাদশ খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠা)

উপরের আয়াতে বর্ণিত "যা নিজে থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে।" এর অর্থ হচ্ছে রূপসৌন্দর্য দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি যা প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং অন্যটি গোপনীয় থাকে। প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্যের ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন অভিমতের উল্লেখ রয়েছেন। যেমন কাতাদাহর মতে রূপসৌন্দর্যের অর্থ হচ্ছে কাঁকন, আংটি, সুরমা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে তিনি নবী করীম ﷺ এ হাদীসটিরও উল্লেখ করেন।

প্রিয়নবী বলেছেন—

"যে আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে এমন কোনো নারী জন্যে, এটা বৈধ নয় সে তার নিজের হাত দুটিকে অর্ধেকের উপর খোলা রাখে।"

এভাবে আয়েশা (রাঃ)-এর মতে প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্যের অর্থ কাঁকন আংটি ইত্যাদি। এর সমর্থনে তিনি এ ঘটনাভিত্তিক হাদীসের উল্লেখ করেন যে, "একবার তাঁর ভ্রাতৃষ্পুত্রী তাঁদের নিকট আগমন করল। সে সময় নবী করীম ﷺ ও সেখানে পৌঁছান। নবী করীম ﷺ তাকে দেখে নিজের চেহারা ফিরিয়ে নেন।

এ দেখে আয়েশা (রাঃ) বলেন—

"হে আল্লাহর রাসূল! এটাতো আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী।" একথা শুনে নবী করীম ﷺ বললেন, "যখন মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা হয় তখন তার চেহারা ও হাতের তালু ছাড়া কোনো জিনিস খোলা রাখা উচিত নয়।"

এরপর আরো একটি অভিমতের উল্লেখ করেন। অন্যান্য অভিমতের তুলনায় এটাই বেশি প্রাধান্য ও যথার্থ বলে মনে হয়। আর তা হচ্ছে এই যে, প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্যের অর্থ হলো চেহারা ও হাতের তালুর সাথে ঐসব অলঙ্কারও যা সাধারণত এ দুটি অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন আংটি, কাঁকন, প্রসাধনী ইত্যাদি।

যেমন আমরা আগেই বলেছি, এ অভিমতটিই আমাদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা, নামায আদায়ের সময় লোকদেরকে "সতর ঢেকে রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং নারীদেরকে সারা শরীরের শুধু মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী মহিলাদের হাতের কনুই পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে। এ ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এতে বুঝা যায় যে এসব মহিলাদের সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি

তা হতো তাহলে এসব অঙ্গকে নামাযের সময় খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হতো না এ বিষয়কে সামনে রেখে আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে এর অর্থ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়।" (তাবারী, অষ্টাদশ খণ্ড ৯৪ পৃঃ)

কুরতুবী, ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ এবং মাসউদ বিন আকরামা উদ্ধৃতি দিয়ে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করছেন এবং তা হচ্ছে, প্রকাশ্য রূপ-সৌন্দর্যের অর্থ সুরমা, কাঁকন, অর্ধেক হাতের প্রসাধনী, বালি, আংটি ও অন্যান্য অলংকার। মনীষীদের মতে এসব জিনিস প্রকাশ্য রূপ সৌন্দর্যের পরিপন্থী নয়।

(কুরতুবী, দ্বাদশ খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা)

রূপসৌন্দর্যের অন্য আরেক প্রকার হচ্ছে গোপনীয়। এর মধ্যে হাঁসলী, বাজুবন্দ, পায়েল, মাথা ও বাহুর অলংকার ইত্যাদির প্রদর্শনী বৈধ নয়।

এ ব্যাপারে কুরআনের এ আয়াতে স্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা হয়েছে–

"এবং নিজের রূপসৌন্দর্যকে প্রকাশ করো না, ঐ রূপ-সৌন্দর্য ছাড়া যা নিজ হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তারা নিজেদের বক্ষের উপর নিজেদের চাদরকে বগলদাবা করে নেবে এবং নিজেদের রূপসৌন্দর্যকে প্রকাশ করবে না, অবশ্য সেসব লোকদের সামনে (যেমন) স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, সৎছেলে, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগ্নে, আপন নারী, নিজ গোলাম, সে সব পুরুষ সেবক যারা নারীদের ব্যাপারে অনুভূতিহীন অথবা সেসব ছেলে যারা এখনো নারীদের পর্দার ব্যাপারে অবহিত নয়। (এবং তাদেরকে আদেশ দাও যে) তারা চলার সময় নিজেদের পা মাটির উপর এভাবে না ফেলে, যে রূপসজ্জা তারা লুকিয়ে রেখেছে (শব্দের মাধ্যমে) তার প্রকাশ ঘটে।" (সূরা নূর : আয়াত-৩১)

কুরতুবী, প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্য ও রূপসৌন্দর্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন–

"রূপসৌন্দর্য কোনোটা প্রকাশ্য হয় এবং কোনোটা গোপনীয়। প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্য শুধু তারাই দেখার অনুমতি পাবে যাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে।

এ ছিল পর্দা সম্পর্কিত কয়েকটি জরুরি কথা যা আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করেছি। এ ধরনের পর্দার ব্যবস্থা করা নারী ও পুরুষ সবার জন্যই অবশ্য কর্তব্য। এর অনুসরণ করে মন-মেজাজের পবিত্রতা অর্জন করা যেতে পারে। এর বিরুদ্ধাচরণ করা কোনো অর্থেই বৈধ নয়। কারণ এছাড়া অন্য সব পথই ক্ষতিকর এবং তাতে করে সমাজে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

পরিশিষ্ট

পর্দা সংক্রান্ত এ দীর্ঘ আলোচনার পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলামের নির্দেশিত পর্দা ব্যবস্থা নিছক কোনো প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি নয় বরং এটা হচ্ছে একটি যুক্তি। বুদ্ধিভিত্তিক ব্যবস্থা। প্রচলিত প্রথা পদ্ধতি হচ্ছে এক ধরনের স্থবিরতা। তাতে কোনো রকমের রদবদলের অবকাশ থাকে না। কিন্তু বুদ্ধি ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যবস্থায় প্রয়োজনবোধে পরিবর্তনের অবকাশ থাকে। জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেকের দাবি অনুযায়ী তা কোনো সময় কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হয় আবার কোনো সময় কিছুটা শিথিলতা দেখানো যেতে পারে। এর অনুসরণ অন্ধ ও বধিরদের মতো হয় না বরং জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের মতো হয়ে থাকে। যেহেতু এটি একটি জ্ঞান ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যবস্থা তাই এর অনুসরণের জন্যে প্রতি মুহূর্তে জ্ঞান ও বুদ্ধিবিবেচনার প্রয়োজন অপরিহার্য।

এতক্ষণ আমরা পর্দা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি। এবার আমরা এ সংক্রান্ত কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করব।

১. ঘর সংসারের মর্যাদা

২. নারীর রূপলাবণ্য ও প্রসাধন

৩. নারী পুরুষের মর্যাদা

ঘর-সংসারের মর্যাদা

ইসলাম তার অনুসারীদের ঘর-সংসারের প্রতি মনোযোগ ও মর্যাদা প্রদর্শন করতে আদেশ দেয়। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম এমন সব আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছে যা ঘর ও পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণ করে। নিচে আমরা এ সব আইন-কানুন তুলে ধরছি।

১. ইসলামী সমাজের কোনো সদস্যের জন্যে ঘর ও পরিবারের বিভিন্ন ঘটনাবলি জানার জন্যে গোয়েন্দাগিরি করা অথবা উঁকিঝুঁকি মারা সম্পূর্ণ অবৈধ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি মারাত্মক চারিত্রিক দুর্বলতা। এ হাদীসটি থেকে এ অপরাধের জঘন্যতা প্রমাণিত হয়।

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"যদি কোনো ব্যক্তি তোমাদের অনুমতি ছাড়া তোমাদের ঘরে উঁকি মারে এবং তোমরা যদি তার চোখে কাঁকর মার যাতে সে অন্ধ হয়ে যায় তাহলে (এর জন্যে) তোমাদেরকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (বুখারী, মুসলিম)

এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং তখন দরজা খোলা ছিল।

নবী করীম ﷺ বলেন–

"যাও, দূরে সরে দাঁড়াও, চোখ চোখে অনুমতি নেয়া হয় না।" (আবু দাউদ)

এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর পদ্ধতি ছিল তিনি যখন কারো ঘরে যেতেন তখন দরজার ডানে বা বামে সরে দাঁড়াতেন এবং তিনবার সালাম প্রদানের মাধ্যমে অনুমতি নিতেন।

২. তিনটি সময় এমন রয়েছে যখন সেবক সেবিকাদের বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এমনকি ঘরের ছেলে মেয়েদেরকেও ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি নিতে হয়। আর অনুমতি তখনই দেয়া যাবে অনুমতিদাতা নিজে পর্দা করে থাকে এবং আত্মমর্যাদাবান হয়ে থাকেন।

উল্লিখিত তিনটি সময় হচ্ছে–

ক. ফজরের নামাযের আগে, কেননা, ফযরের পূর্বে ঘুমানো উচিত নয়।

খ. যোহরের সময় যখন মানুষ নিরিবিলি বিশ্রাম গ্রহণ করে।

গ. এশার নামাযের পরে যখন ব্যক্তি ঘুমানোর প্রস্তুতি নেয়।

পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে–

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দাসী গোলাম এবং তোমাদের সেসব ছেলে যারা এখনো বয়োপ্রাপ্ত হয়নি, তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসবে, ফজরের নামাজের আগে এবং যোহরের সময় যখন তোমরা পরিধেয় খুলে রাখ এবং এশার নামাজের পরে। এ তিনটি সময় তোমাদের জন্যে পর্দার সময়। এর পরে তারা বিনা অনুমতিতে এলে তোমাদের ওপর এবং তাদের ওপর কোনো পাপ হবে না। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী।"

(সূরা নূর : আয়াত-৫৮)

৩. কারো গৃহে গিয়ে সাক্ষাৎ অথবা কারো কাছে প্রয়োজনীয় কি জানার জন্যে সময় নির্বাচনের ভার ব্যক্তির মর্জির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। শরীয়ত যে তিনটি সময়কে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্যেও যেখানে অনুমতির প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছেন তার স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে সে তিনটি সময় কারো সাথে সাক্ষাতের জন্যে উপযুক্ত সময় নয়। সুতরাং কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এ তিন সময়ে কারো ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। এ তিনটি সময় ছাড়া অন্য সময়ও কারো ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভালো করে ভেবে দেখে নেয়া উচিত যে,

তাতে করে কারো বিরক্তির কারণ না ঘটে! আর তা জানার পর প্রথমে সালাম জানিয়ে কারো গৃহে প্রবেশ করবে। এটা ব্যক্তির বিবেকের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, কোনো সময় কার কাছে যাওয়া উচিত নয়। যেমন মনে করুন, আপনার কোনো বন্ধু দীর্ঘ সফরের পরে গৃহে ফিরেছেন এবং সফরের ক্লান্তি দূরীকরণের জন্যে তার বিশ্রামের প্রয়োজন। তখন বিবেকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে বিশ্রাম করতে দেয়াই উচিত। তখন তার কাছে যাওয়া উচিত নয়।

অন্য একটি উদাহরণ নিন। মনে করুন আপনি আপনার কোনো বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। কিন্তু আপনার বন্ধু তখন পরিবারের লোকদের সাথে যদি আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, স্পষ্টতঃ তাতে পুরুষ ও মহিলা সবাই উপস্থিত থাকতে পারেন। সুতরাং সে সময় তার কাছে যাওয়া আপনার উচিত নয়।

কখনও কখনও এমনটিও হয় যে, আপনি ভেবেচিন্তে সঠিক সময়েই কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন যে, আপনার বন্ধু তার পরিবারের লোকদের মধ্যে রয়েছেন বা বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনার ভদ্রতা হবে যে, আপনি চুপচাপ ফিরে আসবেন যেন কেউ আপনার আগমনটাই টের না পায়।

নিচের আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে–

"হে ঈমানদারগণ! নিজের ঘর ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তাদের অনুমতি পাও এবং তাদের প্রতি সালাম না দাও। এটা তোমাদের জন্যে উত্তমপন্থা। আশা করা যায় তোমরা এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আবার সেখানে যদি কাউকে না পাও তাহলে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ না তোমাকে অনুমতি দেয়া হয়। এবং যদি তোমাকে বলা হয় যে "ফিরে যাও" তাহলে ফিরে এসো। এটা তোমাদের জন্যে পবিত্র পন্থা। এবং যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ তা খুব ভালো করে জানেন!" (সূরা নূর : আয়াত-২৭-২৮)

এ ছিল মোটামুটি কয়েকটি নির্দেশাবলি। অন্যান্য ব্যাপারগুলো মানুষের বিচার বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য মানুষকে তার আবেগ ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার তাগিদ করা হয়েছে এবং কারো বাড়িতে যাওয়ার আগে ভালো করে জেনে নেয়া দরকার যে, তার যাওয়ার ফলে কারো কোনো অসুবিধা হবে কি না, যদি এমন কোনো আশঙ্কা থাকে তাহলে না যাওয়াই ভালো। পবিত্র কুরআনে মূলত, এ শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কারো ঘরে যাতায়াতের জন্যে এটা হচ্ছে ন্যূনতম শর্ত। এমনকি ঘরে প্রবেশের আগে স্বামীকেও স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে এবং তা করা স্বামীর জন্যে উত্তম।

এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন–
“এটাই উত্তম যে, ঘরে প্রবেশ করার আগে স্বামী আহ্বান জানাবে, হঠাৎ করে ঢুকে পড়বে না, যেন সে তাকে এমন অবস্থায় না পায় যে অবস্থায় দেখা তার পছন্দনীয় নয়।” মা এবং বোনদের ঘরেও অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে তা তারা সবাই একই গৃহেই থাকুক না কেন। এ অনুমতি গ্রহণ করা শুধু উত্তমই নয় বরং একান্ত প্রয়োজনীয়ও। আবদুল্লাহ বিন সামুদের অভিমত হচ্ছে ‘মায়ের কাছে যাওয়ার আগে অনুমতি নেয়া আবশ্যক।”

আতা বিন আবি মূসা রাব্বাহ (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, “আমাদের পৃষ্ঠাপোষকতাধীনে কয়েকজন ইয়াতীম বোন রয়েছে। তারা আমাদের সাথেই থাকে, তাদের কাছে যাওয়ার জন্যেও কি অনুমতি নিতে হবে?” ইবনে আব্বাস জবাবে বলেন: “হ্যাঁ।” ইব্‌নে রাব্বাহ বললেন, “আমাকে অনুমতি ছাড়াই যেতে দিন।” কিন্তু আব্বাস তা প্রত্যাখ্যান করে জিজ্ঞেস করলেন “তুমি কি তাদের উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে?” ইবনে রাব্বাহ বললেন, “কখনো না, কখনো না।” এর পর ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, “তাহলে তাদের অনুমতি নিয়ে যেও।” এরপর জিজ্ঞেস করলেন, “আনুগত্য কি তোমার পছন্দ নয়।” ইবনে রাব্বাহ বললেন, হ্যাঁ।” এরপর তিনি বললেন, “তাহলে তুমি অনুমতি নিয়েই ভিতরে যেও।”

বলাবাহুল্য, যেখানে স্ত্রী, মা ও বোনের ঘরে প্রবেশের জন্যে এতোটা কড়াকড়ি আদেশ সেখানে অপর স্ত্রীলোকদের ঘরে ঢোকার ব্যাপারে যে কড়া বিধিনিষেধ থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু কিভাবে অনুমতি নেয়া হবে? অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর শিক্ষা হচ্ছে– অনুমতি প্রার্থনাকারী দরজার ডানে অথবা বামে দাঁড়িয়ে সালাম জানাবে এবং ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইবে। যদি ঘর থেকে কোনো জবাব না আসে তাহলে ফিরে আসবে।

তবে আজকের যুগে গ্রাম অঞ্চলে ব্যবস্থা অনেকটা চলতে পারে। কারণ গ্রামে দরজা প্রায় সারাদিনই খোলা থাকে এবং কোনো কোলাহলও থাকে না কিন্তু শহরের ঘরবাড়িতে দরজা প্রায় সারা দিনই বন্ধ থাকে তাই শুধু সালামের শব্দ ভিতর পর্যন্ত নাও পৌঁছাতে পারে। এজন্যে এ অবস্থায় অনুমতি প্রার্থনাকারীকে ঘরের দরজায় তিনবার টোকা দিতে হবে, যদি ‘কলিং বেল’ থাকে তাহলে বেল টিপতে হবে। এভাবে তিনবার দরজায় টোকা দান বা তিনবার কলিং বেল টেপার পর অনুমতি পেলে তো ভালো– নয়তো ফিরে যেতে হবে।

নারীর রূপ-লাবণ্য ও সাজসজ্জা

নারীর রূপচর্চা ও সাজসজ্জার ব্যাপারে ইসলাম কোনো বয়সের বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। স্ত্রী তার স্বামীর পছন্দমতো পোশাক পরিচ্ছদ, সুগন্ধি দ্রব্যাদি এবং অলঙ্কারাদি ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, নারীর নারীসুলভ মানবিকতাই হচ্ছে তার আসল রূপসৌন্দর্য এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার। নারীর নম্রতা শিষ্টতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সততাই হচ্ছে তার প্রকৃত গুণাবলি।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন–

"স্মরণ রাখ আল্লাহর নিদর্শনাবলি এবং জ্ঞানবুদ্ধি যা তোমাদের ঘরে শোনানো হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুন্দরতর এবং সর্বজ্ঞাত।"

(সূরা : আহ্যাব : আয়াত-৩৪)

এ জ্ঞানবুদ্ধি ও বিদ্যার দাবি হচ্ছে যে, তার মধ্যে নম্রতা ও ভদ্রতার বৈশিষ্ট্য বিকশিত হবে এবং তার জ্ঞানবুদ্ধির সম্প্রসারণ ঘটবে। এটাই হচ্ছে নারীর আসল রূপ, আসল ভূষণ। তার চরিত্রই তার সর্বোত্তম অলঙ্কার।

এ ব্যাপারে উমর বিন আব্দুল আজীজের বোন একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেন–

"যে মনে খোদাভীতির অলঙ্কার থাকে, অন্য কোনো অলঙ্কার তার মোকাবেলা করতে পারে না। প্রতিটি ব্যক্তিই কোনো না কোনো গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে দানশীলতা এবং দয়া। আল্লাহর শপথ, ক্ষুধার সময় সুস্বাদু খাদ্য আর শীতল পানীয় গ্রহণের চেয়ে আমার কাছে অধিকতর প্রিয় হচ্ছে দয়া, সহানুভূতি ও ভালোবাসা দান করা। আল্লাহর কসম, আমি আজ পর্যন্ত অতি মূল্যবান কোনো জিনিসের দিকে আকর্ষণ বোধ করিনি, কিন্তু সৎকর্ম এবং খোদাভীতির ব্যাপারে আমি ঈর্ষাকাতর থাকি। আমার শ্রেষ্ঠ কামনা বাসনা এ যে, আমিও যেন পূণ্যবতী এবং খোদাভীরু হতে পারি। কিন্তু এ অমূল্য সম্পদ শুধু কি কামনা করলেই পাওয়া যেতে পারে?"

বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, এ কথাগুলো বলেছেন একজন মহান রাষ্ট্রনেতা ও মুসলিম জাহানের সর্বজনপ্রিয় খলিফার বোন। তিনি চাইলে দুনিয়ার যে কোনোও মূল্যবান জিনিস, যে কোনো অলঙ্কার সহজেই অর্জন ও ব্যবহার করতে পারতেন। সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ মূল্যের সৌখিন বস্ত্র, হীরা-মুক্তার স্তূপ তাঁর পদচুম্বনের জন্যে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এসব বিলাস দ্রব্যাদি ছিল তাঁর কাছে আবর্জনার মতো তুচ্ছ। এসব দ্রব্যাদির দিকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণও তিনি বোধ করেননি। তিনি প্রকৃত অলঙ্কার খুঁজে বের করেছিলেন– তা হচ্ছে সততা ও খোদাভীরুতা।

তাই তিনি বলেছেন–

"যে মনে খোদাভীতির অলঙ্কার থাকে, অন্য কোনো অলঙ্কার তার মোকাবিলা করতে পারে না।"

এ দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের বাহ্যিক রূপচর্চা ও সাজসজ্জাকে 'মুবাহ' অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় বা গুরুত্বহীন বলা হয়ে থাকে। যে নারী তার আসল রূপ অর্থাৎ মানবিক গুণাবলিতে সুসজ্জিত হয়ে উঠবে, তার কাছে এসব বাহ্যিক রূপচর্চা ও ঠুনকো সাজসজ্জাকে অর্থহীন মনে হবে। সুতরাং কোনো কৃত্রিমতার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষিত হবে না।

পোশাকের সৌন্দর্য

নারীকে তার ব্যক্তিগত অবস্থা অনুযায়ী পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত। তার আর্থিক অবস্থা যদি রেশমী বস্ত্র পরার অনুমতি দেয় তাহলে তা সে পরতে পারে। (উল্লেখ্য যে, ইসলামের বিধান মোতাবেক নারীর জন্যে রেশমীবস্ত্র ও সোনা ব্যবহার করা বৈধ করা হয়েছে) এভাবে অন্যান্য কাপড়ও সে ব্যবহার করতে পারে। একথা মনে রাখা উচিত যে মানুষের প্রকাশ্য রূপ তার অভ্যন্তরীণ রূপেরই পরিচয় বহন করে। সুতরাং নারীর বস্ত্র ক্রয়ের সময় তার মান ও বর্ণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে তা শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

অন্যথায়, যদি নিজের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করে অথবা এমন চটকদার রং বাছাই করে যা তার দ্বীনী আগ্রহের পরিপন্থী হয় বা যে পরিচ্ছদে তার লজ্জা ও শালীনতা বজায় না থাকে, যে পোশাক পরলে তার শারীরিক কাঠামো বা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাহলে সেই পরিচ্ছদ শুধু যে শরীয়ত বিরোধী তাই নয়, বরং তাতে করে সেই নারীর চারিত্রিক অধঃপতন এবং জ্ঞান-বুদ্ধির অসাড়তাই স্পষ্ট হয়। এ ধরনের আঁটসাঁট বা চটকদার পোশাক সমাজে যতই প্রচলিত বা যতই প্রশংসনীয় হোক না কেন নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত ঘৃণ্য পোশাক বলে বিবেচিত হয়।

ইসলামে নারীকে সোনার অলংকার ব্যবহার করার অনুমতিও দিয়েছে। এ ব্যাপারে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন–

"একবার (সম্রাট) নাজ্জাশী নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে কয়েকটি অলংকার উপহার হিসেবে পেশ করেন, তার মধ্যে সোনার একটি আংটিও ছিল এর মুক্তাটি ছিল হাবসার। প্রিয়নবী ﷺ তা গ্রহণ করেন এবং তার নাতি উমামা বিনতে জয়নবকে ডাকলেন এবং স্নেহের সঙ্গে তার আঙুলে পরিয়ে দিলেন।"

সোনাসহ রূপা, ইয়াকুত, জমরুদ, আশমাস প্রভৃতি হীরা মুক্তা ব্যবহারের অনুমতিও নারীর রয়েছে। কেননা আল্লাহ্ এসব পদার্থের ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করে কোনো ঘোষণা দেননি।

এ ছাড়া নারী অন্যান্য হীরা মুক্তা ইত্যাদির ব্যবহার করতে পারে এর প্রমাণ হিসেবে এ আয়াতটির উল্লেখ করা যায়–
"উভয় (সমুদ্র) থেকে তোমরা তাজা মাংস (মাছ) অর্জন করে থাক এবং ব্যবহারের জন্যে অলংকারের সামগ্রী বের করে থাক।" (সূরা ফাতির : আয়াত-১২)

বলাবাহুল্য, সমুদ্র থেকে যেসব মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী উত্তোলন করা হয় তার মধ্যে হীরা মুক্তাও শামিল রয়েছে।

যেমন এ কুরআন আল্লাহ্ বলেছেন–

"এসব সমুদ্র থেকে মণিমুক্তা এবং আরজ্জান (হীরা) বের হয়ে থাকে।"
(সূরা রহমান : আয়াত-১২)

সুগন্ধ দ্রব্যাদির ব্যবহার

নারী সুগন্ধ দ্রব্যাদির ব্যবহার করতে পারে কিন্তু স্বামীর অনুপস্থিতিতে এর ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু স্বামীর উপস্থিতিতে এর ব্যবহার উত্তম। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "উসমান বিন মাযউনের স্ত্রী আগে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দেন। একদিন এ অবস্থাতেই তিনি আয়েশার (রা) কাছে যান। আয়েশা তাকে এ অবস্থায় দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং তাঁকে সুগন্ধি বর্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কারণ তখন তাঁর স্বামী কাছে ছিলেন না। তিনি প্রশ্ন শুনে বললেন, "হে উম্মুল মু'মিনীন! উসমানতো সংসার বর্জনের তালে আছে। সংসারের দিকে পরিবার পরিজনের দিকে তার কোনো লক্ষ্য নেই।" একথা শুনে আয়েশা প্রিয় নবীর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন।

অতঃপর একদিন নবী করীম ﷺ উসমানের দেখা পেয়ে বললেন–

উসমান! তুমিতো মু'মিন এবং তৌহিদবাদী তাই না?"

উসমান বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এতে সন্দেহ কি?

এ কথা শুনে নবী করীম ﷺ বললেন– "আচ্ছা, তাহলে নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের দিকে লক্ষ্য এবং আগ্রহ দেখাও।" (হাদীস)

ইমাম শওকানী এ হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন–
"তার সুগন্ধাদি বর্জনে আয়েশা (রা)-এর বিস্ময় এ কথারই প্রমাণ যে সধবা স্ত্রীদের জন্যে এর ব্যবহার মুস্তাহাব এবং মুস্তাহসান।"

সাজসজ্জার পদ্ধতি

সাজসজ্জার দুটি প্রচলিত রীতিনীতি রয়েছে–

১. একটি হচ্ছে কৃত্রিম পদ্ধতি। যার মাধ্যমে শরীরের বিশেষ কোনো অংশকে ক্ষত করে, বা কাটাকাটি করে চিত্র বা রেখা অংকন করা। অথবা অন্য কোনোভাবে শরীরের স্বাভাবিক ত্বক নষ্ট করে কৃত্রিম কিছু লাগানো। এভাবে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়।

২. স্বাভাবিক পদ্ধতি। যার মাধ্যমে সুরমা, খেজাব এবং অন্যান্য আধুনিক প্রসাধন দ্রব্যাদির ব্যবহার করায় কোনো বাধা নেই।

কৃত্রিম পদ্ধতি

রূপচর্চা ও সাজসজ্জার কৃত্রিম পদ্ধতি যেমন দাঁতের সজ্জার জন্যে দাঁতকে চিরে তার মধ্যে গর্ত সৃষ্টি করা বা দাঁতকে ছোট করা অথবা শরীরের অন্য কোনো অংশকে কেটেকুটে সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হারাম। যে কোনো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটা বলতে বাধ্য হবেন যে এ ধরনের প্রয়াস অত্যন্ত হীন মানসিকতার পরিচয় বহন করে। বস্তুত, স্বভাব সৌন্দর্যের সাথে এর বিন্দুমাত্র মিল নেই, (অথচ আজকাল তথাকথিত বিউটি পার্লারগুলোতে এ ধরনের অদ্ভূত রূপচর্চার ব্যবস্থাই পরিলক্ষিত হয়।)

নিঃসন্দেহে, ইসলাম নারীদের রূপচর্চা ও সাজসজ্জায় কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করে না। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম নারীর রূপচর্চা ও সাজসজ্জাকে শুধু পছন্দই করে না বরং তাকে উৎসাহিতও করে এবং এ বিষয়টি ইসলামের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও। কিন্তু রূপচর্চা ও সাজসজ্জার নামে এমন সীমালংঘন করা যাতে শরীরকেও বিকৃতি করে দেয়া হবে– তা কেননা যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কুৎসিত প্রবণতা আত্মমর্যাদা এবং ব্যক্তিমর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং এ কুপ্রথার অবসান একান্তই অপরিহার্য।

তবে, কারো শরীরের কোনো অংশে যদি কোনো অবাঞ্ছিত পরিবৃদ্ধি ঘটে বা তার স্বাভাবিক দেহকাঠামোকে বিগড়ে দিচ্ছে বা তার মানবিক পীড়ার কারণ ঘটাচ্ছে তাহলে চিকিৎসার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কেউ কোনো অঙ্গের সেই অংশ কেটে ফেলে তাহলে তাতে কোনো আপত্তি নেই। কেননা তাতে করে ব্যক্তির জীবন তিক্ততায় ভরে ওঠার আশংকা থাকে। সুতরাং এমন কোনো আপদ থেকে মুক্তির জন্যে কেউ যদি তার কোনো অঙ্গের বাড়তি অংশ কেটে ফেলে তাহলে তাতে ইসলাম কোনো বাধা দেয় না। কারণ ইসলাম মানুষের দৈহিক ও মানসিক

শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে চায়। ইসলাম সহজ-সরলতারই নাম। কিন্তু কেউ বিনা কারণে শুধু বিকৃত রূপচর্চার জন্যে অঙ্গহানী করতে পারবেন না। যারা এমন কর্ম করে তারা আসলে তাদের মানসিক দুর্বলতারই প্রমাণ উপস্থাপন করে। ইসলাম কোনো অবস্থাতেই এ ধরনের অপকর্মের অনুমতি দিতে পারে না।

'নায়লুল আওতার' এ সমস্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে- "দুই কিংবা চারটি দাঁতের মধ্যে শূন্যতার সৃষ্টি করা যেমন বৃদ্ধরা এবং প্রৌঢ়রা নিজেদের বয়স কম দেখানোর জন্যে এবং দাঁতকে সুন্দর করার উদ্দেশ্যে করে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের শূন্যতা ছোট মেয়েদের দাঁতে দেখা যায়। কিন্তু প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা মহিলারা দাঁত বড় হয়ে গেলে পরে এমনটি করে। ইমাম রাজীর মতে এটা একটা হারাম কর্ম।"

স্বাভাবিক পদ্ধতি

রূপচর্চা ও সাজসজ্জার স্বাভাবিক পদ্ধতি বলতে বুঝায় সুরমা, খেজাব এবং অন্যান্য প্রসাধনী দ্রব্যাদির মাধ্যমে সাজার ব্যবস্থাবলি। এ ধরনের দ্রব্যাদি ব্যবহারে কোনো আপত্তি নেই। যদিও এসব আল্লাহর প্রকৃত সৃষ্টির রূপ পরিবর্তন করে তবুও তা অবৈধ নয় কারণ এ পরিবর্তন স্থায়ী নয় বরং সাময়িক এবং খুব শিগগিরই অথবা কিছুক্ষণ পর তা মিশে যায় এবং চেহারা আসল রূপ ধারণ করে। 'নায়লুল আওতার'-এর গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে বলেন- "বলা হয়েছে হারাম শুধু সেসব জিনিসের ব্যবহার যা স্থায়ীভাবে অবশিষ্ট থাকে কিন্তু তা যদি স্থায়ী অবশিষ্ট থাকার মতো না হয় যেমন সুরমা, খেজাব ইত্যাদি তাহলে ইমাম মালেক এবং অন্যান্য উলামার মতে তার ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।"

নারীর সৌন্দর্য কেবল স্বামীর জন্যেই হওয়া উচিত

উপরে রূপচর্চা ও সাজসজ্জার যে অনুমতি দেয়া হয়েছে তা কেবল স্বামীকে আনন্দিত করার জন্যে এবং তার মনে নিজের জন্যে ভালোবাসার আবেগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। বস্তুত নারীর রূপচর্চা এবং সাজসজ্জার উদ্দেশ্য কেবল এটাই এবং শুধু এটাই হওয়া উচিত। এর বিপরীত কোনো মহিলা যদি পর পুরুষকে দেখানোর জন্যে রূপচর্চা ও সাজসজ্জা করে থাকে তাহলে ইসলাম তার অনুমতি দেয় না। কারণ তা বিশৃঙ্খলা ও অশ্লীলতার মাধ্যমে হয়ে থাকে। মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ কেবল সতী, চরিত্রবান এবং পরহেযগার নারীদেরকে পছন্দ করেন। আমরা ইতিমধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি যে নারী তার কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে আর কোনোটা পারবে না।

মেলামেশা

আধুনিক যুগে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এক সাংঘাতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যা যেমন জটিল তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সত্যি কথা হচ্ছে নারী যদি সতী ও পবিত্র থাকতে চায় তাহলে তার বিবেক বুদ্ধি কখনো এ অবাধ মেলামেশাকে সমর্থন করতে পারে না। কারণ, আমরা যাকে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে বলছি, তা দৃষ্টিবিনিময়, মুখোমুখি হওয়া আর তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা ছাড়া আর কি?

নিচে আমরা সমস্যাটি নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব।

ঘরোয়া মেলামেশা

ক. কোনো স্ত্রী তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোনো ব্যক্তিকে তার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারে না। সে স্বাগত জানাবার জন্যেও কোনো পরপুরুষের কাছে যেতে পারবে না। তবে একান্ত অপরিহার্য কোনো প্রয়োজনে সে পরপুরুষের সামনে যেতে পারবে এবং এ ব্যাপারে তার স্বামীও যেন অবহিত থাকে অথবা আগত লোকটি এমন হবে যে তার ঘরে আপনজনদের মতো প্রায় যাতায়াতকারী হয়। যেমন গ্রাম অঞ্চলে হয়ে থাকে।

খ. স্ত্রী এবং স্বামীর নিকটাত্মীয়দের উচিত তারা যেন বেশি যাতায়াত না করে। আর যদি প্রয়োজনবোধে এসেও থাকে তাহলে যেন বিনা কারণে বেশিক্ষণ বসে না থাকে।

কারণ নবী করীম ﷺ বলেছেন- "শোন! পুরুষ গায়রে মাহরাম নারীদের কাছে যেতে বিরত থাকবে।"
সাহাবীগণ জানতে চাইলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! দেওরের ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? নবী করীম ﷺ বললেন, দেওর তো মৃত্যুসমতুল্য!"

নবী করীম ﷺ-এর একথার অর্থ হচ্ছে ভাবীর কাছে দেওরের যাতায়াত করা অত্যন্ত আশংকাজনক। কেননা স্বামীর এ নিকটাত্মীয় ঘরে প্রায় সব সময় যাতায়াত করতে থাকে। এখন যদি তার সাথে বেশি মেলামেশা করা হয় তাহলে তার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে। কখনো কখনো তো হত্যা বা ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত গড়ায়।

উপরের এ নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে, স্বামীর ভাই আর নিকট আত্মীয়দের জন্যেই এতো কড়া বিধি-নিষেধ রয়েছে যেখানে, সেখানে বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কারো সাথে তো আসা যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

বাইরের মেলামেশা

আগেই বলা হয়েছে যে, নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘর। এজন্যে তার বাইরে বের হওয়া সম্পর্কে কিছু দরকারী আইনবিধি থাকা আবশ্যক যেন কোনো রকমের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হতে পারে এবং তার মান মর্যাদাও অক্ষুণ্ন থাকে। তবে নারীকে ঘরেই বন্ধ করে রাখতে হবে এমন কথা ইসলাম বলে না, কারণ ঘরের বাইরেও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ থাকতে পারে তা নারী হোক বা পুরুষ। সুতরাং কোনো নারীকে প্রয়োজনীয় কাজে বা নিকটাত্মীয়ের সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্যে বাইরে যেতে হতে পারে।

মহিলারা সালাত আদায়ের জন্যে মসজিদেও যেতে পারে। তবে মহিলাদের জন্যে ঘরে সালাত আদায় করাটাই অধিকতর উত্তম। এছাড়া চিকিৎসা, বিদ্যার্জন, চারিত্রিক নৈতিক ও আদর্শিক জ্ঞান অর্জন এবং ইসলামী শিক্ষলাভের উদ্দেশ্যেও নারীদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে এমন কোনো স্থানে তাদের যাওয়া উচিত নয় যেখানে চরিত্রহীন লোকদের আনাগোনা বেশি হয়ে থাকে।

নারী তার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে হাট-বাজার এবং ক্ষেত খামারেও যেতে পারে। এভাবে প্রয়োজনের তাগিদে অন্য কোথাও যেতে বাধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে সত্যিসত্যিই প্রয়োজন থাকতে হবে। নবী করীম ﷺ আমলে সাহাবীদের (রা) স্ত্রীরা প্রয়োজনবোধে যে কোনো জায়গায় যেতেন। ইসলামই নারীদের এ অনুমতি দিয়েছে।

থিয়েটার-সিনেমা

গঠনমূলক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধরনের নাট্যাভিনয় বা শিক্ষামূলক ইসলামী সিনেমা অথবা অন্য কোনো সুন্দর স্থানে ভ্রমণের অনুমতিও রয়েছে। এখানে উল্লেখ যে, এসব বিনোদন মাধ্যমগুলো আসলে মন্দ জিনিস নয় বরং এক শ্রেণীর অসৎ ব্যক্তিরা এসব মাধ্যমকে অশ্লীলতা প্রচারের মাধ্যমে পরিণত করেছে। আজকাল সমাজ বিরোধী লোকেরা নাটক ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এসব অশ্লীল ও কদর্য চিত্র তুলে ধরছে যার ফলে পুরো সমাজেই চরিত্রহীনতা ও যৌন অপরাধ প্রবণতার সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে।

বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতা ও উৎশৃঙ্খলতা সৃষ্টির কাজে আজকের সিনেমা থিয়েটারসমূহ অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করছে। ফলে আজ মানবিকতা ও মানুষের চারিত্রিক মূল্যবোধ দারুণভাবে অবক্ষয়মান। সুতরাং নীতি ও চরিত্র

বিরোধী এবং অশ্লীলতাপূর্ণ ছায়াছবি বা নাট্যাভিনয় দেখার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। অবশ্য চরিত্রগঠনমূলক বা শিক্ষামূলক পরিচ্ছন্ন ছায়াছবি ও নাট্যাভিনয় দেখতে কোনো মানা নেই। কারণ ইসলাম মানুষের সৌন্দর্য ও বিনোদনপ্রীতির স্বাভাবিক আগ্রহকে অস্বীকার করে না। ইসলাম বরং রুচিশীল ও পরিচ্ছন্ন আমোদ-প্রমোদকে উৎসাহিত করে। হাদীসে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা সর্বজনবিদিত যে, নবী করীম ﷺ নিজেই আয়েশাকে হাবশীদের খেলা দেখিয়ে ছিলেন।

ভ্রমণকেন্দ্র ও পার্ক

আজ পর্যন্ত আমরা ইসলামে এমন কোনো কথা শুনিনি বা পড়িনি, যাতে নারীদেরকে ভ্রমণকেন্দ্র, পার্ক বা মুক্ত আবহাওয়ায় বেড়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

নবী করীম ﷺ-এর আমলে নারীরা শহরের বাইরেও যাতায়াত করতেন। এ প্রসঙ্গে আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, "আমি আমার স্বামী যুবাইরের খামার থেকে নিজ মাথায় বোঝা নিয়ে মদীনায় পৌঁছাতাম।" মুহাদ্দিসগণ এ থেকে প্রমাণ করেন যে সংক্ষিপ্ত সফরে নারীকে বিনা মুহাররমে সফর করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

আজকাল আমাদের গ্রাম অঞ্চলের নারীরা নিজ ঘরবাড়ি থেকে ক্ষেত খামারে যাতায়াত করে। এতে কোনো বাধা নেই। আমার মতো শহর ও গ্রামের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। তবে শহর এলাকায় নারীদের উত্যোক্তকারীদের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। সুতরাং এ ধরনের খারাপ পরিবেশে নারীদের বাইরে যাওয়া উচিত নয়। এমতাবস্থায় অসৎ ও অসভ্য লোকদের দমন করা এবং সামাজিক পরিবেশকে সুন্দর ও নিরাপদ রাখা হচ্ছে শহর প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব। এ ধরনের নিরাপত্তাহীন অবস্থায় প্রশাসনকে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যার আদেশ আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মাধ্যমে দিয়েছেন।

আল্লাহ নবী করীম ﷺ কে বলেন– "যদি মুনাফিক এবং ওসব লোকেরা যাদের মনে নষ্টামী রয়েছে এবং যারা উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে, যদি এসব তৎপরতা থেকে বিরত না হয় তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তোমাকে দাঁড় করাব। এরপর তারা এ শহরে খুব মুশকিলেই তোমার সাথে অবস্থান করতে পারবে।" (সূরা আহযাব : আয়াত-৬০)

সাধারণ যানবাহনে

আজকাল বড়বড় শহরে সাধারণ যানবাহনের অভাবজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, ফলে নারীতো নারী এমনকি পুরুষরাও ভীষণ বেকায়দায় পড়ে যায়। এমতাবস্থায় যাত্রাপথ যদি তেমন দীর্ঘ না হয় তাহলে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করাটাই ভালো অথবা আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে ট্যাক্সী, রিক্সা ইত্যাদি ভাড়া করা যেতে পারে, কিন্তু যদি ভাড়া অতিরিক্ত হয় বা অন্য কোনো আর্থিক সংকট থাকে তাহলে সাধারণ যানাবহনে যাতায়াত করা যেতে পারে।

সাধারণ যানবাহনে লোকজনের ভিড় থাকে বলে নারীদের যাত্রা নিরাপদ হয়– কোনো চরিত্রহীন তাদের বিরক্ত করার সুযোগ পায় না। সুতরাং উলামাগণ নারীদের সাধারণ যানবাহনে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছেন। যেমন হজ্জের সময় ভিড়ের কারণে নারী-পুরুষের একত্রে যাতায়াতের ব্যাপারে উলামাগণ কোনো বিধিনিষেধ সম্পর্কে নিরবতা পালন করেছেন। পবিত্র কাবা শরীফের তওয়াফের ক্ষেত্রেও একই নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে কেননা এসব উপলক্ষ্যে অধিক জনসমাগমের ফলে কোনো রকমের নিরাপত্তাহীনতার আশংকা থাকে না এবং কারো মনে অসৎ ভাবনাও জাগতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়

নারীর অধিকার ও দায়িত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ – নারীর উত্তরাধিকার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – নারীর শিক্ষা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – নারীর চাকরি

প্রথম পরিচ্ছেদ

নারীর উত্তরাধিকার

প্রাচীনকালে নারীর উত্তরাধিকার লাভের কল্পনাও মানুষের ছিল না। ক্রয়বিক্রয়যোগ্য কোনো বস্তুতেও তার উত্তরাধিকার বা মালিকানা স্বীকৃত ছিল না। উল্টো নারীকেই ক্রয়বিক্রয় করা হত। এমনকি একাদশ শতক পর্যন্তও দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্ত্রী ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাবের দুশো বছর পরও অমুসলিম সমাজগুলোতে এধরনের জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় এক হাজার বছর পরে ১৫৬৭ সালে আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এর অধীনে কয়েকটি বিশেষ বস্তুর মালিকানা স্বীকার করা হয়। এ থেকে অনুমান করে দেখুন যে, ইসলাম যেখানে পনেরোশ বছর আগে নারী জাতির পুরো অধিকার, মালিকানা ও উত্তরাধীকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে সেখানে ইসলামের এক হাজার বছর পর পাশ্চাত্যে নারীকে নামেমাত্র যে অধিকার দেয়া হলো তাও খুব সীমিত পর্যায়ের এবং আংশিক।

এ কথা তো সম্ভবতঃ প্রত্যেকেই জানেন যে, আরবরা নারীকে উত্তরাধিকার অর্জনের যোগ্যই মনে করত না। কেননা নারী ছিল দুর্বল, ঘোড়ার পিঠে চাবুক হারিয়ে ঝড়ের রেগে ধাবমান হওয়ার শক্তি তার ছিল না, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করাও ছিল তার পক্ষে অসম্ভব। যুদ্ধে বিজয়লব্ধ ধনসম্পদ কুক্ষিগত করতেও সে ছিল অক্ষম। সুতরাং এসব কারণে তারা নারীকে ওয়ারিস সূত্রের অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখে। আরব সমাজে কেবল ছেলেদেরকেই উত্তরাধিকার পাওয়ার উপযুক্ত মনে করা হতো, কেননা তারা যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে শত্রুর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম ছিল।

অতএব, অন্ধকার যুগের আরব সমাজে উত্তরাধিকার পাওয়ার প্রথম যোগ্য বড় ছেলে। এরপর ক্রমিকভাবে অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে উত্তরাধিকার স্বত্ব বন্টন করা হতো। কিন্তু এমন ছেলে যে যুদ্ধে অংশগ্রহণে সক্ষম নয় তাকেও উত্তরাধিকার সত্ত্ব দেয়া হতো না। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুকালে কেবল কন্যা সন্তানই রেখে যেত তাহলেও তার উত্তরাধিকার স্বত্ব তার মেয়েরা পেত না; বরং সবকিছু চাচাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো।

ইসলামই সর্বপ্রথম মেয়েদের উত্তরাধিকার দান করে

অন্ধকার যুগে আরব সমাজে মেয়েদের বঞ্চনা সম্পর্কিত বিষয়াবলির কথা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে অন্ধকার যুগের যাবতীয় অন্যায় অবিচার ও অসাম্যের অবসান ঘটানো হয় এবং মেয়ে তথা নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওহুদ যুদ্ধের পর সায়াদ বিন রবী (রা)-এর স্ত্রী নবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন– "হে আল্লাহর রাসূল! সায়াদ ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি দুজন বিবাহযোগ্য মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর চাচা সব সম্পত্তি দখল করলেন। এখন ওদের বিয়ের সমস্যা দেখা দিয়েছে যা সম্পদ ছাড়া সম্ভব নয়।" নবী করীম ﷺ একথা শুনে বললেন, আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। এর পরই উত্তরাধিকার সম্পর্কিত এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লাহ বলেন– "তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। যদি (মৃতব্যক্তির ওয়ারিশ) দুয়ের থেকে বেশি হয় তাহলে তাদেরকে 'তরকা'র দুই-তৃকতীয়াংশ দেয়া হোক, আর যদি একটি মেয়েই ওয়ারিশ হয় তাহলে অর্ধেক 'তরকা' আর যদি মৃতব্যক্তির সন্তান থাকে তাহলে তার মাতা-পিতার প্রতিজনকে এক তরকা'র ষষ্ঠ অংশ পাওয়া উচিত আর যদি সে সন্তান না রেখে যায় এবং শুধু মাতা-পিতাই যদি তার ওয়ারিশ হয় তাহলে মাকে এক-তৃতীয় অংশ দেয়া হোক, আর যদি মৃতব্যক্তির ভাই বোনও থাকে তাহলে মা এক-ষষ্ঠ অংশের অধিকারিণী হবে। (এসব অংশ সে সময় লেখা হবে) যখন মৃতব্যক্তির ওসীয়ত পূর্ণ করা হবে এবং তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়া হবে।

তোমরা জান না যে, তোমাদের মাতা-পিতা এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে যে উপকারের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর রয়েছে! এসব অংশ আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ নিঃসন্দেহে সব বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং সব সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তোমাদের স্ত্রীরা যা কিছু ছেড়ে গেছে তার অর্ধেক অংশ তোমরা পাবে যদি সে সন্তানহীনা হয়। আর যদি সন্তান থাকে তাহলে 'তরকা'ও এক-চতুর্থাংশ তোমাদের অবশ্য তার ওসীয়ত যদি পুরো করে দেয়া হয় আর তার ঋণ যদি আদায় করে দেয়া হয়– এবং তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের 'তরকা' থেকে এক-চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে যদি তোমরা নিঃসন্তান হয়ে থাক; নয়তো যদি সন্তান থেকে থাকে তাহলে তাদের (স্ত্রীদের) অংশ হবে অষ্টমাংশ, অবশ্য তোমাদের কৃত ওসীয়ত পূরণ করার এবং তোমাদের যে ঋণ রয়েছে তা আদায় করার পর।

আর যদি পুরুষ অথবা নারী (যার মীরাস বণ্টনের অপেক্ষায় রয়েছে) নিঃসন্তান হয় এবং তার মা-বাপও যদি জীবিত না থাকে; অবশ্য তার এক ভাই বা এক বোন যদি বর্তমান থাকে তাহলে ভাই এবং বোন প্রত্যেকেই ষষ্ঠাংশ পাবে, আর ভাইবোন যদি একাধিক থাকে তাহলে মোট 'তরকা'র এক-তৃতীয়াংশের তারা সবাই অংশীদার হবে যদি তার কৃত ওসীয়ত পূরণ করা হয়। আর যে ঋণ মৃত ব্যক্তি রেখে গেছে তা আদায় করে দেয়া হয়– এ শর্তে যে, তা যেন ক্ষতিকর না হয়। এ আদেশ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ অত্যন্ত জ্ঞানী, সর্বদর্শী ও পরম সহনশীল।" (সূরা নিসা : আয়াত-১১-১২)

যখন এ আয়াত নাযিল হয় তার পরপরই নবী করীম ﷺ সেই দুটি মেয়ের চাচাকে ডেকে বললেন– "সায়াদের উভয় মেয়েকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং মাকে অষ্টমাংশ তারপরে যা অবশিষ্ট থাকবে তা তোমার।"

দুনিয়ার ইতিহাসে মেয়েদের উত্তরাধিকার দখলের এটাই সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইসলামেরই প্রাপ্য।

মেয়েদের তথা নারীজাতির এ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর রাসূলকে কত যে সংগ্রাম-সাধনা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা যে কোনো সুবিচারকামী বিপ্লবী চিন্তাবিদ অনুমান করতে পারেন। কত শতাব্দী ধরে প্রচলিত প্রথা ও অন্যায় অত্যাচারের প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণাকে বদলে দেয়া সহজ কথা ছিল না। কিন্তু নবী করীম ﷺ আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান এবং যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদ করতে থাকেন। এভাবে তিনি দীর্ঘ সংগ্রাম সাধনার পর দুনিয়াতে প্রথম বারের মতো নারীজাতির অধিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করেন। এর মাধ্যমেই নারীজাতি সত্যিকারের মুক্তির পথ সুনিশ্চিত হয়।

ইসলামের এই বিপ্লবী সাফল্যের পেছনে যেমন রয়েছে নবী করীম ﷺ এ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম সাধনা, তেমনি নারীদের মুক্তি অর্জনের এ নতুন আদর্শ বাস্তবায়নে গোটা সমাজ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। অনেক পুরুষতো এ আদেশ শুনে শংকা প্রকাশ করে পরস্পর নানারকম কথাবার্তা বলতে লাগল। কেউ কেউ বলল– "কি অবাক কথা। এখন স্ত্রীরা চতুর্থাংশ পাবে, মেয়েদেরকে অর্ধেকাংশ দিতে হবে আর ছোট ছেলে সন্তানদের 'তরকা'র অংশ দিতে হবে। অথচ তারা কেউ যুদ্ধ করে না আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদও কুড়িয়ে আনে না।" এরপর এসব ব্যক্তিরা নিজেরাই ভেবেচিন্তে বলল– "থাক থাক, আপাতত চুপচাপ সব কিছু শুনে যাও। সময়ের সাথে সাথে এসব কথা সবাই ভুলে যাবে অথবা এ ধরনের আইন আদেশগুলোতে পরিবর্তন করা হবে।"

কিন্তু তাদের সেই ধারণার বিপরীত নবী করীম ﷺ নারীদের অধিকার দানের কথা যেমন ভুললেন না তেমনি নারীদের অধিকার সংক্রান্ত আইন আদেশে কোনোরকম সংশোধনও করেননি বরং বরাবর তিনি এসব আইন আদেশকে কার্যকারী করেন এবং লোকদেরকে তা যথাযথভাবে পালন করার জন্যে বাধ্য করেন। প্রিয়নবীর সেই ইসলামী বিপ্লব যে কতো সর্বজনীন ও সর্বাত্মক ছিল এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে কিন্তু আজ পর্যন্ত নারীদের অধিকর সংক্রান্ত ইসলামী আইন ও আদেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে কার্যকরী হচ্ছে। যুগ ও পরিবেশ বদলেছে সত্যি কিন্তু কোনো যুগে কোনো পরিবেশে ইসলামের আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়নি কখনোই।

ইসলাম যে সর্বমানবিকতার চিরন্তর ও স্বভাবিক জীবন ব্যবস্থা এটা তারই অন্যতম বাস্তব দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ আল্লাহর আদেশে নবী করীম ﷺ যে ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন করেন তা সর্বকালের সর্বদেশের সকল মানুষের জন্যেই কল্যাণকর এবং অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা। কারণ এটা স্রষ্টারই দেয়া জীবন ব্যবস্থা; এটা কোনো ভাবনাবিলাসীর খামখেয়ালিপনা নয়।

তরকায় (পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে) নারীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি কথা :

নারীর তরকার ওয়ারিশ হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে এ আয়াতটি

"পুরুষদের জন্যে এ সম্পদে অংশ রয়েছে যা পিতা-মাতা এবং নিকটত্মীয়রা রেখে গেছে। তা কম হোক বা বেশি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত রয়েছে।"

(সূরা নিসা : আয়াত-৭)

কিন্তু মনে রাখতে হবে, নারীর অংশ ওয়ারিশদের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে আর তা মৃতব্যক্তির সাথে তার নৈকট্য ও দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এভাবে বিভিন্ন নিকটাত্মীয়দের সাথে তার স্থানও বিভিন্ন রকম হতে থাকে, নিচে আমরা তা স্পষ্ট করে দিচ্ছি।

১. ক. তরকায় বোন, ভাইয়ের অর্ধেকাংশ আর তার যুক্তি প্রমাণ হচ্ছে কুরআনের এ আয়াত–

"তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান।"

খ. কিন্তু ওয়ারিশদের মধ্যে যদি কোনো ভাই বা বোন না থাকে এবং মেয়ে একা হয় তাহলে সে পুরো তরকার অর্ধেকাংশ পাবে। দলিল হচ্ছে এই আয়াত–

"যদি মেয়ে একা হয় তাহলে সে তরকার অর্ধেক অংশ পাবে।"

গ. আর যদি মেয়ে একাধিক হয় তাহলে তারা পুরো তরকার দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ পাবে। এর দলিল হচ্ছে এ আয়াতটি–

"যদি মেয়ে দুই এর বেশি হয় তাহলে তারা পুরো তরকার দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।"

২. ক. মায়ের উত্তরাধিকার সত্ত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা হচ্ছে–

"যদি মৃতব্যক্তি সন্তান রেখে যান তাহলে তার মাতা-পিতা তার তরকার ষষ্ঠাংশ পাবে।"

খ. "কিন্তু যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে মাতা মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে।"

অর্থাৎ মৃতব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থেকে থাকে তাহলে তার মাতা পুরো সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

গ. "যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে, কিন্তু ভাই বর্তমান থাকে তাহলে মা ষষ্ঠাংশ পাবে।"

অর্থাৎ নিঃসন্তান মৃতব্যক্তির যদি ভাই বর্তমান থাকে তাহলে মায়ের অংশ এক-তৃতীয়াংশ থেকে কমে ষষ্ঠাংশ হয়ে যাবে।

৩. স্ত্রীর উত্তরাধিকার সত্ত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

"এবং তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের 'তরকা' থেকে এক-চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে যদি তোমরা নিঃসন্তান হয়ে থাক। নয়তো সন্তান রেখে যাওয়ার অবস্থায় তাদের অংশ হবে অষ্টমাংশ এরপরে যে, তোমরা যা ওসীয়ত করেছ তা পূরণ করে দেয়া হবে এবং তোমরা যে ঋণ রেখে গেছ তা আদায় করে দেয়া হবে।"

মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক কেন?

বাহ্যত, হয়তো মনে হবে যে, ইসলাম মেয়েকে ছেলের অর্ধেক অংশ দিয়ে সমতাপূর্ণ ব্যবহার করেনি। কিন্তু কথাটা সঠিক নয়। গোটা সমস্যাটা সম্পর্কে যাদের পড়াশোনা ও ধারণা পূর্ণাঙ্গ নয় তারাই এ ধরনের কথা বলে থাকেন। একটু চিন্তা ভাবনা করলেই কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায় এটাতো জানা কথা যে, পুরুষকেই পরিবার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। পরিবার পরিজনের লালনপালন করার এবং তাদের ভালোমন্দ সবকিছু দেখাশোনা পুরুষই করে। নারীকে এ কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

এছাড়া পুরুষকে নারীর মোহর আদায় ও অন্যান্য দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়, বোনদের বিয়ে শাদী দিতে হয় এবং উপহার উপঢৌকনও পাঠাতে হয়। বিয়ের

পর স্ত্রীর ভরণপোষণের ভারটাও পুরুষের। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করাটাও পুরুষেরই কর্তব্য। অন্যদিকে বোনের ওপর ঐ ধরনের কোনো দায়িত্ব নেই, মাঝে মধ্যে বোন ভাইয়ের কাছ থেকে এটা ওটা পেয়ে থাকে। বোন তার বিয়ের পর স্বামীর মোহরও পায় এবং স্বামীর সম্পত্তিতে তার অংশ থাকে। অর্থাৎ বোন বাপের বাড়িতেও অংশ পায় এবং স্বামীর বাড়িতেও অংশ পায়। অন্যদিকে ভাই কেবল একদিকেই অংশ পায়। তাছাড়া বোনের কোনো দায়দায়িত্ব নেই অথচ ভাইকে সবকিছু দায়িত্ব বহন করতে হয়, প্রত্যেককেই কিছু না কিছু দিতে হয়। সন্তানাদির জন্মের পর ভাইয়ের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে নারীকে কোনো দায়িত্ব পালন করতে হয় না।

এসব দিক বিবেচনা করে দেখা যায় যে, সব ক্ষেত্রে সব দিকে সব রকমের দায়দায়িত্ব কেবল ভাইকেই পালন করতে হয়। যত পরিশ্রম যত সংগ্রাম সব ভাইকেই করতে হয়। সুতরাং এ গুরুদায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভাই যদি বোনের চেয়ে দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকে তাহলে সে খুব একটা বেশি পাচ্ছে তা নয়। অথচ বোন অর্থাৎ মেয়ে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাওয়ার সাথে সাথে স্বামীর কাছে আর্থিক ভরণপোষণ ইত্যাদি সব কিছুই পাচ্ছে। তাকে কারো কোনো আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতাও করতে হয় না। উভয়পক্ষ থেকে উপহারাদিও সেই পায়। এসব বাস্তবতার আলোকে প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তিই ইসলামের এ ব্যবস্থাকে সুষম ও ইনসাফভিত্তিক বলতে বাধ্য হবেন। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে যদি পুরুষকে নারীর তুলনায় বেশি অংশ না দেয়া হতো তাহলে তা পুরুষের ওপর বিরাট জুলুম বলেই গণ্য হতো। সুতরাং দায়িত্ব পালনের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের জন্যে নারীর দ্বিগুণ নির্ধারণ করে ইসলাম অত্যন্ত বাস্তব ভিত্তিক সুবিচারই করেছে।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আধুনিক যুগে যখন নারীও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজকর্ম করছে এবং বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছে আর উপার্জন করে ব্যয়ভার নির্বাহে সহযোগিতা করছে তাহলে এখনও কি পুরুষের অর্ধেকই অংশ পাবে? যুগের পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাই পুরুষ ও নারীর মধ্যে তরকার বন্টনেও পূর্ণ সমতা স্থাপন করা উচিত।

এ ধরনের প্রশ্ন ও মন্তব্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু প্রযোজ্য নয়। আসলে নারী আয়-উপার্জন করলেও দায়দায়িত্ব ঠিক আগের মতো এখনও পুরুষকেই পালন করতে হয়। নারী আগের মতো এখনো পিতৃগৃহ ও

স্বামীগৃহ থেকে সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকে, মোহর ও উপহারাদি পেয়ে থাকে এবং আজকাল সে যে আয় উপার্জন করে থাকে তাও সম্পূর্ণরূপে তারই অধিকারে থাকে। তার এ অর্জিত অর্থ সে কাউকে দিতে বা সে কোনো রকমের দায়িত্ব পালনে বাধ্য নয়। কিন্তু আগেকার যুগের মতো আজকের পুরুষকেও সবরকমের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। যুগ পাল্টালেও আসল অবস্থা ও ব্যবস্থার তেমন কোনোও পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং ইসলাম যে নীতি ও বিধি প্রবর্তন করেছে তা এখনো তেমনি কার্যকর থাকা বাঞ্ছনীয়।

আসল অবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ অবগতি না থাকার কারণেই কোনো কোনো বিভ্রান্ত লোক ইসলামী আইন বিধির সংশোধনের কথা বলে থাকেন এবং নারী পুরুষের পূর্ণ সমতার ওকালতি করেন। তারা প্রকৃতপক্ষে কথার মারপ্যাঁচে আটকে পড়েছেন। অবাস্তব যুক্তির গোলকধাঁধায় জড়িয়ে তারা আল্লাহর কুরআনের এ আয়াতের পরিপন্থী কথা বলেন যে–

"পুরুষ নারীর ওপর দায়িত্বশীল, এ ভিত্তিতে যে, আল্লাহ্ এদের মধ্যে প্রত্যেককে পরস্পরের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করে।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বিভ্রান্ত লোকেরা মনে করে যে, "যেহেতু নারী জীবনের সব দিক ও বিভাগে কাজ করতে শুরু করেছে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে আজ তারা পুরুষের মুখাপেক্ষী নয় বরং তারা আজ পুরুষকেই সাহায্য সহযোগিতা করছে। এ জন্য পুরুষকে দায়িত্বশীল মনে করার কোনো কারণ নেই এবং যে যুগে এই আয়াত নাযিল হয়েছে সে যুগ এখন নেই। তাই এই নীতি ও আইন এখন অবশ্যই বিলুপ্ত হওয়ার দরকার।" (নাউযুবিল্লাহ)

এ ধরনের কিছু প্রশ্নের জবাব আমরা একটু আগেই দিয়েছি। এখন আমরা আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির পর্যালোচনা করব। আসলে আধুনিক যুগে ইসলামী আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের আপত্তিতে কোনো যুক্তি নেই এবং তাদের প্রশ্ন ও আপত্তি বাস্তবতার আলোকে খুবই নিষ্প্রভ প্রমাণিত হয়।

আপত্তিকারীরা এটাতো স্থুল দৃষ্টিতে দেখতে পান যে, নারীরাও কাজ করছে! কিন্তু তাদের কাজের ধরন, তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা এবং তাদের কাজকর্মে নিয়োজিত থাকার আনুপাতিক হার এবং কাজের মান, গুরুত্ব কোনো পর্যায়ের ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নের জবাব নিতান্তই নৈরাশ্যব্যাঞ্জক। তারা যে সব কাজ করে

এবং যে সব কাজ করতে সক্ষম তা খুবই নগণ্য পর্যায়ের। তুলনামূলকভাবে খুবই গুরুত্বহীন। তাছাড়া তাদের স্বভাব ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে যেসব জটিলতা, আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির অংকটাই বড়। এর পরিণতিতে আধুনিক নারী উন্নত চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতা হয়ে পড়েছে।

স্বাভাবিক বিধিবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলে আধুনিক নারী তার আত্মমর্যাদা এবং সেই সম্মান থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়ছে যা সে মা ও স্ত্রী হিসেবে পেয়ে আসছিল, যে সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলাম তার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিল আজ সেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্জনের ফলে আধুনিক নারী গুরুত্বহীন এবং উপেক্ষিত জীবে পরিণত হচ্ছে। আজ আধুনিক নারী নিজেদের হঠকারিতার কারণে পুরুষের ভোগ্য ও পণ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে, কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে আজ তার ব্যক্তিত্ব ধুলোয় লুটোচ্ছে। বস্তুত, আধুনিক নারী আজ অভদ্র ও চরিত্রহীন পুরুষদের খেলা ও চিত্তবিনোদনের একটি তুচ্ছ মাধ্যমেই পরিণত হয়ে গেছে। ইসলাম আগের মতো এখনো এবং অনাগত ভবিষ্যতেও নারীর প্রকৃত মর্যাদা বহাল রাখতে চায়।

সুতরাং ইসলামী নীতি ও আইনের সংশোধনের প্রশ্ন করা অবান্তর। ইসলামী আইন ও নীতি ছাড়া নারী বা পুরুষ কারো অধিকার ও মর্যাদা বহাল থাকতে পারে না! বলাবাহুল্য ইসলাম গোটা বিশ্বমানবতার সর্বকালের শাশ্বত প্রয়োজন পূরণে। এ প্রয়োজন কোনো দিন কোনো যুগে শেষ হবে না।

কুরআনের বিধান ইসলামের সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীলতা রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তার স্পষ্টকরণ হিসেবেই নাযিল হয়েছে যা কোনো পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও তার স্থায়ীত্বের জন্য অপরিহার্য। অর্থাৎ পরিবারিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার জন্যে বুনিয়াদি নীতি অনুযায়ী পুরুষই হবে পরিবারের প্রধান দায়িত্বশীল। এটা একান্তভাবেই স্বভাবসম্মত বিধান। পুরুষই ঘরবাড়ি ও পরিবারের সব প্রয়োজন পূরণ করবে এবং এ ব্যাপারে পুরুষকেই সবার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এটাই আর তার অভ্যন্তরীণ অর্থ সেই মানসিক বিধির স্পষ্টকরণের দিকেই ইঙ্গিত বহন করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারী শিক্ষা

সন্তানের যাবতীয় ব্যয়ভার পিতার ওপর ন্যস্ত থাকবে। আর এ দায়িত্ব শুধু খাওয়ানো পরানো পর্যন্তই সীমিত থাকবে না, বরং সন্তানের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে নীতিতে-চরিত্রে আদর্শ মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলাও তার দায়িত্ব, যাতে করে তারা জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে যথার্থভাবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয়। যদি কোনো পিতা তার এ কর্তব্য পালনে কোনো রকমের অবহেলা করে তাহলে রাসূল ﷺ এর হাদীস অনুযায়ী তিনি অপরাধী হবেন।

নবী করীম ﷺ বলেছেন- "মানুষের পাপী হওয়ার জন্যে একথাই যথেষ্ট যে, যাদেরকে সে খাওয়ায় তাদেরকে নষ্ট করে দেয়।" অন্য এক বর্ণনা মতে যাদেরকে লালন পালন করে। (আবু দাউদ-নাসাঈ-হাকেম)

ইসলাম পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদের ভরণ-পোষণের ওপর এতো বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে যে তাকে আল্লাহর পথে ব্যয় থেকেও উত্তম বলে ঘোষণা করেছে। যেমন, প্রিয়নবী বলেছেন- "সবচেয়ে উত্তম দীনার (মুদ্রা) সে দীনার যা সে নিজের পরিবার পরিজন ও সন্তানদের জন্যে ব্যয় করে এবং সেই দীনার যা সে নিজের ঘোড়ায় চেপে আল্লাহ্ পথে জিহাদ করার জন্যে ব্যয় করে এবং সেই দীনার যা সে নিজের সাথীদের মধ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে।"(মুসলিম, তিরমিযী)

আবূ কালাবা এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন-

"যেহেতু হাদীসে সর্বপ্রথম পরিবার পরিজন ও সন্তানদের কথা বলা হয়েছে এজন্যে যারা নিজেদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের জন্যে ব্যয় করে 'আল্লাহ্ তাদের আয় উপার্জন করে তাদেরকে অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।"

পরিবার পরিজন তথা সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যয় করার উপকারিতা সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এ সম্পর্কে অল্প বিস্তর জ্ঞান সবারই থাকার কথা। সুতরাং আমরা আর বিস্তারিত উল্লেখ করছি না। এছাড়া প্রত্যেক মানুষ তার সন্তানদের জন্যে স্নেহ-ভালোবাসাবশতঃ ব্যয় করে থাকে। এ পথে যত দুঃখ-বিপদ ও সমস্যা আছে সে তা হাসিমুখে সহ্য করে, কারণ এর সম্পর্ক ব্যক্তির হৃদয় ও আবেগ অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত। হৃদয় ও আবেগের এ ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে সে সব সময় প্রস্তুত থাকে। এটা মানুষের স্বভাব। দুনিয়াতে এমন ব্যক্তি খুব কম পাওয়া যাবে যে তার স্বভাবের এ ডাকে সাড়া দেবে না। আর লাখের মধ্যে দু' একজন লোক পাওয়া গেলেও তারা হিসেবে পড়ে না। সুতরাং দেখা যায় যে, ব্যক্তি ধনী হোক বা দরিদ্র হোক সাধ্য অনুযায়ী নিজের পরিবার ও সন্তানের জন্যে ব্যয় নির্বাহ করে।

ছেলে-মেয়ে উভয়ের সমান গুরুত্ব

ইসলাম এসেছে অন্ধকার যুগের কঠিন বুক বিদীর্ণ করে। গভীর সমাচ্ছন্ন পরিবেশে স্নিগ্ধ আলোর শিখা হয়ে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে চারিদিকে। তখনো অন্ধযুগের ধ্বংসস্তূপ থেকে কখনো কখনো ধোঁয়ার কুণ্ডলি বের হতে থাকে। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিল অন্ধকারের আবছা-অবশেষ। এমনকি কোনো কোনো আলোকপ্রাপ্ত মুসলমানও অন্ধকারের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করতে পারেনি। তখনো অজ্ঞ লোকেরা কন্যা সন্তানের জন্মে দারুন দুঃখিত হয়ে পড়ত। তখন সারা দুনিয়ার মতো আরবের কাছেও মেয়ে বা নারীর কোনো মূল্য বা মর্যাদা ছিল না। মেয়ের জন্মে তারা যেমন নিরাশ ও মর্মাহত হয়ে পড়ত তেমনি ছেলের জন্মে তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠত। তারা অনেক সময় তাদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে স্বস্তির নি:শ্বাস নিত। ভেবে দেখুন, সে সময় সে পরিবেশে কন্যা সন্তানের জন্ম তাদের কাছে কতটা অবাঞ্ছনীয় ছিল।

সে যুগের লোকদের এ ঘৃণ্য মানসিকতার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে–

"আর যখন এদের মধ্যে কাউকে কন্যা সন্তান জন্মেছে বলে খবর দেয়া হয় তখন তার মুখে কালিমায় ছেয়ে যায় এবং সে বিষপান করার মতো হয়ে পড়ে। এ খবরে যে লজ্জার রেখাপাত করে তার কারণে লোকদের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়ায় আর ভাবে যে, আপমানের সাথে মেয়েকে রেখে দেবো, নাকি মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেবো? কি মন্দ সিদ্ধান্ত এসব লোক নিয়ে থাকে!' (সূরা নহল : আয়াত-৫৮-৫৯)

ইসলাম যুগ-যুগান্তরের প্রতিষ্ঠিত এসব বাতিল ধারণা ও বিভ্রান্তিকে সমূলে উৎখাত করে, মানুষের মন মগজকে কুসংস্কারের পঙ্কিল আবর্জনা থেকে পবিত্র করে, ঘরে-বাড়িতে নারীর স্থান ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করে, তার অধিকার ও দায়িত্ব বন্টন করে, মহাজীবনের অব্যাহত অভিযানে তাকেও সহগামিনীর সম্মান দেয়, পিতা, স্বামী এবং অন্যান্যদের ওপর তার অধিকার ঘোষণা করে, তার জন্যে সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার খুলে দেয়।

মেয়েদের এ অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ ঘোষণা করেন–

"যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিছু মেয়ে দান করেছেন, তারা যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তারা তাদের জন্যে জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে।" (বুখারী)

হাদীসে উল্লেখিত "উত্তম ব্যবহারের অর্থ হচ্ছে– তাদের উত্তমরূপে লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষা ও চারিত্রিক গুণাবলিতে উন্নত করে গড়ে তোলা যাতে জীবন সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে। বলাবাহুল্য, সত্যিকারের শিক্ষা ছাড়া তা সম্ভব নয়। এ শিক্ষাই নর-নারীকে যথার্থ মানুষ তথা সত্যিকারের মুসলমানে পরিণত করে।

সুতরাং অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ঘোষণা করেন–

"যার কাছে তিনটি বোন বা তিনটি মেয়ে আছে অথবা দুটি বোন বা দুটি মেয়ে আছে, আর সে যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে," (অন্য বর্ণনায়) "সে তাদের যদি আদব-কায়দা শেখায়, তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে, তাদের বিয়ে দেয় তাহলে তার জন্য জান্নাত রয়েছে।" (আবু দাউদ)

শুধু তাই নয়, ইসলাম নারীর হারানো অধিকার পুনর্বহাল করেছে, বরং তাকে ছেলের সমান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি অধিকার দিয়েছে। মেয়ে বা নারীকে কোনো ক্ষেত্রেই অবহেলা করার সুযোগ ইসলাম দেয় না, ইসলাম এমন পিতাকে, যে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছে তার জন্যে বিরাট পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছে।

তাই প্রিয়নবী বলেছেন–

"যার ঘরে মেয়ে রয়েছে এবং সে যদি তাদের কবরস্থ না করে, তাদের অপমান ও ঘৃণা না করে, নিজের ছেলেদেরকে তাদের ওপর অগ্রাধিকার না দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (আবু দাউদ)

ইসলামের এ শিক্ষা ও কর্মনীতিকে সামনে রাখুন এবং অতীত অন্ধকার যুগ ও আধুনিক অন্ধকার যুগের বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা করে নিরপেক্ষভাবে বলুন যে, নারীর সত্যিকার অধিকার ও মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে না, অন্য কোনো বাতিল মতবাদ দিয়েছে? ইসলাম ছেলে ও মেয়ের অধিকার ও দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে যে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুবিচারভিত্তিক ব্যবস্থা দিয়েছে তার কোনো তুলনা অন্য কোথাও দেখা যায় কি? বস্তুত শুধু ইসলামই ছেলেমেয়েকে সমান গুরুত্ব, একই মর্যাদা এবং সমতাভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নতির সবক্ষেত্র ইসলাম মেয়েদের জন্যেও উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

এরপরও কেউ যদি এটা মনে করে যে, নারীর অধিকার পুরুষের তুলনায় কম তাহলে সে ব্যক্তি জ্ঞানপাপী তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। কারণ তার এ ধারণা ইসলামের বাস্তব শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

জ্ঞান-শিক্ষা (ফরয) অপরিহার্য

ইসলামে জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্যে অবশ্য কর্তব্য (ফরয) ঘোষণা করা হয়েছে। ইবনে মাজায় অকাট্য প্রমাণের সাথে এ সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে–

"জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয।" (ইবনে মাজাহ)

(এ হাদীস সম্পর্কে ইরাকী তাঁর তাখরিজ আশ এহইয়া গ্রন্থে লিখেছেন, কোনো কোনো ইমাম এ হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতা নিখুঁত বলে মন্তব্য করেছেন।

নিখুঁত সহীহ্ হাদীসের কয়েকটি প্রধান শর্ত হচ্ছে–

১. অব্যাহত ধারাবাহিকতা অর্থাৎ মাঝখানে কোনো বর্ণনাকারী বাদ যাবে না।
২. বর্ণনাকারী সুবিচারক এবং চারিত্রিক ও নৈতিক গুণবলিতে নির্ভরযোগ্য হবেন।
৩. স্মরণশক্তি সম্পন্ন ও বিজ্ঞ হবেন।
৪. শুধু একটির নয় বরং কমপক্ষে কয়েকটি হাদীসের বর্ণনাকারী হবেন।
৫. কোনো রকমের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকবেন।

'প্রত্যেক মুসলমান' অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী। এ সম্পর্কে আলেম ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের কারো মতভেদ নেই। অর্থাৎ প্রতিটি মুসলিম নর-নারীকে কমপক্ষে এতটুকু শিক্ষা অবশ্যই অর্জন করতে হবে যেন তারা জীবনের মৌলিক জ্ঞান ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। "এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে যে, ছোট ছোট সন্তানের পেছনে এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করে যে, আল্লাহ যেন তাদের জীবনকে সার্বিকভাবে সুন্দর ও সততার গুণে সমৃদ্ধ করেন এবং তার মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে এবং কোনো ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষী থাকবে না।" বলাবাহুল্য, যারা সন্তানের জীবনের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে এবং উত্তম শিক্ষা ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্যে সাধ্যমত ব্যয় করে তারা সত্যই বড় ভাগ্যবান।

এতে করে বোঝা গেল যে, মাতা-পিতার কাছে সন্তানের অন্যান্য অনেক অধিকারের মতো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে, তারা শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে, তাদেরকে সত্যিকারের আদর্শ মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলবে। যদি কোনো কারণে পিতা তার সন্তানদের এ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার পূরণে অক্ষম হয় তাহলে পিতার এ দায়িত্ব সরাসরি সরকারের ওপর বর্তাবে। মুসলিম রাষ্ট্রের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করা সরকার ও জনগণের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কারণ উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়া মানব জীবনের কোনো অর্থই হয় না।

ইসলাম সমাজকে শান্তিময় ও কল্যাণমূলক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্যে জনগণের পাঁচটি মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয়। আর তা হচ্ছে

শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র, ও বাসস্থান। ইসলামের দৃষ্টিতে অন্ন-বস্ত্রের চেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে নৈতিক, চারিত্রিক অধঃপতনের সমস্যা। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে সৎ ও চরিত্রবান করে গড়ে তুললে অন্যান্য সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যায়। কারণ অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সাধারণত অসৎ লোভী লোকদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্টি হয়।

পুঁজিবাদী শোষক ও সমাজবাদী স্বার্থবাদীরা যদি জনতার অধিকার ও সমস্যা নিয়ে ছিনিমিন না খেলে তাহলে দুনিয়াতে কোনোদিন অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা দেখা দেবে না। তা ছাড়া অন্ন-বস্ত্র মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয় বরং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চলার জন্যে জীবন ধারণের মাধ্যম মাত্র। তাই ইসলাম বিশেষত সমাজকে সুসভ্য বানাতে চায় এবং মানুষকে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বুনিয়াদের ওপর আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। আর এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না মন-মগজকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার জন্যে প্রস্তুত করা হয়। এজন্যে ব্যক্তি, জনগণ ও সরকার যদি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে আদর্শ ও কল্যাণমূলক সমাজের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

ইসলাম এমন ধরনের তথাকথিত কোনো সরকারকে অস্বীকার করে যার কাজ হয় শুধু আইন প্রণয়ন করা আর কর উসূল করা। এর বিপরীত ইসলামী সরকার হবে সম্পূর্ণরূপে গণকল্যাণমুখী এবং জনগণের ঈমান আকীদা ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। ইসলামী সরকার এমন শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করবে যার মাধ্যমে জনগণের বৈষয়িক সমস্যাবলির সমাধানের সাথে সাথে নৈতিক ও চারিত্রিক মানও উন্নত হবে।

নবী করীম ﷺ বলেছেন, "আমাকে শিক্ষক করে পাঠানো হয়েছে।" অর্থাৎ তিনি গোটা বিশ্বমানবতার শিক্ষক। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান হলো জাতির প্রধান শিক্ষক। জনগণকে শিক্ষার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা তাঁর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তিনি এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন যার মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনমান উন্নত হবে এবং জনগণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি অর্জন করবে। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামী শিক্ষানীতি প্রণয়ন, প্রবর্তন করা ইসলামী রাষ্ট্রের ও সরকারের দায়িত্ব। যদি সরকার এ ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করে তাহলে তাকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। যে রাষ্ট্রের সরকার প্রধান ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বস্তবায়নে আগ্রহী নন, তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি নবী করীম ﷺ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নন।

নারীর শিক্ষাক্ষেত্র ও সীমা

ইসলাম নারীর ওপর যে বিরাট দয়া ও মহানুভবতা দেখিয়েছে তা সর্বজন স্বীকৃত। ইসলামের ঘোর সমালোচকরাও একথা স্বীকার করেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো ইসলাম নারীকে কোন ধরনের শিক্ষা দেয়? এর জবাবে প্রথম যে কথাটি বলা যায় এবং যে সম্পর্কে কারো কোনো মতভেদ নেই তা হলো, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষকে ভদ্র, নম্র, চরিত্রবান ও সু-শৃঙ্খল করে তোলা। শিক্ষা মানুষের মধ্যে দৃষ্টির গভীরতা ও ব্যাপকতা সৃষ্টি করে– যা তার জীবনের সব ক্ষেত্রে তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেবে। আর এ উদ্দেশ্য শুধু নারীর জন্যেই নির্দিষ্ট নয় বরং নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ইসলাম নারী ও পুরুষকে এক বিরাট দ্বীনি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আর এটাই মানব জীবনের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অন্য কথায় বলতে গেলে এ দ্বীনি দায়িত্বই হচ্ছে মানব জীবনের মূলভিত্তি। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে ইসলাম নর ও নারীর ওপর বিভিন্ন কর্তব্য স্থির করে দিয়েছে। যেমন আমরা আগেই বলেছি এসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের সম্পর্ক মানুষের আকীদা বিশ্বাস এবং কর্ম ও চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত। এ জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের মান এবং আল্লাহর আদেশ ও ইবাদতের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম থাকবে, নীতি ও বিশ্বাসের অর্থ না জানবে, সত্য ও মিথ্যার দর্শন না জানবে, সামাজিক জীবন যাপনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবগতি অর্জন না করবে এবং এটাই যদি না জানে যে সত্যিকারের শিক্ষাই তাকে সচেতন ও সজাগ মানুষে পরিণত করে, তাকে জীবন ও মহাপ্রকৃতির গোপন রহস্যাবলি সম্পর্কে অবহিত করে, জুলুম ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে তাকে মুক্তি ও আলোর পথে টেনে আনে তাহলে বুঝতে হবে সে অত্যন্ত অজ্ঞ ও অদূরদর্শী। এ ধরনের মানুষকে তার অজ্ঞতার পরিণতিতে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হবে।

এ ধরনের অজ্ঞতা থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ্ বলেন–

"হে ঈমানদার! নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।" (সূরা তাহরীম : আয়াত-২)

এ আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে নর ও নারী উভয়ই শামিল রয়েছে। বলাবাহুল্য, যারা আল্লাহ ও বান্দার অধিকার সম্পর্কে অবহিত নয় তারা নিজের এবং নিজের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে কেমন করে?

সুতরাং মানুষকে তার নিজের জন্যে, পরিবার পরিজনের জন্যে এবং গোটা সমাজের জন্যে জ্ঞান অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্যা থেকে মুক্তি অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে।

এভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে মজবুত ও স্থিতিশীল করার জন্যে আল্লাহ বলেছেন–

"নারীর যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি তার অধিকারও রয়েছে।"

এভাবে পুরুষেরও কিছু দায়িত্ব এবং কিছু অধিকার রয়েছে। এ দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকলেই স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন হবে শান্তিপূর্ণ। কিন্তু যদি সেই জ্ঞানই না থাকে তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবন কি সুখী-শান্তিপূর্ণ হতে পারে? একইভাবে নারীর ওপর পুরুষকে দায়িত্বশীল করা এবং নারীকে শান্তির প্রতীক ও উৎস হিসেবে ঘোষণা করার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক ও মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার জবাব স্পষ্ট হয়ে যায় এবং যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার মানসিক ও অনুভূতি জনিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন ব্যাপক ভূমিকা পালন করে এজন্যে এটাকেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একটি দ্বার বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এতে করে মানুষের চিন্তাধারার মধুময় অভিজ্ঞতা ও ব্যাপকতার সৃষ্টি হয় এবং এর মাধ্যমেই আল্লাহ নারী ও পুরুষের অধিকার সংরক্ষণের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

নবী করীম (সা) বলেছেন–

"নারী তার স্বামী গৃহের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

এ দায়িত্বের বিভিন্ন পর্যায় থাকতে পারে। যেমন, অর্থনৈতিক, শারীরিক, সামাজিক, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক পর্যায়। আমরা এখানে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পরিবর্তে শুধু পারিবারিক ব্যয়ভার সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি। কারণ আজকের যুগে এটাই মানুষের আসল দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এটা প্রত্যেক পরিবারের অন্যতম বুনিয়াদী সমস্যা।

প্রকৃতপক্ষে আদর্শ স্ত্রী তাকে বলা হয় যে অত্যন্ত মামুলি ধরনের মাসিক আয় দিয়ে নিজেদের ব্যয় বাজেট পূরণ করতে সক্ষম। এটা একটা স্বীকৃত নীতি। তবে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সুখী রাখার উদ্দেশ্যে স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধ জীবনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বরং বলতে হয় পারিবারিক জীবনকে শান্তিপূর্ণ, সহজ ও সুশৃঙ্খল রাখার জন্যে প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে পর্যাপ্ত আয়-উপার্জন। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে কখনো অভাব-অনটনে রাখতে নেই এবং প্রয়োজনবোধে কিছু বেশি টাকা দেয়াই ভালো যাতে সে সুন্দরভাবে পারিবারিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করতে

পারে। এ জন্যে পুরুষকে যথাসম্ভব বেশি করে হালাল আয় উপার্জনের চেষ্টা করতে হবে।

আরেকটি প্রশ্ন হলো স্ত্রী তার সন্তানদের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান কিভাবে করবে? এখানে লালন-পালন বলতে শুধু ভরণ-পোষণই বোঝায় না বরং সন্তানের মানসিক ও চারিত্রিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের কথাকেও বোঝায়। কেননা শিশু সন্তান নিজের ভালোমন্দ বোঝে না। এমতাবস্থায় তাকে কিভাবে কোন ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যাতে তারা মানসিক, নৈতিক ও চারিত্রিকভাবে শান্ত ও ভদ্র আদর্শ মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারেও সচেষ্ট হতে হবে।

নিঃসন্দেহে নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব তখন আরো অনেক বৃদ্ধি পায় যখন সে সন্তানদের আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও ইসলামী শিক্ষা দিয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মহান ব্রত গ্রহণ করে। এজন্যে নারীকে আগে থেকেই ইসলামের সামাজিক ও সর্বজনীন জ্ঞান অর্জন করা উচিত। যেমন ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত পড়াশোনা করা দরকার। এ ধরনের পড়াশোনা শুধু সখের জন্যেই করবে না বরং এর মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিত্ব গঠন করবে এবং নিজের সন্তানদের ব্যক্তিত্বও গড়ে তুলবে। মাকে বরং নিজের ব্যক্তিত্ব এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তাঁর সন্তান তার অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই সুসভ্য হয়ে ওঠে।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমরা আদর্শ মায়ের গুণাবলি আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমান বিষয়কে দীর্ঘায়িত করতে চাই না, কারণ এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পরিবারের প্রতিষ্ঠাকারী কর্তা হিসেবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে দু-একটি কথা বলার দরকার। কেননা, ইসলাম তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তার দাবি হচ্ছে সে তার সাধ্যমত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় লাভ করাবে এবং সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে তাকে এ দায়িত্ব পালনে সহায়তা ও সুযোগ সুবিধা দান করা। এক্ষেত্রে তার অধিকার সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা হয়েছে বিধায় এখানে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া একজন দায়িত্বশীল নারীর চিন্তাধারা এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা তার প্রভাব গ্রহণ করা ছাড়া থাকতে পারে না, কারণ দায়িত্ব অনুভূতির মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্বের অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। এ থেকে সে তার দায়িত্ব পালনের অনুপ্রেরণা পায়।

আর এ অনুভূতিই তার মর্যাদা ও গুরুত্বকে এতটা বাড়িয়ে দেয়। বস্তুত, এ অনুভূতিই মানব মানসিকতাকে সামগ্রিক প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং ব্যক্তিকে সচেতন ও সতর্ক রাখে, তার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সমস্যাবলির সব দিক ও বিভাগ নিয়ে বিচার বিবেচনা করতে সম্মত করে। আর এ অনুভূতিই মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে একটি মজবুত অবলম্বন এবং তার পূর্ণতা অর্জনের বুনিয়াদী উপাদান বলে প্রমাণিত হয়।

এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, প্রকৃতিই পুরুষ ও নারীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে নারী ও পুরুষকে আলাদা আলাদা গুণ-বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা দান করা। সুতরাং নর-নারীর শারীরিক গঠনে যে ব্যবধান রয়েছে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, পথ দুটোর মধ্যে কোনো পথটি সমাজের জন্যে অধিকতর উপকারী এবং স্বভাবসম্মত? তাকে কি সেই শিক্ষা দেয়া হবে, যার মাধ্যমে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুযায়ী জীবনযাপন করবে, না কি সেই শিক্ষা দেয়া হবে যা শিখে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বিরোধী পথ অবলম্বন করবে?

ইসলাম আমাদেরকে একথা বলে না যে, নারীরা জ্ঞানবুদ্ধি পুরুষের সমান নয়, অথবা একথাও মানি না যে, যেসব জ্ঞান ও কলাকৌশল কেবল পুরুষই শিখতে পারে, নারী শিখতে পারে না। এসব কোনো কথাই যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে আসল কথা এবং প্রকৃত সত্য এই যে, প্রকৃতিই কর্মক্ষেত্রের যে স্বাভাবিক বণ্টন করে রেখেছে সে অনুযায়ী কোনো জ্ঞান বা কোন প্রশিক্ষণটা কার জন্যে বেশি উপযুক্ত? এবং প্রকৃতি নারী ও পুরুষের মধ্যে যে দৈহিক ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে সে অনুযায়ী তাদের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের সীমা ভিন্ন হওয়া জরুরি কিনা?

আসলে নারীর সৃষ্টি-উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকে আদর্শ মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রাকৃতিক সত্যের উপরই আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। বলাবাহুল্য আল্লাহর সব পরিকল্পনারই একটি মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। মানবতার বৃহত্তর কল্যাণই সেই পরিকল্পনা উদ্দেশ্য। এজন্যে আমরা যদি নারীকে তার প্রকৃতির দাবি অনুযায়ী আসল শিক্ষা না দিই তাহলে অন্য শিক্ষার মাধ্যমে সে যা কিছুই হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে একজন আদর্শ নারী ও আদর্শ মা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ আদর্শ মা হওয়ার মধ্যেই নারীর প্রকৃত সার্থকতা নিহিত রয়েছে।

আজকের আধুনিক নারী কৃষি বিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান এবং কলা ও কৌশল বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করছে। এছাড়া সাহিত্য ও চিকিৎসার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও পুরুষের সাথে সমানতালে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এসব শিখে নারী হিসেবে তার কি উপকার বা কি উন্নতি হচ্ছে? পুরুষের কাজ করাই কি নারীর উন্নতির প্রমাণ। আসলে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে নারী তার নিজ কর্মক্ষেত্রের সীমা থেকেই বাদ পড়ে গেছে। পরিণতিতে নারী, নারী না থেকে কৃত্রিম পুরুষেই পরিণত হচ্ছে। এটাই যদি কেউ বাহাদুরী বলে মনে করে তাহলে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

আমরা অবশ্য এটা বলছি না যে, নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তার গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে। না তা নয়। আসলে নারী নিছক দেহসর্বস্ব কোনো বস্তু নয়; বরং নারীত্বের আধ্যাত্মিক মান ও বিধিই হচ্ছে তার আসল জিনিস। এটা এক ধরনের স্বাভাবিক গুণ ও ক্ষমতারই নামান্তর। এই মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মানসিকতা পরস্পর থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে। একজনের মনমেজাজ অন্যজনের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। আর এসব কিছু এজন্যেই যে তা জীবনের কর্মক্ষেত্রে নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য যেন যথার্থভাবে পালন করতে পারে। এটাই সেই বিশেষ কথা যা নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সময় লক্ষ্য রাখতে হয়। যদি সে ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা হয় তাহলে তার নারীত্বের ক্ষমতা ও গুণাবলি নষ্ট হয়ে যাবে বরং সে অবাঞ্ছিত নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

নারী শুধু নারী হয়ে থেকেই তার উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে পারে। এর পরিবর্তে নারী যদি পুরুষ হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে নিজেই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করবে। নারী হয়তো কারো স্ত্রী হবে অথবা মা। কারণ এটাই তার স্বভাব। নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে যতই উন্নতি অর্জন করুক না কেন কখনো তার স্বভাব পরির্তন করতে পারবে না। আর পুরষের জন্যেও এটাই উত্তম যে, তারা যেন নারী হিসেবে তার নিজ ক্ষেত্রে মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার সুযোগ প্রদান করে। পুরুষ যদি নারীকে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র থেকে টেনে বের করে আনে এবং নারীর স্বাভাবিক নীতি ও বিধির বিরুদ্ধে পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করে তাহলে সামাজিক শান্তি, সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা বিপন্ন হতে বাধ্য। সুতরাং নারীকে সত্যিকারের চরিত্রবান ও আদর্শ নারী হিসেবে, আদর্শ মা

ও স্ত্রী হিসেবে পেতে হলে তার স্বভাব দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। এর মধ্যে নর-নারী সকলের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

অবস্থা ও পরিবেশের তাগিদে নারী যদি ডাক্তার, শিক্ষয়িত্রী পেশা অবলম্বন করে তাতে কোনো বাধা নেই বরং ইসলামী নীতির আলোকে নারীর ডাক্তার নারী হবে এবং নারীর শিক্ষক নারী হবে এটাই অধিকতর কল্যাণকর। এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গণিত, ভূগোল, প্রকৌশল ইত্যাদি বিষয়াদিতেও নারী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তবে এসব অবলম্বন করতে গিয়ে তার নারীত্বের যেন হানি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোট কথা নারী হিসেবে নারীর জন্যে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই নারী দখলে রাখবে।

ইসলাম নারীর জন্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো বিষয়কেই নিষিদ্ধ করেনি। ইসলাম নর ও নারী উভয়ের জন্যেই জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু কোন জ্ঞানটা নারীর স্বভাবসম্মত এবং নারীর জন্যে প্রয়োজনীয় তা তাকে স্থির করে নিতে হবে। যা তাদের জন্যে কল্যাণকর ও তাদের পক্ষে সহজ সেই জ্ঞান তাদের অর্জন করতে হবে। যে জ্ঞান পুরুষের স্বভাব ও ক্ষমতা অনুযায়ী এবং তাদের জন্যে উপযুক্ত পুরুষ তা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে কেউ কারো সীমালঙ্ঘন করবে না। এটা প্রাকৃতিক আইনের একটি অংশ। কোনো বিষয়ের বৈধতা ও অবৈধতার ক্ষেত্রে এ আইন প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি গভীর দৃষ্টিকোণ নিয়ে নারীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলে সে বুঝতে এবং জানতে পারবে যে, নারীর শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও গুণাবলি কি হওয়ার উচিত। তার পরিবর্তে আমরা যদি অন্ধ, বধির ও বোবার মতো শুধু ইউরোপ আমেরিকার ঘূণেধরা সমাজ ব্যবস্থাকেই নিজেদের অনুসরণীয় আদর্শ বানিয়ে থাকি এবং বিবেকহীনের মতো যাচাই-বাছাই না করে তাদের অনুকরণ করে থাকি তাহলে তার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হবে তার পূর্বাভাস ইতিমধ্যেই আমরা পেতে শুরু করেছি। অবশ্য ভুল শোধরাবার সময় এখনো আমাদের হাতে রয়েছে। সুতরাং আমরা যদি এখন ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার আপন ইসলামী আদর্শের অনুসরণ করতে শুরু না করি তাহলে তা আমাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও অপমানজনক ফলাফল বয়ে আনবে; আমাদের বর্তমান উদাসীনতা অত্যন্ত ভীতিকর প্রমাণিত হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহিলাদের চাকরি

মহিলাদের চাকরির কারণে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নানা রকমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘ (UNO) পুরুষ ও নারীদের একই কাজের জন্যে সমান বেতন নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছে। স্বয়ং ইউরোপ আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশেষজ্ঞরাই নারী-পুরুষের পারিশ্রমিক বা বেতনের সমতার ঘোর বিরোধী। তারা নারী-পুরুষের সম বেতনের ফলে মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি হবে বলে যুক্তি প্রদর্শন করছেন।

আজ পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং আইনবিদরা সর্বসম্মতভাবে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, নারী শুধু সেই কাজের জন্যেই উপযুক্ত যা তার স্বভাব ও মানসিকতার অনুকূল। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে প্রাকৃতিক ব্যবধান রয়েছে তার সীমালঙ্ঘন করা হচ্ছে বলেই আজকের সমাজ অবনতশীলতার চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এবং নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের অভাব ঘটছে।

আজ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের দেশগুলোতে এমনকি পাশ্চাত্যের অনুসরণকারী মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্যের বীভৎস আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে। ফলে এসব দেশগুলোতেও যেসব কুৎসিত সামাজিক ব্যাধি শুরু হয়েছে– যার যন্ত্রণায় গোটা পাশ্চাত্য সমাজ ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার তুলছে। আমাদের সমাজেও যদি পাশ্চাত্যের এ অন্ধ অনুকরণ অব্যাহত থাকে তাহলে আমরাও যে পাশ্চাত্যের মতো কঠিন সমস্যাবলির জটিলতায় জড়িয়ে পড়ব তাতে সন্দেহ কী?

আমরা এখানো বাস্তব ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের চাকরি সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই এবং এটাও দেখিয়ে দিতে চাই যে, আধুনিক সমস্যাসমূহের মূল কারণ কী এবং পাশ্চাত্য সমাজে এর কী মারাত্মক কুফল দেখা দিয়েছে।

এ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমরা পাশ্চাত্যের অন্ধানুসারী তথাকথিত নারীমুক্তি আন্দোলনের জ্ঞানপাপীদের জিজ্ঞেস করতে চাই যে– আজ কোন সমস্যাটা দেখা দিয়েছে যার পেরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের চাকরি করাটা এতবেশি জরুরি মনে করা হচ্ছে? অথচ এর আগে এমন কোনো সমস্যা ছিল না। তাহলে, হঠাৎ করে এরা কেন এত চেঁচামেচি শুরু করে দিচ্ছেন যে, মহিলাদেরকে তাদের আসল কর্মক্ষেত্র ছেড়ে চাকরির জন্যে বেরিয়ে পড়তে হবে?

এ প্রশ্নের জবাবে তাঁরা সাধারণত নিম্নলিখিত জবাব ও যুক্তি পেশ করার চেষ্টা করেন–

ক. চাকরির ফলে মহিলাদের চিন্তা ও মানসিকতার সম্প্রসারণ হয় তার ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে এবং সে ধৈর্যসাপেক্ষ একাকীত্বের বিরক্তি থেকে রক্ষা পায়। চাকরি না করলে সে ঘরের চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ত।

খ. কোনো জাতির উন্নতির চাবিকাঠি এই যে, তার মধ্যে কর্মক্ষমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু মহিলা জনগণের অর্ধাংশ, সুতরাং তাদেরকে যদি আমরা জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় শামিল না করি তাহলে যথার্থভাবে আমরা উন্নত হতে পারব না।

গ. তৃতীয় উপকার এই যে, তাতে করে সে নিজ দায়িত্বশীলের সহায়তা করতে পারে এবং যদি তার কোনো দায়িত্বশীল নাও থাকে তাহলে অন্ততঃ সে নিজেই নিজের ভরণপোষণের ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। এমনও হতে পারে যে, সে বিধবা এবং ছোট ছোট সন্তানদের লালন-পালনের জন্যে তাকে চাকরির জন্যে বাইরে বের হতে হয়। এছাড়া একজন মানুষ হিসেবে তারও কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে; এ জন্যে তার একটা নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে সে আপন চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং অন্যের ওপর বোঝা হয়ে না থেকে নিজ আত্মমর্যাদা রক্ষার তাগিদে আয় উপার্জনের জন্যে তাকে বাইরে বের হতে হয়।

এ হলো মহিলাদের চাকরিকরণ সমর্থকদের যুক্তি। এখন আসুন আমরা এসব যুক্তির বৈধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করে দেখি যে, এসব যুক্তিকতা যুক্তিযুক্ত। আমরা আগেই বলেছি যে, আমরা সব রকমের বৈষম্যে বা পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কথাগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করব। আমরা কুরআনী যুক্তি-প্রমাণ এবং জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই আলোচনা পেশ করব।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

বাইরে বের হলে যে নারীর চিন্তা ও মানসিকতার ব্যাপকতা আসে তা সঠিক, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। মহিলারা চিন্তা ও মানসিকতার ক্ষেত্রে আরো বেশি উন্নত হোক– আমরা তা কামনা করি।

কিন্তু যারা একথা পেশ করেছেন আসলে তাদের যুক্তির বুনিয়াদ হচ্ছে দূর অতীতের অন্ধকার সমাজ– যার প্রভাব এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। অথচ এর কারণ হচ্ছে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ ইসলাম কর্তব্য

সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা এবং নীতি, নৈতিকতা, ভদ্রতা-সভ্যতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলির ব্যাপারে তাদের চরম উদাসীনতা। এ কারণেই তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও আচার-ব্যবহারের উন্নতি হয়নি। তারা জীবনের মূল্যবোধ এবং তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত নয়। এ কারণে তারা ঘরে বাইরের যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো কাজে দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার ফলেই তাদের জীবন সংকীর্ণতা ও পশ্চাদপদতার শিকারে পরিণত হয়েছে। এমনকি তারা এতো অধঃপতিত হয়ে পড়েছে যে, নিজেদের গুরুত্ব ও মর্যাদাও তারা ভুলতে বসেছে। আজ তারা মূর্খতার কারণে এটা মনে করে বসেছে যে– গৃহস্থালির কাজকর্ম করা এবং সন্তান প্রসব ছাড়া যেন তাদের আর কোনো দায়িত্বই নেই। ইসলাম তাদেরকে যে মহৎ ও মহান উদ্দেশ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করেছিল– মূর্খতাবশত আজ তারা সেই দিক ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এভাবে তাদের মনমানসিকতা অবনতির অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

আমরা ইতিপূর্বের এক আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, দাম্পত্য সম্পর্কের যৌন দিকটাই মুখ্য নয় বরং তার আধ্যাত্মিক সম্পর্কটাই হলো মুখ্য বিষয়। এ আধ্যাত্মিকতার ফসল হচ্ছে প্রেম-প্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষা; এর চেয়েও বড় ফসল হিসেবে পরিলক্ষিত হয় গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, সন্তানের দুধ পান করানো ইত্যাদি। এসব আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য মাধ্যমেই আল্লাহ্ তার সন্তানকে এক আদর্শ দান করেন। ফলে সন্তান পিতা-মাতার অনুগত ও ভক্ত থাকে, পিতা-মাতার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

এসব সন্তান সঠিক অর্থে জীবনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত হয়ে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করে। এ হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিকতা যার মাধ্যমে সন্তান বড় হয়ে পিতা-মাতার আদেশ নিষেধ মেনে চলে এবং তাদের সেবা করে সন্তুষ্ট হয়। আর এটাই হচ্ছে সেই ভিত্তি যার ওপর আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব-সম্প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক মজবুত ও স্থিতিশীলতা অর্জন করে। আমরা ইতিপূর্বে এটাও বলেছি যে, দাম্পত্য বিধি এবং সন্তান ও মাতা-পিতার মধ্যেকার সম্পর্কের উপকারিতা কেবল তখন অর্জিত হবে যখন এর শর্তাবলি পূরণ করা হবে। (এসব শর্তাবলি সম্পর্কে আমরা এ গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। দরকারবশত: তা পুনঃ অধ্যয়নের অনুরোধ করব।)

আমরা এটাও বলেছি যে, জ্ঞানার্জন নারীদের জন্যে কেবল এক অধিকারই নয় বরং অন্যতম কর্তব্যও এবং তাদেরকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাটা পরিবার তথা গোটা সমাজ তথা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর তারা সেই শিক্ষা অর্জন করবে যাতে তাদের মনে উদারতা এবং বিবেক-বুদ্ধিতে নিজেদেরকে সমৃদ্ধশালী

করবে, জীবনের সাধারণ বিষয়াবলিতে ভদ্রতা ও সততার স্ফুরণ ঘটবে, দাম্পত্য সম্পর্কের আধ্যাত্মিক ও সামষ্টিক উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে এবং এর জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজ ও সরকারে মৌলিক কর্তব্য। নারীজীতি যাতে সামগ্রিকভাবে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে নিজ কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে, তাদের ব্যক্তিত্বে যাতে পূর্ণ মানবিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে, যাতে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে সে জন্যে তাদেরকে পুরোপুরি অবকাশ দিতে হবে।

আর এসব শর্ত পূরণের জন্যে ইসলাম নারীকে যেসব গুণাবলিতে ভূষিত দেখতে চায় সেসব বিষয়াদি সম্পর্কে আমরা আগেই স্পষ্ট করেছি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুসলিম মহিলাদেরকে যদি ইসলামের নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী অধিকার, মর্যাদা দেয়া হয় তাহলে আজকের মুসলিম নারী যথার্থ অর্থে দুনিয়াতে আদর্শ নারীর সর্বোচ্চ সম্মানের আসন লাভ করতে সক্ষম। ইসলামী শিক্ষা ও শর্ত অনুসরণ করে তারা দুনিয়ার অন্যান্য বিভ্রান্ত ও অধিকারবঞ্চিত নারীদের সামনে সত্যিকারের স্বাধীন ও মর্যাদাপ্রাপ্তা নারীর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম।

ইসলামী আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমেই নারী তার নারীত্বের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারে। এভাবেই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বকীয় স্বতন্ত্র ও ক্ষমতার প্রমাণ পেশ করতে পারে এবং তারা ঘরে ও বাইরের জগতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের বাস্তব উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

সুতরাং আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আমরা যদি সত্যি সত্যিই নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করতে চাই, তার মনে উদারতা আনতে চাই, চাই যদি তাকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে টেনে আনতে, যদি তাকে জীবনের প্রকৃত সফলতা পথে তুলে ধরতে চাই তাহলে ইসলামের চিরন্তন সজীব নীতির অনুসরণ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প উপায় নেই। আমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার লাঞ্ছিত-বঞ্চিত নারী জাতিকে সত্যিকারের সম্মান, স্বাধীনতা ও অধিকার দেয়ার স্বপ্ন কেবল তখনই সার্থক হবে যখন আমরা সত্যিকারের অর্থে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের অনুকরণ করব। বস্তুত, আমাদের পূর্বসূরী সংস্কারক ও চিন্তাবিদগণ এ স্বপ্নই দেখে গেছেন।

তবে হ্যাঁ, নারী তার ঘর সংসার ছেড়ে কলকারখানায়, ব্যাংকে, আর এখানে-সেখানে দৌড়াদৌড়ি করুক এটা কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই কামনা করতে পারে না। তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করা হবে তাদেরই স্বভাবের

আলোকে। সেখানে পুরুষের অবস্থা নিয়ে নারীদের ব্যবস্থা করতে যাওয়া ঠিক হবে না। আর ইসলাম যেহেতু নারীর মর্যাদা ও স্বভাবের অনুকূলে থেকে তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করার নিশ্চিত উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে তাই তার অনুসরণ করে সাফল্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করা উচিত।

এছাড়া অন্যান্য উপায় ও ব্যবস্থা নারীকে তার স্বভাবের গণ্ডি থেকে জবরদস্তি টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্ম ও আধুনিক মতবাদগুলোর মধ্যে শুধু ইসলামই নারীর জন্যে জ্ঞান অর্জনকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম নারীকে শিক্ষা-দীক্ষায়, নীতিতে, চরিত্রে, বিবেক-বুদ্ধিতে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদে এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্য বা ব্যবস্থা নেই। এ বাস্তবতা সম্পর্কে কারো কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না।

ইসলামী সমাজে সংস্কারমূলক তৎপরতায় অংশ নেয়ার পুরো অধিকারই নারীর রয়েছে। ইসলামী সমাজের নারী বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে সমালোচনা এবং পরামর্শ দিতে পারে এবং যে কোনো সামাজিক, সংস্কারমূলক ও রাজনৈতিক সংগঠনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে উপযুক্ত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা তাকে জীবনের মহত্তম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে; তার ব্যক্তিত্বকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ করে, সে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝে নিতে পারে। বস্তুত, ইসলামী শিক্ষা তার মন ও চিন্তাকে করে উদার ও সম্প্রসারিত। এর মাধ্যমে নারী পরিণত হয় আদর্শ নারীতে। কলকারখানায় আর পথে-ঘাটে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে নারী তার এ ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না।

বলুন তো, কলকারখানায় লোহালক্কড় টানাটানি করে, দোকানে সেলস গার্লস হিসেবে সওদাপাতির মোড়ক বেঁধে, নোংরা ফ্যাশন বিলাসিতায় পড়ে উত্তেজক পোশাক পরে পথে-ঘাটে দেহ-প্রদর্শনী করে বেড়ালে, সিনেমা-থিয়েটারে-ক্লাবে অসৎ পুরুষদের ভোগ ও খেলার পাত্রী হয়ে থাকার মাধ্যমে কি নারী তার অধিকার, মর্যাদা অর্জন করতে পারে? বলুন এসব অস্বাভাবিক ও ভ্রান্ত পথে চলে নারী কি আজ পর্যন্ত তার কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে? ভোগ বিলাসী পুরুষদের অবৈধ আনন্দের মাধ্যমে আর পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন সেজে নারী কি যথার্থ মুক্তি পেয়েছে? আর এসব পঙ্কিল ও ঘৃণ্য পথে কি নারীরা আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠবে? এভাবে কখনো কি তাদের সমস্যার কোনো সমাধান হবে?

আসলে নারী যদি তার স্বামীর গৃহ পরিসরের কর্ত্রী, তার ধন-সম্পত্তির রক্ষাকারিণী, তার বিষয়াবলির তত্ত্বাবধায়িকা এবং দাম্পত্য সম্পর্ক ও মাতৃত্বের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে আন্তরিকভাবে যত্নশীল হয় এবং তার সব জ্ঞান-বুদ্ধি ও সময় যদি এসব দিকেই মনোনিবেশ হয় তাহলে নারীর কল্যাণ আশা করা যেতে পারে। হয়তো আমাদের এই অভিমতের সাথে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করবেন। হয়তো মনে করতে পারেন যে, এটা শুধু আমাদের মতামত। কিন্তু না, শুধু আমাদেরই একথা নয়; বরং আধুনিকতার স্বর্গরাজ্য আমেরিকার এক আধুনিকা মহিলারই একটি অভিমতও আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে যা বলেছেন তাকে 'নারী বিরোধী' বা 'প্রতিক্রিয়াশীলতা' বলে উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। তিনি শুধু একজন মার্কিন আধুনিকাই নন বরং বিখ্যাত মহিলা সাহিত্যিকও। তার নাম ফিল্স মাক্জেনিলী। তিনি 'নারী গৃহের সম্রাজ্ঞী' নামক শীর্ষক পুস্তকের এক প্রশ্নের জবাবে যা বলেছেন তা প্রশ্ন ও জবাবসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন হচ্ছে- "আমাদের নারীদের মুক্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর পর এখন কি ওখান থেকে ফিরে আসা উচিত? আর যদি এখন আমরা আবার ঘরে ফিরে চলি তাহলে সেটা আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচার হবে না?

এর জবাবে ফিল্স মাকজেনিলী বলেন, "আমি এ সমস্যা সম্পর্কে একটি মজবুত অভিমত পোষণ করি এবং আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকি যে, গৃহের সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকার অধিকার নারীর রয়েছে। আমি তার গুরুত্ব, মর্যাদা অনুমান করতে পারি, যা নারী মানবতার মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যে আদায় করে থাকে এবং আমি তাকে মানব জীবনে ও তার উন্নতির জন্যে পর্যাপ্ত মনে করি।"

মার্কিন আধুনিকাদের এ প্রতিনিধি সাহিত্যিকের মতামতে তাঁর নারীত্ব-উপলব্ধি পাওয়া যায়। তিনি বলেন- "আমরা নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব?" এ প্রশ্ন শোনার পর তিনি বলেন, "আমি সেই গুরুত্বের অনুমান করতে পারি যা সে মানবতার কল্যাণের জন্যে করে থাকে।"

এসব কথা বলছেন অন্য কেউ না স্বয়ং পাশ্চাত্য সমাজের প্রতিনিধি একজন আমেরিকান মহিলা যেখানে মেয়েদের ঘরের বাইরে এখানে সেখানে চাকরি-বাকরী করা একটা সাধারণ ব্যাপার। এ জন্যে তাঁর কথায় অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার স্বরূপ স্পষ্ট। সুতরাং তিনি যখন বলেছেন যে, মানব জীবন ও তার আসল উন্নতির জন্যে নারীর পক্ষে 'গৃহের সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকাটা অত্যন্ত জরুরি।'

তার এ মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতার এ স্বীকৃতি ও সমর্থনের পর এ সমস্যা নিয়ে আরো দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ থাকে না। কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সমাজের উন্নতি ও জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে নারীকে সংস্কারমূলক এবং রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এর জন্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে, সে এর জন্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে ইসলামী শিক্ষার আলোকে গড়ে তুলবে। এটা নারীর চিন্তা ও মানসিক অগ্রগতির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জাতির উন্নতি

জাতির উন্নতির চাবিকাঠি কর্মশীল লোকদের সংখ্যাধিক্যের ওপর নির্ভরশীল যেহেতু নারী মোট জনসংখ্যার অর্ধেক তাই তাকে জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে না দিলে যথার্থ উন্নতি অর্জন সম্ভব নয়। আমাদের মতে, এটাও ঠিক কথা। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, জাতীয় উন্নতির দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি যাতে তার আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নীতি ও মূল্যবোধ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। আর উন্নতির অন্য দিকটি হচ্ছে বৈষয়িক– যাতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক শক্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে জাতি উভয় ক্ষেত্রে উন্নতি অর্জন করবে, প্রকৃতপক্ষে তাকেই কেবল উন্নত জাতি বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সেই জাতির লোক সৎ ও সাহসী হবে, তাদের উদ্দেশ্য হবে মহৎ এবং তাদের কাছে থাকবে সরকার ও প্রশাসন পরিচালনার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা। এটা হচ্ছে সেই মৌলিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য যা যে কোনো জাতির জন্য সত্যিকার অর্থেই অপরিহার্য্য।

ইসলাম এসব গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যের ওপরই সত্যিকারের উন্নত জাতি গঠনের নিশ্চয়তা বিধান করে। অর্থাৎ শুধু একমুখী উন্নতিকে উন্নতি বলা যাবে না। যেমন, কেবল বৈষয়িক উন্নতিই যথেষ্ট নয়– তার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতিও অপরিহার্য। এ জন্যেই ইসলামকে মানবতার জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ বলা হয়েছে। ইসলাম যেমন একদিকে বলে যে, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তেমনি অন্যদিকে বলা হচ্ছে, "এবং যতটুকু সম্ভব সাধ্যমত বেশি বেশি শক্তি সঞ্চয় কর।" (আল কুরআন) অর্থাৎ সব ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে– কখনো সীমালঙ্ঘন করবে না এবং তোমাদের কাছে পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র এবং একটি স্থায়ী সামরিক বাহিনী সব সময় প্রস্তুত থাকবে যেন শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে সময়মত সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

নিজেদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নারী ও পুরুষ উভয়কেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইসলাম নারী ও পুরুষকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কারমূলক ক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব অর্পণ করেছে এবং তাদেরকে নিজ নিজ

দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তবে উভয়কে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের গণ্ডিতে থেকে। জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্বভাবের তাগিদও এটাই। পুরুষের স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যে পরিবার-পরিজনের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা শামিল রয়েছে আর নারীর স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যে ঘর ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বধান করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ কাজ যথেষ্ট কঠিন কষ্ট সাধ্য, কিন্তু ফলাফলের দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং পবিত্রতার। এছাড়া প্রাকৃতিকভাবেও নারীর ওপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে, যেমন গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, দুধ খাওয়ানো এবং সন্তানের নৈতিক প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি নারীরই দায়িত্ব। স্বামীকে ভালোবাসা দেয়া, তাকে সেবা করা, সন্তানকে মাতৃস্নেহ দান করা ইত্যাদিও নারীর দায়িত্ব। বৈষয়িক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে স্নেহ ভালোবাসা ও সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশ করাও নারীরই স্বভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব দায়িত্ব নিজ নিজ ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই অর্থবহ। এসব দায়িত্ব পালনে নারীকে তার সব জ্ঞানবুদ্ধি, প্রতিভা, দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে।

নারীর স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী তার ক্ষমতা ও আগ্রহকে সামনে রেখে আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর এসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। নারীর এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মধ্যেই সমাজের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করছে। উপরে বর্ণিত দায়িত্বসমূহ সুষ্ঠুভাবে পালন করেই নারী তার অধিকার ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারে। কিন্তু যদি এর মধ্যে কোনো একটি ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা হয় তাহলে সমাজ তথা জাতীয় উন্নতি বিঘ্নিত হয়ে পড়বে এবং নারী যখন তার আসল দায়িত্ব অবহেলা করে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তখন সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিভিন্ন জটিল দেখা দেয়।

আর এরই পরিণতিতে নারী নির্যাতন, অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও বেকারত্বের মতো মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়। কারণ জনগণের শতকরা পঞ্চাশ শতাংশই যদি তাদের নিজ কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অপর পঞ্চাশ ভাগের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তাহলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। জাতির উন্নতির জন্যে অধিকাংশ লোক অজ্ঞতাবশত: মনে করেন, ইসলামী সমাজে নারীরা একটি অবশ অঙ্গের মতোই হয়ে থাকে এবং পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে তার ভূমিকা পালনের কোনো অবকাশ থাকে না। তারা আবার এটাও মনে করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নারী কলকারখানায়, অফিসে, আদালতে অর্থাৎ বাইরের কোনো কাজের মাধ্যমে আয় উপার্জন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত নারীকে কর্মী বলা যাবে না। অর্থাৎ বাইরে না বের না হলে সে বেকার বলে গণ্য হবে।

হতে পারে তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় তাদের কথাই ঠিক। সম্ভবতঃ এ ধরনের লোকেরা পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণ করতে গিয়েই এসব কথা বলে থাকেন। কিন্তু একথা কে অস্বীকার করবে যে, জীবনের উদ্দেশ্য নিজের প্রকৃতি এবং নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত না থাকাটাই হচ্ছে নারীর আসল অজ্ঞতা? আর সবচেয়ে বড় মূর্খতা এই যে, সে তার পরিবার ও পরিবেশ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে জানবে না, কিভাবে স্বামীর সাথে মিলেমিশে সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করতে হবে– তা জানবে না। এটা হবে নারীর সবচেয়ে বড় অযোগ্যতার পরিচয়।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে মুক্তির স্বঘোষিত চ্যাম্পিয়নরা এটাও মনে করেন যে, ঘর বাড়ির সীমানায় কর্মশীল নারীর কোনো মান মর্যাদা থাকে না; ঘরে থাকে বলে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না। কিন্তু এরাই যখন বাইরে বের হয় তখন নারী সমাজের বিরাট উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জিত হয়– তা সে কোনো কাজ করুক বা না করুক। অর্থাৎ তাদের মতে মহিলাদের ঘরের বাইরে বের হওয়াটাই প্রগতির ইঙ্গিত। আজব কথাই বটে। এ সম্পর্কে আমাদের অভিমতকে বাস্তবতার আলোকে পেশ করতে চাই। ধারাবাহিকভাবে আমাদের অভিমতকে নিচে তুলে ধরছি।

বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী আদর্শের অনুসরণে নারী যখন শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করবে, নিজের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেদের কর্মসীমায় ওসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে তখন তাদেরক কোনো অর্থেই বেকার বলা যাবে না। আমরা আগেই বলেছি যে, সমাজের যথার্থ উন্নতি সাধন করতে হলে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উন্নতিই দরকার। এর মধ্যে পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে আয়-উপার্জন করে পরিবার পরিজনের জীবিকার ব্যবস্থা করা এবং এখানেই নারী ও পুরুষের নিজ নিজ কর্মসীমা বিভক্ত হয়ে পড়ে। মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির স্বার্থে এ স্বাভাবিক বিভক্তি একান্তই অপরিহার্য। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কর্মরত কোনো নারী বা পুরুষকে কোনো অর্থেই বেকার বলা যেতে পারে না। তদুপরি আমরা যখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের কর্মক্ষেত্রে আনীত দায়িত্বসমূহের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই যে, পুরুষের তুলনায় নারীর দায়িত্বটাই অধিকতর কঠিন ও ধৈর্যসাপেক্ষ।

এছাড়া নারীর কাজ পুরুষের কাজের তুলনায় অধিকতর আন্তরিকতা ও মহৎ মননশীতার দাবিদার। আর যদি কেউ বলে যে, গৃহস্থালী কাজকর্মের সম্পাদন, স্বামীর সেবা, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, স্তনদান, তাদেরকে উপযুক্ত মানুষ ও তথা সত্যিকারের মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাজ কোনো কাজই নয় এবং এসব কাজকর্মের কোনো মূল্য বা গুরুত্বই নেই, –তাহলে এ ধরনের অভিমত পোষণকারী ব্যক্তিকে অন্ধ, বধির ও অসুস্থ বিবেকধারী ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে।

নারী তাদের দৈনন্দিন জীবনে অতি সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যে যেসব কাজকর্ম করে থাকে, সেসব কাজ যদি পুরুষকে পালন করতে বলা হয় তাহলে সেখানে শতকরা একশ জন পুরুষই অপারগতা প্রকাশ করতে বাধ্য হবে। এরপর এসব লোকেরা যারা নারীদের কর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান ও গুরুত্বহীন মনে করে তাদের বোধোদয় ঘটবে যে, নিজ কর্মক্ষেত্রে নারীর গুরুত্ব কত বেশি।

নারী যদি তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অর্থাৎ নিজ গৃহের তত্ত্বাবধান, সাংসারিক সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা কায়েম, স্বামীকে সেবা, সহযোগিতা ও ভালোবাসা দান, সন্তানের লালন-পালন ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ দান, আদর-স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন এবং অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করে পুরুষের মতো কলকারখানা, অফিস সামলায় তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে বলুন তো? এমতাবস্থায় পারিবারিক, সামাজিক সুখশান্তি ও নিঃস্বার্থে প্রীতি ভালোবাসার কোনো অস্তিত্ব থাকবে কি?

আজকের ইউরোপ আমেরিকায় এতো বিরাট অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি সত্ত্বেও তারা অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা আর নিঃস্বার্থ সেবা থেকে বঞ্চিত। পাশ্চাত্য সমাজ পারস্পরিক সম্প্রীতি আর সহানুভূতির পবিত্র অনুভূতি থেকে বঞ্চিত। তাদের বড় বড় দামি অট্টালিকা গাড়ি বিলাস ব্যসনের অঢেল আয়োজনে জীবন পরিব্যাপ্ত আর কোটি কোটি টাকা থাকা সত্ত্বেও তারা আজ বড় অসহায়, অশান্ত-অতৃপ্ত। আজ তারা বৈষয়িক উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীতে আস্থা ভালোবাসা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। ভাই-বোনের মধ্যে পবিত্র অনুভূতির কোন বন্ধন নেই– মোটকথা তারা পারস্পরিক ভালোবাসা সম্প্রীতি, দয়া-মায়া ইত্যাদি অকৃত্রিম অমূল্য সম্পদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। তাদের সবকিছু থেকে যেন কিছুই নেই এক কথায় নি:স্ব অসহায়।

আল্লাহ্ না করুন, আমাদের সমাজে যেন সেই অভিশপ্ত পরিণতি নেমে না আসে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে পাশ্চাত্যবাসী আজ যেসব মারাত্মক ও আত্মঘাতী সমস্যায় জর্জরিত, মুসলমানরা যেন সেই ভুল না করে বসে। আল্লাহর ইবাদত, ঈমান, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, সহানভূতি ইত্যাদি এমন আধ্যাত্মিক সম্পদ যার এক একটির তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ অত্যন্ত নগণ্য ও তুচ্ছ। যারা এ আধ্যাত্মিক সম্পদকে বাদ দিয়ে পার্থিব স্বার্থের পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে– তারা সত্যিই বড় বিড়ম্বিত হতভাগ্য।

ইসলামী শিক্ষার আলোকে আমরা একথা স্বীকার করি যে, বাইরের যে কোনো কাজ করার ক্ষমতা এবং যোগ্যতা নারীর রয়েছে। নারী চাইলে ঘরের এবং বাইরের দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করতে পারে। অর্থাৎ বাইরে পুরুষরা যেসব

কাজ করে নারীও সেসব কাজ করতে পারে। আবার পুরুষের পক্ষে যে কাজ কোনো দিনও সম্ভব নয় সে কাজও নারীই করে। যেমন গর্ভধারণ, প্রসব ও স্তন্যদান এবং সন্তানের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হলো, নারী নিজ ক্ষেত্রের এতসব কর্তব্য পালনের পর আবার পুরুষের দায়িত্বও নিজের কাঁধে নেবে কেন? যারা নারীকে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বলে তারা কি নারীর ওপর অবিচার করছে না? পুরুষ যখন নারীসুলভ কোনো কাজ করে না এবং করতে সক্ষম নয়, তখন নারীকে পুরুষের কাজ করার জন্যে বাধ্য করা হবে কোন যুক্তিতে? নারী পুরুষের কাজও করতে পারে, তাই বলে কি তাকে উভয় দায়িত্বই চাপিয়ে দেয়া সঙ্গত হবে? নারী যদি পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাহলে তার নিজ ক্ষেত্রের কাজ কি ব্যাহত হবে না? তদুপরি পুরুষের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নারী যে দায়িত্ব পালন করে সেখানে তাকে কি তার যোগ্য পারিশ্রমিক ও মর্যাদা দেয়া হয়? বাইরের কর্মক্ষেত্রে নারীর ওপর যে যুলুম অবিচার ও অসমতাপূর্ণ ব্যবহার করা হয় তার বিস্তারিত বিবরণ না হয় এখানে বাদই দিলাম।

কিন্তু এটা তো বাস্তব সত্য কথা যে, একই ক্ষেত্রে একই কাজ করার পরও কোন নারীকে পুরুষের সমান পারিশ্রমিক এবং মর্যাদা দেয়া হয় না। পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয় তা তাদের বেতন ও পারিশ্রমিকের অসম ব্যবস্থা থেকেই স্পষ্ট হয়। সুতরাং পুরুষের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নারী যে শোষিত, বঞ্চিত ও অপমানিত হবে তাতো জানা কথাই। অন্যদিকে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীকে স্থান দিয়ে পুরুষ তাকে অনুকম্পা বা দয়া প্রদর্শন করছে বলেই মনে করে এবং অপ্রয়োজনীয় অনুকম্পার বিনিময়ে নারীর নারীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেও সেসব পুরুষেরা পিছপা হয় না।

অনেকে এটাও বলে থাকেন যে, "নারীর পক্ষে ঘরের ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণ সামঞ্জস্যতার সাথে কাজ করা সম্ভব।" এভাবে তারা একথার স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, নারীরা ঘরের সীমানায়ও কাজকর্ম করে– বেকার বসে থাকে না। সুতরাং ঘরে অবস্থানরত মহিলাদের ব্যাপারে তারা যে কর্মহীনতা বা বেকারত্বের অপবাদ দিয়ে থাকে তা তাদের নিজেদের মতামত খণ্ডন করে এবং তাদের গোটা চিন্তাধারার অসারতা প্রমাণ করে।

কিন্তু তারা যে বলেছেন, নারী ঘরের ভেতরে ও বাইরে একই সাথে সকল কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে করতে সক্ষম, তা বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। যেমন মনে করুন, নারীর এক দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর সেবা করা এবং তাকে স্বস্তি দেয়া। এজন্যে তার মধ্যে সব সময় স্বামীভক্তি ও স্বামী-প্রেমের মধুর অনুভূতি থাকা

আবশ্যক আর স্বামীর সেবার জন্যে কোনো সময় নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। যেমন, কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে একথা বলতে পারে না যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তুমি আমার স্ত্রী হিসেবে সেবার দায়িত্ব পালন কর, এরপর তোমার ছুটি, যেখানে ইচ্ছা যাও, যা মর্জি তা কর।

এভাবে কোনো মা তার সন্তানকে পুরোপুরি চাকর-বাকরদের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না। তারা তার সন্তানকে মায়ের মতো আদর-স্নেহ করার পরিবর্তে লুকিয়ে মারধর করবে এবং মায়ের বদলে অন্য কেউ সন্তানের মানসিক বিকাশ সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম নয়। কোনো চাকর বা আয়া শিশুকে একথা বলবে কি যে, আদর সোহাগের জন্যে তোমাদের মায়ের অপেক্ষায় থাক? মা তার শিশু সন্তান বা স্বামীর সেবা বা অন্য কোনো দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কি কলকারখানায় দৌড়াবে? কিংবা সন্তানের লালন-পালন এবং বাইরের চাকরি একই সাথে করতে থাকবে? এমতাবস্থায় উভয় ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে কি? এক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অন্য দায়িত্ব শিকেয় তুলে রাখবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় আসলে দু'টি দায়িত্বের কোনোটিই যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। ফলে একূল ওকূল দু'কূলই হারায়।

তা সত্ত্বেও আমরা তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্যে তাদের কথা যদি মেনেও নিই যে, নারী তার সময়কে উভয় ক্ষেত্রেই কাজের জন্য বন্টন করে নেবে। তাহলে তার ফলাফল কী দাঁড়াবে? এর ফলাফল এ দাঁড়াবে যে, সে তার সীমিত সময়ে নিজের সীমিত ক্ষমতার প্রয়োগ করে যে কাজ করবে তা পুরুষের তুলনায় কম এবং অপূর্ণাঙ্গ হবে। যেমন আগে বলেছি, সে কোনো ক্ষেত্রে কাজের সাথেই সুবিচার করতে পারবে না। তা সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় একই ব্যক্তির দুই নৌকাতে পা রাখা।

তাহলে কথা দাঁড়াল এই যে, ঘরে বাইরের উভয় ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে যেভাবে তার ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটবে তেমনি তা থেকে কোনো বৈষয়িক উপকারও অর্জন করা সম্ভব হবে না।

বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতি না হয় সহ্য করা গেল। কিন্তু নৈতিকতার কি হবে? ঘরে বাইরে দৌড়াদৌড়ি করার ফলে নৈতিকভাবে তার যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা কি দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ দিয়েও পূরণ করা সম্ভব? আমেরিকার আধুনিকদের প্রতিনিধি বিশিষ্ট সাহিত্যিক এফ মাকজেনিলী এ সম্পর্কে বলেন, "যদি আমাদেরকে অন্যায়ভাবে একাজের জন্যে বাধ্য করা হয় যে, আমরা বাড়ি-ঘর ছেড়ে গিয়ে বাইরে কাজ করব তাহলে এটা চরম ভ্রান্তিপূর্ণ ও যুক্তিহীন বলা হবে। কারণ বাইরের কোনো কাজ এতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, তার জন্য পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা তছনছ করে দেয়া হবে।"

এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, উভয় ক্ষেত্রের কাজের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা একান্তই নিরর্থক এবং বিভ্রান্তিকর। এভাবে তাদের এ দ্বিতীয় আপত্তিও খণ্ডিত হয়ে যায়। যা যুক্তির মাপকাঠিতে টিকে না। যা যুক্তির মাপকাঠিতে টিকে না

এরপর আমরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে একথা যাচাই করে দেখি যে, নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে কাদের কাজ রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ; তাহলে বাস্তবতার আলোকে আমরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, নারীর কর্মই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের কাজও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, একথা ঠিক। কিন্তু নারীর কাজ তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নারী যদি ঘর-বাড়িতে পুরুষের অর্জিত আয়ের সংরক্ষণ ও দেখা শোনা না করে এবং তার সন্তানদের লালন পালন ও প্রশিক্ষণ না দেয় তাহলে পুরুষের আয়-উপার্জনের কোনো অর্থই কাজে আসবে না। বরং বিফলে যাবে আসলে ভবিষ্যত বংশধর তথা জাতির ভিত্তি রচনা করে একমাত্র নারীই।

একজন আদর্শ নাগরিক আর কর্মঠ ব্যক্তি মৌলিক প্রশিক্ষণ অর্জন করে মায়ের কাছ থেকেই। ছেলে-মেয়েকে সৎ, শিক্ষিত ও ভদ্রতার কাঠামোতে গড়ে তোলেন মায়েরাই। পুরুষতো কেবল দু-পয়সা কামিয়েই দায়িত্ব শেষ করে। কিন্তু পুরুষের কামানো সে আয়কে বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে ব্যবহার করে নারীরাই। সুন্দর পারিবারিক পরিকল্পনা তৈরি করতে হয় তাদেরকেই। এখন আপনারাই বলুন, সমাজ ও জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কাদের গুরুত্ব বেশি? যারা বলেন যে, শুধু পুরুষই কাজ করে আর নারী বেকার বসে বসে খায় তাঁরা আসলে চরম অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। তারা কোনো দিন নারীর কাজের গুরুত্ব বোঝারই চেষ্টা করেননি; তা না হলে নারী সম্পর্কে এমন মূর্খতাপূর্ণ মন্তব্য করা সম্ভব হতো না।

এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের সর্বজন শ্রদ্ধেয় দার্শনিক, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ জর্জ বার্নার্ড শ' অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তব সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, “প্রাকৃতিকভাবে নারীর ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, কোনো জাতি তার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারে না এবং এর কোনো বিকল্প পদ্ধতি পেশ করাও সম্ভব নয়। নারী দশ মাস পর্যন্ত গর্ভধারণের দুঃসহ যাতনা সহ্য করে, এরপর সন্তানের জন্ম দেয় ও তার প্রশিক্ষণদান করে এবং এ জন্যেই সে ঘরবাড়ির ব্যবস্থাপনার কাজে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং এ সেবার জন্য কারো কাছে পারিশ্রমিকও চায় না। এ কারণেই মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা নারীর কাজকে কাজ বলেই মনে করে না।

আর যখনই কাজের কথা উল্লেখ করা হয় তখন শুধু পুরুষদের কাজের কথাই বোঝানো হয়। অথচ পুরুষদের যাবতীয় পরিশ্রম কেবল জীবিকা অন্বেষণেই সীমিত থাকে এবং তার সব চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য কেবল একটি লোভনীয় গ্রাস

গ্রহণই হয়ে থাকে। কেননা কোনো লোক নারীদেরকেও পুরুষের কাজে লাগাতে চায়। কিন্তু তাতে চরম মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় না। কারণ তা নারীর কর্মক্ষেত্রই নয়। নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘর এবং সৃষ্টির আদি থেকেই তাকে এ কাজের উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে; কেননা সমাজকে সজীব ও উন্নয়নের জন্যে তা অপরিহার্য।

অসংখ্য পুরুষ অত্যন্ত মামুলি কাজে তাদের জীবন শেষ করে দেয় এবং তার কাজে আসার না কারণ দর্শাতে গিয়ে তারা বলে যে, এর মাধ্যমে তারা তাদের নারীদের ভরণপোষণ করে। এছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই। এ নিয়েই এদের অহংকার ও বাহাদুরীর অন্ত নেই এবং তারা আসল বাস্তবতা বোঝার চেষ্টাই করেন না।" (আল হেলাল-মার্চ ১৯৬৫)

দার্শনিক বার্নার্ড শ' অতি বাস্তব কথারই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলেছেন। এর সত্যতা সম্পর্কে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি একমত পোষণ না করে পারে না। আমাদের বিশ্বাস, এতে করেও সব অপরিণামদর্শী ও বিভ্রান্ত লোকদের চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটবে যারা বলে থাকে যে, সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্য নারীকে ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে হবে। আশা করি তারা সত্য ও বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করবেন।

আত্মনির্ভরশীলতা

নারীদের বাইরে গিয়ে নিজের জীবিকা উপার্জন করার তৃতীয় যুক্তি ছিল যে, এভাবে নারী আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারে এবং অন্যের ওপর বোঝা হয়ে থাকে না। তাছাড়া তার কোনো পৃষ্ঠপোষক না থাকার অবস্থায় সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। এমনও হতে পারে যে, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রেখে তার স্বামী মারা গেছে, এমতাবস্থায় নারী বাইরে গিয়ে আয় উপার্জন করে নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে পারে। তাছাড়া মানুষ হিসেবে এমনিতেও তার কিছু চাহিদা থাকতে পারে এবং তার আত্মমর্যাদার দাবি হচ্ছে, "সে এ ব্যাপারে কারো করুণার পাত্র না হয়ে নিজের চাহিদা নিজেই পূরণ করবে।"

উপরের কথাগুলোকে আমরা দু'ভাবে পর্যালোচনা করতে পারি। প্রথমত: এর একদিক হচ্ছে এই যে, আমরা দেখব যে, এ যুক্তি আমাদের অবস্থার সাথে মিল খায় কিনা এবং যুক্তির ভিত্তিতে নারী ঘরের বাইরে অর্থ-উপার্জনের জন্য বের হতে পারে কিনা?

আমরা যখন অবাস্তব পর্যালোচনা করি তখন আমরা এটা দেখতে পাই যে, যে কোনো নারী পল্লীর সেকেলে পরিবেশের হোক বা শহরের শিক্ষিতা আধুনিক, জ্ঞানী হোক বা মূর্খ–মা, বোন, স্ত্রী নির্বিশেষে যে কোনো নারী তাদের পিতা, ভাই ও স্বামীর ওপর নির্ভরশীল থাকাকে কোনো অবস্থাতেই অপমানকর মনে করে না।

বরং যে কোনো নারীই পিতা-ভাই বা স্বামীর নির্ভরশীলতায় জীবন-যাপনকে গৌরবজনক বলেই মনে করে। আর দুর্ভাগ্যবশতঃ কেউ যদি পিতা-ভাই বা স্বামীর আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে বাইরে গিয়ে কাজ করেও থাকে তাহলে এটাকে সে বিরাট অপমান ও দুর্ভাগ্যের ব্যাপারই মনে করে। নারী একান্ত অপারগতার কারণে বাইরে চাকরি করতে বাধ্য হলেও এটাকে সে সব সময় কঠিন এবং অস্বস্তিকর বলেই মনে করে।

আমরা অবশ্য একথা জানি যে, আজকের পাশ্চাত্য সমাজে উপার্জনহীন মহিলাদের অপমানজনক ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয় এবং যে সব মহিলা আত্মনির্ভরশীলা নয় তাদের তুচ্ছ মনে করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের এ অবস্থা হচ্ছে জড়বাদী অসভ্যতারই পরিণাম। পাশ্চাত্যের গোটা ব্যবস্থাকেই আমরা কৃত্রিম অভিশপ্ত ব্যবস্থা বলে অভিহিত করতে পারি।

পাশ্চাত্যের নারীদের এমন জটিল ও দুঃসহ অবস্থা সত্ত্বেও ইসলামী বিশ্বের মুসলিম নারীরা কিন্তু এসব জটিলতা থেকে এখনো মুক্ত রয়েছে। মুসলিম সমাজে একজন মেয়ে তার পিতার ওপর নির্ভরশীলতাকে এবং বিয়ের পর স্বামীর ওপর নির্ভরশীলতাকে নিজের জন্যে গৌরবের বিষয় মনে করে এবং পিতা-ভাই বা স্বামী তাদের মেয়ে বোন বা স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনকে নিজেদের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে এবং অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে সেই দায়িত্ব পালন করে।

মুসলিম সমাজে কোনো পুরুষ তার স্ত্রী বা বোন কিংবা মেয়ে বা মাকে নিজের ওপর কখনো নিজেদের জন্যে অপমানজনক মনে করে না। এ জন্যে অন্যান্য সমাজের মতো মুসলিম সমাজের নারীরা তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট। মুসলিম সমাজের কোনো মেয়ে বা মহিলাকে চরম অবস্থায়ও বাইরে চাকরির চিন্তা করতে হয় না। কারণ একান্ত বিপদের অবস্থায় তার কোনো না কোনো নিকটাত্মীয় স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়। সুতরাং মুসলিম সমাজের কোনো মেয়ে বা মহিলা বাইরের চাকরিকে নিজেদের জন্য চরম অবমাননাকর বলেই মনে করে। এভাবে অন্যান্য সমাজের মহিলারাও যদি ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ করে তাহলে তাদের সমস্যাবলিরও সন্তোষজনক সমাধান হতে পারে।

দ্বিতীয়ত: এর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে এই যে, অন্যদের অবস্থা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করব। আমরা যখন আধুনিক জড়বাদী পাশ্চাত্য সমাজের পর্যালোচনা করি তখন আমরা দেখে অবাক হই যে, সেখানে পিতা মেয়ের প্রতি স্নেহ-প্রীতি, সহানুভূতি ও সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়ানোর প্রয়োজন মনে করে না। তারা স্বার্থপরতার এতো নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে যে, সেখানে বাপ ও মেয়ে, ভাই ও বোন

এবং মা ও ছেলের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতম ও পবিত্র সম্পর্কের বিন্দুমাত্র গুরুত্বও নেই। তারা অন্য কারো ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজনই অনুভব করে না। পাশ্চাত্যের প্রতিটি নর-নারী ব্যক্তিস্বার্থ আর ব্যক্তিগত আয়েশেতেই অস্থির; অন্য কেউ মরলো কি বাঁচলো সেদিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। যেহেতু সেখানে ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিক আদর্শবাদের কোনো স্থান নেই, তাই তারা নিরেট যান্ত্রিকতার শিকারে পরিণত হয়ে বৃহত্তম মানবিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য থেকেই বঞ্চিত হয়ে। ফলে গোটা পাশ্চাত্য সমাজ আজ চরম স্বার্থপরতা ও অস্বস্তিকর কৃত্রিমতার সয়লাবে ডুবে মরছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পাশ্চাত্যের জড়বাদী সমাজে নারীর মর্যাদার মান হচ্ছে এই যে, সে বাপ ভাই বা স্বামী কারো ভরণ পোষণ গ্রহণ করবে না বরং নিজের জীবিকা নির্বাহ নিজেই করবে। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্যের নারীরা তাদের নৈতিক স্বাভাবিক দায়িত্ব যেমন গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি গৃহস্থালী দায়িত্ব বর্জনে বাধ্য। কারণ এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তার নিজের জন্য জীবিকার সংস্থান করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের চাকরির পক্ষাবলম্বীরা গৃহস্থালী কাজকে কাজ বলে স্বীকার করতে চায় না; কারণ তাদের মতে গর্ভধারণ, প্রসব এবং সন্তান লালন-পালনের জন্য তো আর পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে না। অতএব যে কাজে টাকা পাওয়া যায় না সেটা আবার কিসের কাজ। আর যেখানে দুটো পয়সা পাওয়া যায় তা যেমনই হোক না কেন সেটা একটা কাজই বটে। এ হলো এসব একদেশদর্শী আধুনিক যুক্তির লাগামহীন বহর। কিন্তু তাদের এসব কথা যে একান্তই অসম্ভব ও মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর তা ইউরোপ আমেরিকার সামাজিক অবস্থা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে।

এ ধরনের অবাস্তব ও ক্ষতিকর মতামতের অসারতা প্রমাণ করে আমরা বলেছিলাম যে, "অত্যন্ত বাস্তব ও নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিবেচনার পর আমরা লক্ষ্য করেছি, সমাজ ও জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে পুরুষদের কাজের তুলনায় নারীদের গৃহস্থালী কর্মই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। অন্যদিকে পুরুষের কাজের গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বলতে হয় যে, নারীদের গৃহস্থালী কাজ কর্মের যে গুরুত্ব রয়েছে, পুরুষের কাজকর্মকে ততটা গুরুত্ব দেয়া যায় না।"

এরপর আমরা বলেছিলাম যে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে বলুন যে, উভয়ের মধ্যে কার জীবনের মূল্য ও উপকারিতা বেশি? কার মান মর্যাদা বেশি? কার কার্য বেশি মহৎ এবং কার জীবন সবসময় সক্রিয় থাকে?

আচ্ছা, এরপর এটাও চিন্তা করে দেখুন যে, পুরুষ ও নারী উভয়েই যদি বেশি টাকা রোজগারের কাজেই ব্যস্ত থাকে তাহলে তাদের অর্জিত বিপুল অর্থসম্পদে

তাদের লাভটাই কি হবে? বলুন তো শুধু টাকা আয় করাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? টাকার গুরুত্বই বা কি? যে টাকা সুখ-শান্তি দিতে পারে না সে টাকা আয় করে কি হবে? কিন্তু কি আশ্চর্য! হাতের ময়লা এ ঠুনকো টাকা পয়সার জন্য নারীকে তার মান-মর্যাদা এবং পরিবার ও সমাজের সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

আজ টাকার মানদণ্ডে নারীর মান ও মূল্য স্থির করা হচ্ছে। নারী-জাতির জন্যে এর চেয়ে অবমাননাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে? এটা শুধু নারী জাতির জন্যে নয় বরং গোটা মানবতার জন্যে মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে। মানুষ যদি এতটা স্বার্থপর হয়ে যায় যে, নিজের স্ত্রীকেও তার আয়ের অংশ থেকে ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করে, যেখানে মায়া-ময়তা, স্নেহ, প্রেম-ভালোবাসা, সহানুভূতি ও পরস্পরের জন্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার সব মানবিক উপলব্ধি বিলুপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে মানুষ বলে গণ্য করার কি যুক্তি থাকতে পারে? বস্তুত, আজ পাশ্চাত্যের মানুষ সেই চরম প্রশ্নেরই সম্মুখীন।

এমনকি আজ তাদের কাছে 'মানবতা' কথাটাই একটা অর্থহীন শব্দ। মানবতা ও পশুত্বের মধ্যকার কোনো ব্যবধানকে মানতেও তারা প্রস্তুত নয়। এমতাবস্থায় তাদের কাছে নীতি-চরিত্র ও আদর্শের যে কি গুরুত্ব থাকতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এটা সত্য যে, আজ পাশ্চাত্যের নর-নারীদের কাছে কেবল অর্থ ও স্বার্থ ছাড়া নীতি, চরিত্র ও মূল্যবোধের কোনো দাম নেই। এ কারণেই দার্শনিক বার্নাড শ' তাঁর মন্তব্যে তাদের ভুল ধারণার অপনোদন করেন।

আর যদি একথা বলা হয় যে, নারী কেবল অনন্যোপায় অবস্থায় বাইরে বের হবে যেমন তার দরিদ্র ও অসহায় পরিবারকে সাহায্য সহযোগিতা করা বা নিজের পিতৃহীন ইয়াতীম সন্তানদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের স্বার্থে বাইরে চাকরি করতে বাধ্য হয় তাহলে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়।

প্রথমত, এই যে, সমাজ তার একান্ত দায়িত্ব থেকে উদাসীন রয়েছে যার ফলে সমাজের দরিদ্র অভাবী লোকদের জীবন ধারণ কঠিন হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, অসহায় নারীদের প্রতি সহানুভূতির আবেগ-উপলব্ধি এতোটা কমে গেছে যে, যার ফলে তার মাসুম সন্তানদের ভরণপোষণের জন্যে বাইরে গিয়ে চাকরি করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। এথেকে এটাও বোঝা গেল যে, এ ধরনের কোনো কঠিন এবং অনিবার্য অবস্থা ছাড়া নারী ঘরের বাইরে চাকরি করতে প্রস্তুত নয়। কারণ সে চাকরি করতে শুধু এ জন্যেই বাধ্য হয়ে পড়ে যেহেতু তার কোনো সাহায্যকারী বর্তমান থাকে না, সে কারো সহানুভূতি ও সহযোগিতা পায় না এবং সমাজ তার দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলার পরিচয় দেয়। যদি এ দুটি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাহলে নারীকে বাইরে গিয়ে চাকরি করার কথা ভাবতে হয় না।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব সমস্যার মূলে রয়েছে অবক্ষয়মান সামাজিক অবস্থা। সমাজের বর্তমান দোষত্রুটিগুলোর সংশোধন করেই এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যেতে পারে। এ জন্য সমাজ সংস্কারে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কারণ সব রকমের দোষ ত্রুটি ও অপরাধ সামাজিক নীতির অবক্ষয় থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে সমাজের লোক মানবিক সহানুভূতি ও মহানুভবতার গুণাবলি থেকে বঞ্চিত সে সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মেয়েরা এবং মায়েরা জীবিকা নির্বাহের জন্য বাইরে যেতে বাধ্য হয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুগামীরা যে বিকল্প ব্যবস্থা পেশ করেছে তা সমস্যাকে সমাধান করার পরিবর্তে আরো জটিল করে তুলেছে। তারা এক সমস্যার সমাধানের জন্যে তার চেয়েও বড় সমস্যার পথ গ্রহণ করেছে। গোটা পাশ্চাত্য, এমনকি আমাদের দেশেও সেসব জটিল সমস্যার তিক্ত বাস্তবতা আমাদের সামনে রয়েছে। এসব সমস্যাই আজ আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। যাবতীয় অপরাধ প্রবণতার মূলে রয়েছে এ সমস্যা।

কিন্তু ইসলাম অত্যন্ত বাস্তবমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান পেশ করেছে। ইসলাম এমতাবস্থায় দরিদ্র, বিধবা, ইয়াতীম ও পঙ্গু বা এ ধরনের যে কোনো অভাবগ্রস্তদের অর্থনৈতিক সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য সর্বজনীন বায়তুলমাল অর্থাৎ সাহায্য তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করেছে।

আর এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

“তাদের ধন-সম্পদে অভাবী এবং বঞ্চিতদের অধিকারও রয়েছে।”

(সূরা যারীয়াত : আয়াত-১৯)

বিশেষজ্ঞরা 'বঞ্চিত' বলতে সেসব লোকদের বুঝিয়েছেন, যারা নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে অসমর্থ এবং যেসব নারী যাদের কোনো পৃষ্ঠপোষক নেই তা সে নারী ছোট হোক বা বড়, তাদের সবাইকে বায়তুলমাল থেকে অংশ দেয়া হবে। কারণ যে কোনো অভাবী নারী তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্যে কোনো না কোনো অবলম্বনের প্রত্যাশী। একইভাবে ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের ভারও ইসলামী সরকারের ওপর বর্তায়। বিধবা ও অসহায় নারীদের মত ইয়াতীমদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাও বায়তুলমাল থেকে করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উপার্জনে সক্ষমতা অর্জন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বায়তুলমালের সাহায্য পাবে।

নবী করীম ﷺ ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করেছেন– “প্রতিটি ব্যক্তি, যারা মু'মিন, দুনিয়া ও আখেরাতে তারা আমার সাহায্য পাওয়ার সবচেয়ে বেশি যোগ্য।”

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন–

"নবী ঈমানদারদের জন্যে তাদের নিজ নফসের চেয়ে বেশি উত্তম।"

(সূরা আহযাব : আয়াত-৬)

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় নবী করীম ﷺ বলেছেন–
"যে মুসলমান মৃত্যুকালে কোনো ধন-সম্পদ রেখে যায় তা তার উত্তরাধিকারীদের (প্রাপ্য)। আর সে যদি ঋণ এবং অসহায় পরিবার-পরিজন পায় তাহলে তাদের ব্যাপারে আমিই দায়িত্বশীল।"

বস্তুত: এটাই হচ্ছে সুস্থ ও সুন্দর সমাজের পরিচয়। আদর্শ কল্যাণমূলক সমাজ গঠনের জন্যে ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা বা বাস্তবায়ন একান্তই অপরিহার্য। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই যেন এমন না হয় যে, সমাজে দোষ ও অপরাধের সুযোগ অবশিষ্ট রাখা হবে এবং যার পরিণতিতে বিপদগ্রস্ত নর-নারীদের সেই তিক্ত যাতনা সহ্য করতে বাধ্য করা হবে। দোষ করবে কেউ আর তার ফল ভোগ করবে অন্য কেউ, তা হতে দেয়া যায় না।

নারী গৃহপ্রদীপ না বাজারের পণ্য?

নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র : নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র কী? এটা এরকম কোনো প্রশ্ন নয় যে, দু-চার কথায় জবাব দেয়া যাবে। এর সম্পর্ক মানব স্বভাব ও নৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে। এজন্য নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে মানব স্বভাব ও নৈতিকতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরি। তাছাড়া কোনো সমস্যার যথার্থ সমাধান করার জন্য স্বভাব প্রকৃতি এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা খুবই জরুরি।

এ নীতিকে সামনে রেখে যখন আমরা অগ্রসর হই তখন প্রথম পদক্ষেপেই আমরা দেখতে পাই যে, স্বয়ং আল্লাহই নারী ও পুরুষ উভয়কে স্বতন্ত্র স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

এ বন্টনের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিছক লিঙ্গগত বন্টন নয়। আর আল্লাহ নিছক যৌন আনন্দ উপভোগের জন্যই নর ও নারীকে সৃষ্টি করে লাগামহীন ছেড়ে দেননি। কারণ এটা আল্লাহর সৃষ্টিকৌশল ও উদ্দেশ্যের বিরোধী। এ বন্টনের উদ্দেশ্য আসলে সেই উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ এ বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে যে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার মাঝেই এ বন্টন সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায় যে, এ পৃথিবী আর মহাপ্রকৃতি কোনো ঘটনাচক্রে সৃষ্টি হয়নি বরং এটা একটা সুনিশ্চিত পরিকল্পনারই বাস্তব প্রতিফলন। এর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাহীন অনন্ত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে যা মানুষের মন

মেজাজে আলো বিকিরণ করে। এ সম্পর্কে চিন্তা করলে অজ্ঞানতার যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়।

কোনো ব্যক্তি যখন এ বিশ্ব জগৎ ও মহাপ্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে তখন স্রষ্টার গুণ- বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে এমন সব বিস্ময়কর সত্যের দ্বার তার সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়, যা তার জ্ঞানবুদ্ধি ও চিন্তাকে করে সম্প্রসারিতও আলোকোজ্জ্বল। এরপর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর ক্ষমতা ও সত্যতায় বিশ্বাসী হয়ে তার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

এ দৃশ্যজগৎ ছাড়াও আল্লাহ আরো বড় এবং আরো বিস্ময়কর এক অদৃশ্য জগৎও সৃষ্টি করে রেখেছেন। আবার দৃশ্যজগতের এমন অনেক বস্তু এবং রহস্যও সংগোপন রয়েছে যাতে মানুষের ভাবনা চিন্তার অনেক কিছুই রয়েছে। মানুষ যাতে এসব কিছু দেখে শুনে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং তাঁর প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞচিত্তে সিজদাবনত হয়– সেটাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

এতে করে আমরা জানতে পারি যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর জন্য পৃথক পৃথক স্থায়ী ব্যবস্থাপনা রয়েছে এবং প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুকে তার স্বভাব ও ক্ষমতা মোতাবেক গুণবৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী তাদের কর্ম ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে প্রতিটি বস্তু বা প্রাণী তাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকৌশল এবং উদ্দেশ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা ঘোষণা করে।

এ পৃথিবী এবং মহাপ্রকৃতির সব সৃষ্টির মধ্যে শুধু মানুষকেই এসব সত্যতা ও বাস্তবতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা ও গুণাবলি দান করে তাকে সবার উপরে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে। মানুষকেই কেবল সৃষ্টি-বৈচিত্র্য তার রূপ প্রভাব ও তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে মতামত ব্যক্ত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের বিভিন্ন বিস্ময়কর দিক নিয়েও চিন্তাভাবনা করে জ্ঞানবুদ্ধির প্রমাণ দিতে পারে এবং আল্লাহ মানুষকে নম্রতা-ভদ্রতা, মহানুভবতা ইত্যাদি মহৎগুণ দান করে তাকে সরাসরি আল্লাহর ওহী ও রিসালাতের মর্যাদালাভের যোগ্য করে তুলেছেন।

এসব বাস্তবতার আলোকে আমরা অনুমান করতে পারি যে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নারী-পুরুষ হিসেবে আলাদা আলাদা গুণবৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার পেছনে মহান উদ্দেশ্যও বিদ্যমান। এ উদ্দেশ্যের মাধ্যমেই নারী ও পুরুষ নিজের জীবনকে সৌন্দর্য পবিত্রতার পরশে উজ্জ্বলতর করে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে। আসলে এটাই হচ্ছে মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য আর এ উদ্দেশ্যের স্বার্থকতা ও পূর্ণাঙ্গতাকে নিশ্চিত করার জন্য মানুষকে নর-নারীতে বণ্টন করতে হয়েছে। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষ অর্থাৎ নর ও নারীর কর্ম ও তার

কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতা কোনো বুনিয়াদী লক্ষ্য নয় বরং এটা হচ্ছে লক্ষ্যে পৌঁছানোর সহজ ও সুন্দর উপায় মাত্র। ঠিক এ উপায়েই মানুষ তার স্রষ্টার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে এবং এরই মাধ্যমে তার জীবনের পরম সাফল্য অর্জিত হবে।

যেহেতু মহাপ্রকৃতির এ বিপুল সৃষ্টি বৈচিত্র্যের নিজস্ব কোনো তাৎপর্য নেই; অন্যদিকে যেহেতু এসবের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় তাই এসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্বীকৃত হয়। এজন্যে কেবল মানুষকেই সেই গুণ ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে সে আল্লাহর অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে। এ স্বীকৃতিই মানুষকে সত্যের সাথে পরিচিত করে। সুতরাং মানুষের সম্পূর্ণ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ভাবে শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্বের সত্যতা বিশ্বাস করবে এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলবে অর্থাৎ শুধু আল্লাহরই ইবাদত বা উপাসনা করবে।

এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন–
"আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধু আমরাই ইবাদত করা এ ছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি।" (সূরা জারিয়াত : আয়াত-৫৬)

সুতরাং জীবনের যে কোনো সমস্যায় মানব সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর এ পরম উদ্দেশ্যকে সামনে রাখতে হবে। এভাবে নারীদের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও সে বুনিয়াদী নীতিকে বিবেচনা করতে হবে। এ জন্যে তাঁর অস্তিত্বের প্রকৃতি, তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং মহাবিশ্বের বৈচিত্র্যে তাঁর স্থান ও মানকে সামনে রেখেই সব কিছু বিচার বিবেচনা করতে হবে। এটাই হবে আসল বিবেচনা পদ্ধতি। এছাড়া আর সব পদ্ধতি বা চিন্ত-ধারা চরম ভুল ও ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য।

অর্থোপার্জনে নারীর দুর্বলতার অর্থ

পূর্বের আলোচনার পর্যালোচনা করলে তার সারমর্ম এ দাঁড়ায় যে, নারী বা পুরুষের যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের স্বভাব প্রকৃতিকে সামনে রাখতে হবে। কারণ তার যাবতীয় গুণ ও ক্ষমতা এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য তার স্বভাব প্রাকৃতিকভাবে নির্ভরশীল। আমরা এ প্রকৃত অবস্থাকে সামনে রেখে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তবেই তা সত্যিকার অর্থে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারব।

এ বাস্তবতার আলোকে বলা যায় যে, নারীর গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, সন্তানকে দুধ পান করানো, তাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ, গৃহস্থালীর ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কর্মের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের জন্য জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব পুরুষকে অর্পণ করা হয়েছে।

স্রষ্টা নর ও নারীর জন্য যে আলাদা স্বভাব ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সীমালঙ্ঘন বা তা অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর যদি কেউ তার নির্ধারিত স্বভাব ও কর্মের সীমালঙ্ঘন করে তাহলে তাতে করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাবলির সৃষ্টি হবে। চুম্বকের যেমন আকর্ষণ শক্তির স্বভাবকে অস্বীকার করা যায় না এবং তেমনি বরফের স্বভাব চুম্বকের মতো আকর্ষণশীল নয়। কেননা উভয়ের গঠন ও গুণপ্রকৃতি আলাদা আলাদা। এভাবে প্রতিটি বস্তুরই পৃথক পৃথক গুণ ও প্রকৃতি রয়েছে। এসব গুণ ও স্বভাব অস্বীকার করা নিতান্তই বোকামী। কোনো বস্তুর গুণ ও প্রকৃতিকে পরিবর্তন করলে সে বস্তু তার মৌলিকত্ব হারাতে বাধ্য হবে। এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত এ সত্যের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর বাণী।

সুতরাং পুরুষ নারী হতে পারে না আর নারীও পুরুষ হতে পারে না। একইভাবে তারা একে অন্যের কর্ম ও দায়িত্বের সীমায় অনুপ্রবেশও করতে পারে না। যদি করে তাহলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং তাদের মৌলিকত্বও খর্ব হবে। এ জন্য ইসলাম নারী ও পুরুষের কর্ম ও দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। নারীর জন্য তার নারীত্বই যথেষ্ট। তার ওপর জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব চাপানো যাবে না। ইসলাম সেই দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত করেছে। নারী ও পুরুষের কর্ম ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে ও সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলাম তাদের স্বভাব প্রকৃতি, ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে সামনে রেখেছে এবং এ জন্য তাদেরকে পরস্পরের কর্মক্ষেত্রে ও দায়িত্বের সীমানায় অনুপ্রবেশ করতে নিষেধ করেছে।

নারী ও পুরুষের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামে ব্যাপক হারে পূর্ণাঙ্গ বিধি-ব্যবস্থা আছে। এসব বিধি-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ এবং বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক মান সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে ইসলামের বিবাহ বা দাম্পত্য বিধি, মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধি, ওয়ারীশ সূত্র বা উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা ইত্যাদি নীতি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত, সুবিচারপূর্ণ এবং সর্বজনীন কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

নারী তার বুকের দুধ পান করায়ে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখে আর তার আগে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাকে জন্ম দেয়ার জন্যে গর্ভে ধারণ করে। অন্যান্য সব কিছু বাদ দিলেও জীবন গঠনে নারীর এ দুটি অবদানের ঋণ মানবতা কোনোদিনই শোধ করতে পারবে না। নারীর এ মহত্তম ও কঠিনতম দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে সমাজের অন্য সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি দান করেছেন। এত বড় দায়িত্ব পালনের পর তার ওপর জীবিকা অনুসন্ধানের দায়িত্বও চাপিয়ে দেয়া হবে

বিরাট অবিচার। আল্লাহ নারীর মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসা, নম্রতা-কোমলতা, সহানুভূতি ইত্যাদি মহৎ ও সুন্দর উপলব্ধি দান করেছেন এবং তা দাম্পত্যবিধি ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্যে ছিল একান্তই জরুরি।

স্ত্রী তার স্বামীকে এবং মা তার সন্তানকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখার জন্যে কত যে আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা করে তার কোনো সীমা রেখা নেই। এ জন্য তারা অসংখ্য দুঃখ-কষ্ট এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে পিছপা হয় না। মা তার সন্তানের স্বার্থে নিজের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করতেও দ্বিধা করেন না। নিজে শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও সন্তানকে সুখে ও নিরাপদে রাখার চেষ্টা-সংগ্রামে নিবেদিতা মাকে নিজের জন্যে সবরকম আরাম-আয়েশের চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়।

নারী তার সুস্থ সবলদেহী স্বামী অথবা তার যোগ্য উপযুক্ত সন্তানকে দেখতে পেয়ে জীবনের পরম আনন্দ ও সার্থকতা অনুভব করে। তার শান্ত ও নম্র স্বভাব চায় তার স্বামী ও ছেলে ব্যক্তিত্ববান হয়ে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিক। অন্যদিকে প্রতিটি স্বামীই তার স্ত্রীর কাছে স্বস্তি, সান্ত্বনা ও ভালোবাসা কামনা করে। স্ত্রীর অবর্তমানে সারা দুনিয়া তার কাছে নিরস ও অর্থহীন মনে হয়। সে তার পূর্ণ শক্তি ও সক্ষমতা সত্ত্বেও নারীর কমল সংস্পর্শের জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। কারণ স্ত্রীর সংস্পর্শই তার মধ্যে সেই অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে যার মাধ্যমে সে পায় দৃঢ় মনোবল ও আত্মবিশ্বাস। আর ফলশ্রুতিতে তার মনে সৃষ্টি হয় নতুন কল্পনা ও আবেগ উদ্দীপনা।

পবিত্র কোরআনে নারীর এ গুণাবলিকে ব্যাপক অর্থে বোঝানোর জন্যে 'স্বস্তি' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

আসলে নারীর সব গুণাবলি ও অবদান হচ্ছে এ স্বস্তিরই ফলাফল। এরই মাধ্যমে দেহ ও আত্মার পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি, দাম্পত্য ও পারিবারিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা এবং সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়। এ স্বস্তিই হচ্ছে জীবনের সঞ্জীবনি শক্তি যা মানুষ কেবল নারীর কাছ থেকে লাভ করতে পারে। তাই নারীর এত বড় অবদানের পর তাকে তার কর্মসীমার বাইরে কাজ করতে বাধ্য করা কোনো অর্থেই সুবিচারপূর্ণ হতে পারে না।

এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রেও নারীর জন্যে তার স্বভাবধর্ম ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যার মাধ্যমে নারী তার জীবনের গুরুত্ব, মর্যাদা ও কর্তব্য অবহিত হতে পারে এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে। সুতরাং নারীর স্বভাব, সক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কর্মক্ষেত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা নারীর জন্যে পূর্ণাঙ্গ ও পর্যাপ্ত। এক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমপর্যায়ের অর্থাৎ নারী ও পুরুষের একই

শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থার বা পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাগ্রহণের কোন প্রশ্ন অবান্তর। কারণ প্রকৃতিই তাদের স্বভাব ক্ষমতা ও কর্মক্ষেত্রের বন্টন রেখেছে, সে হিসেবে তাদের শিক্ষার ধরন-ধারণ ও বিষয়াবলিও ভিন্ন ভিন্ন।

নারীকে ততটুকু জ্ঞানবুদ্ধি ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যতটুকু তার দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্যে জরুরি। অনুরূপভাবে পুরুষকেও তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হয়েছে। যেখানে দৈহিক ও নৈতিকভাবে উভয়ের গুণাবলি ও ক্ষমতা সমমানের সে সব ক্ষেত্রে উভয়কে একই রকম জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নর ও নারীর আবেগ অনুভূতির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এখন কেউ বলেন যে, পুরুষকে যেসব নম্র ও কোমল আবেগ অনুভূতি দান করা হয়েছে তাতে করে পুরুষ চাইলে নিজ দায়িত্ব পালনের সাথে নারীদের কোনো কোনো দায়িত্বও পালন করতে পারে।

একইভাবে নারীকেও যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা দেয়া হয়েছে তাতে করে সে চাইলে পুরুষের মতো অর্থ উপার্জনের দায়িত্বও পালন করতে পারে। মেনে নিলাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তা উভয়ের জন্যেই ক্ষতিকর হবে। কারণ পুরুষ যদি নারীসুলভ কর্মে হাত দেয় বা নারীর কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তার বিশেষ ক্ষমতার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। তার পৌরুষও শেষ হয়ে যাবে। এভাবে সে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের জন্য অক্ষম ও অযোগ্য হয়ে পড়বে। গোটা সমাজ জীবনে চরম বিশৃঙ্খলা এবং অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে। ঠিক একই কথা নারীর বেলায়ও প্রযোজ্য।

নারী যদি তার স্বাভাবিক কর্মসীমা ডিঙ্গিয়ে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তাহলে নারীত্বের দায়িত্ব অসমাপ্ত পড়ে পড়তে এবং এক পর্যায়ে সে তার নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যও হারিয়ে ফেলবে। এভাবে গোটা মানবতা এক মারাত্মক পরিণতির মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। অথচ মানবতার উন্নতি ও কল্যাণ শুধু তখনই সুনিশ্চিত হতে পারে যখন নারী ও পুরুষ উভয়ই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরস্পরকে পরস্পরের দায়িত্ব পালনে সাহায্য-সহযোগিতা করে।

কিন্তু নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে পরস্পরকে সহযোগিতার পরিবর্তে তারা যদি একে অন্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয় বা একে অন্যের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তাহলে চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। আর তা হবে প্রত্যেকের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং তাদেরকে স্বভাব, ক্ষমতা, আবেগ, অনুভূতি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলাম এ বাস্তবতাকে সামনে রেখেই তাদের কর্মসীমা নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট আইন-বিধি প্রণয়ন করেছে। এছাড়া নারীর এমন কয়েকটি প্রাকৃতিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন তার মাসিক ঋতু, সন্তান গর্ভধারণকালে ও প্রসবের পরবর্তী নেফাস সংক্রান্ত সমস্যাবলি মোকাবেলার সাথে সাথে সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। এসব সমস্যার আলোকে আমরা চাই সংশ্লিষ্ট সকল বাস্তবতা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে যা জানা ও বুঝা প্রত্যেকের জন্যই জরুরি। এ জন্যই চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিরাট অংশ নারীর এসব প্রাকৃতিক সমস্যা ও অসুবিধার আলোচনা ও স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়নে ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে নারীর প্রতিটি দৈহিক ও প্রাকৃতিক সমস্যা সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে বিশেষ লক্ষণ ও প্রভাবের বর্ণনা রয়েছে এবং এক একটি ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আমরা নিচে বর্তমান শতাব্দির মহান চিন্তানায়ক ও বিপ্লবী সংস্কারক সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর রচিত গ্রন্থ 'পর্দা ও ইসলাম' থেকে একটি গবেষণামূলক সারাংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি বলেন–

"জীব বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নারী তার আকার আকৃতি এবং প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে নিয়ে নিজ দেহের অণু ও স্নায়ুকোষ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়েই পুরুষের চেয়ে স্বতন্ত্র। যে সময় মাতৃগর্ভে শিশুর মধ্যে লিঙ্গ গঠন (SEX FORMATION) শুরু হয় সে সময় থেকেই উভয় লিঙ্গের দৈহিক কাঠামো পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর মাসিক ঋতুর ধারা শুরু হয়, যার প্রভাবে তার শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া প্রভাবিত হয়। জীববিজ্ঞানী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণে জানা যায় যে, মাসিক ঋতুকালীন অবস্থায় নারীর মধ্যে নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়–

১. শরীরে তাপ নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি কমে যায়। এজন্যে বেশি তাপ নির্গত হওয়ার ফলে তাপমাত্রা নেমে যায়।

২. নাড়ী লঘু হয়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায়, রক্তকোষের সংখ্যায় পার্থক্য সূচিত হয়।

৩. (ENDOCRINES), গলায় হাঁড় (TONSILS) এবং অন্যান্য প্রত্যঙ্গে পরিবর্তন সূচিত হয়।

৪. হজম ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং স্নায়ুশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

৫. গাঁটে গাঁটে অলসতা, আবেগ উদ্দীপনায় ভাঁটা দেখা দেয় এবং স্মরণ ও চিন্তাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার শক্তি কমে যায়।

এসব পরিবর্তন একজন সুস্থ নারীকে রুগ্নাবস্থার এতটা নিকটতর করে দেয় যে তখন সুস্থ অসুস্থতার মধ্যে পার্থক্য করাটা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও গবেষক ডা. এ্যামিল লোভেক বলেন, "ঋতুবতী নারীদের মধ্যে সাধারণত যেসব লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে মাথাব্যথা, ক্লান্তি, অঙ্গ শিথিলতা, স্নায়ু দৌর্বল্য, হীনমন্যতা, অস্বস্তি, বদহজম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কখনো কখনো বমি বা বমি বমি ভাব।"

ডা. লোভেক তার মতের সমর্থনে বিভিন্ন গবেষক বিজ্ঞানী ও ডাক্তারের অভিমতের উল্লেখ করেছেন যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ঋতুকালীন অবস্থায় নারী সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে।"

সাইয়েদ মওদূদী তাঁর গ্রন্থে আরো বলেন, "ঋতুকালীন অবস্থার চেয়ে গর্ভকালীন অবস্থা হয় আরো কঠিন।"

এ সম্পর্কে ডা. রিপ্রেভ বলেন, 'গর্ভকালীন অবস্থায় নারীর ক্ষমতা কোনোভাবেই দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের সেই বোঝা গ্রহণ করতে পারে না যা সে গর্ভকালীন অবস্থা ছাড়া অন্যান্য সময় করতে পারে। এ সময় নারী যে অবস্থার সম্মুখীন হয়, যদি কোনো পুরুষ বা গর্ভহীন নারী সেই অবস্থায় পড়ে তাহলে তাদের নিশ্চিত রোগী বলে সাব্যস্ত করা হবে। এমতাবস্থায় বেশ কয়েক মাস যাবৎ তার স্নায়ু ব্যবস্থা ব্যাহত থাকে এবং তার মানসিক ভারসাম্যও বজায় থাকে না। তার যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক অবস্থা তখন অস্বাভাবিকতার শিকারে পরিণত হয়।' এ কথার সমর্থনে তিনি বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অভিমত উল্লেখ করেছেন যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, এ অবস্থায় নারী প্রকৃতিগতভাবে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমে অক্ষম হয়ে পড়ে।"

এরপর সন্তান প্রসব ও তার পরবর্তীকালীন অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সাইয়েদ মওদুদী বলেন–

"সন্তান প্রসবের পর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার এবং তা বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা থাকে। প্রজননজনিত ক্ষত যে কোনো বিষাক্ত উপসর্গ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। গর্ভের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্যে তখন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক ধরনের আন্দোলন শুরু হয়ে যায় যা সমগ্র দেহ-ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেয়। কোনো আশংকা না থাকলেও তার আসল স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে বেশ কয়েক সপ্তাহ লাগে। এভাবে প্রসবের পর প্রায় এক বছর পর্যন্ত নারী আসলে অসুস্থ বা অর্ধসুস্থ অবস্থায় থাকে। এমতাবস্থায় তার কর্মক্ষমতা অর্ধেক এবং অর্ধেকের চেয়েও কমে যায়। (পর্দা : ১৩৯-১৪১)

চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার এসব ফলাফল থেকে খুব ভালো করে বোঝা যায় যে, মাসিক ঋতু, গর্ভকাল, প্রসব ও তার পররবর্তী অবস্থায় নারীর শরীর ও মন মানসে কি অবস্থা হয়। এসব বাস্তবতার আলোকে এ ব্যাপারে কারো মনে সন্দেহের কোনো বিরাজ করে থাকতে পারে না যে, ইসলাম কোনো নারীকে অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। আসলে এটা নারীর প্রকৃতিরই দাবি ছিল।

উপরের বর্ণনা থেকে নারীর অপারগতার তিনটি বিশেষ কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো–

১. নারীসূলভ বৈশিষ্ট্য। যেমন দাম্পত্য বিধি, মাতৃত্ব এবং আবেগ অনুভূতির কমলতার কারণে নারী অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম।

২. সে জ্ঞান বুদ্ধির ততটুকু অংশ পেয়েছে যা তার প্রকৃতি ও প্রয়োজনের জন্য জরুরি অর্থাৎ যাতে করে সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জীবনযাপনের পদ্ধতিকে ভালো করে বুঝে নিতে পারে আর তাকে কার্যকরী করতে পারে। অন্যদিকে পুরুষকে ততটুকু জ্ঞানবুদ্ধি ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যাতে করে সে তার বাইরের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারে। এজন্যে বাইরের কাজকর্মের ব্যবস্থাপক তাকেই বানানো হয়েছে।

৩. নারীকে ঋতু, প্রসব ও তার পরবর্তীকালে এমন সব অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় যা তার মানসিক, শারীরিক সক্ষমতা ও চিন্তাশক্তিকে বিকল করে রাখে। এর বাস্তবতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি একটু আগেই আমরা উল্লেখ করেছি।

আধুনিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত এসব বাস্তবতা প্রমাণ করে ইসলামী নীতির বাস্তবমুখিতা এবং মানবতার জন্য তার উপকারিতাকেই স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং যুগে যুগে নারীকে যে তার স্বভাব বিরুদ্ধ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে– তাতে সে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক আক্কাদ বলেন–

শুরু থেকেই রান্না-বান্না করার দায়িত্ব নারীই পালন করে আসছে। পরিবারের লোকদের খাবার নারীই তৈরি করে থাকে। তা নারী আধুনিক উন্নত সমাজের হোক বা পশ্চাদপদ কোনো উপজাতির, সে স্বাভাবিকভাবে রান্নাবান্নার কাজ সম্পাদন করে। আর আজ হাজার হাজার বছর পরও যখন আমরা শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছি তারা এখনো পুরুষের সম পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। পুরুষ যেসব কর্মকে অনায়াসে আয়ত্ত করে নিতে পারে তা শেখার জন্য নারীকে সীমাহীন কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়, এরপরও তার মধ্যে আস্থা বা আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয় না। যেমন প্রাচীন যুগ থেকেই নারীকে সেলাই ও রকমারী সূচিকার্য শেখানো হচ্ছে এবং এখনো তার প্রচলন রয়েছে। কিন্তু তা

সত্ত্বেও আজকের নারী নিত্য নতুন ফ্যাশন আর সূচীকর্মের ব্যাপার পুরুষের উপরই অধিকতর নির্ভরশীল। সে নিজের কাজের ওপর সন্তুষ্ট নয়। এজন্য দেখা যায় যে, নারী তার এ চিরাচরিত কাজটি শেখার জন্য সেসব প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়– যার দায়িত্বশীল হয় পুরুষ। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠানে নারীরাই দায়িত্ব পালন করে তারা নারী হয়েও সেসব প্রতিষ্ঠানের দিকে এগোয় না।

(আল মরিয়া-আল কানুন-পৃষ্ঠা– ৬, ৯, ১০)

এরপর অধ্যাপক আক্কাদ কয়েকটি শিল্পকর্মের উল্লেখ করে প্রমাণ করেন যে, প্রাচীনকাল থেকে এগুলো নারীদের পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসা সত্ত্বেও তারা এসব ক্ষেত্রেও পুরুষের পেছনে পড়ে রয়েছে অথচ পুরুষ জাতি সম্প্রতি এসব মেয়েলি কর্মে হাত দিয়েছে।

দুজন ডাক্তার এর মধ্যে একজন একটি বিশেষ চিকিৎসা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আমি আমাকে জানিয়েছেন যে, "মহিলা ডাক্তারের তুলনায় পুরুষ ডাক্তারকে নারী সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসার জন্য বেশি উপযুক্ত মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো লোকের ধারণা ছিল যে, আজকাল বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে মহিলা ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এখন নারী সংক্রান্ত রোগ ব্যধির চিকিৎসা তারা নিজেরাই উত্তমভাবে করতে পারে এবং পুরুষ ডাক্তারেরা এ জটিলতা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ ধারণা যথার্থ ছিল না এবং নারী সংক্রান্ত রোগ ব্যধির চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তারদের প্রয়োজনীয়তা এখনো রয়েছে।"

এভাবে বিখ্যাত চিন্তাবিদ অধ্যাপক মোহাম্মদ যাকী আবদুল কাদেরী আস্‌সাহফী বলেন, "সেদিন বেশি দূরে নয় যখন নারী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও অচল হয়ে পড়বে– যেভাবে তারা কর্মের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন প্রকৌশল, চিকিৎসা, আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি বিভাগেও অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। কারণ উল্লেখিত বিভাগসমূহে পেশাগত দায়িত্বে যে সাধনা ও পরিশ্রমের দরকার হয় তার চেয়ে অনেক বেশি সাধনা ও পরিশ্রমের দরকার হয় রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। আর তারা যদি এসব ময়দানে চলতে না পারে, তাহলে তাদের কাছ থেকে কোনো উন্নতির প্রত্যাশা কীভাবে আশা করা যেতে পারে? বস্তুত, তার কারণ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে তাদেরই বিশেষ কর্ম পালনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ীই তাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা দান করা হয়েছে।"

নারীদের কর্মতৎপরতা ও ইসলাম

নারীদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দুটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা জরুরি। এর একটি হলো তার স্বভাব প্রকৃতি এবং অন্যটি হচ্ছে শরীয়তের বিধান।

১. মহিলাদের কোনো কাজকে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম বা নিষিদ্ধ মনে করা যাবে না যতক্ষণ না তাতে কোনো রকমের অপরাধবোধ প্রকাশ পায়। ইতিহাসের সকল পর্যায়ে নারী তার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের সাথে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজকর্মও করে আসছে। অবশ্য এসব প্রাসঙ্গিক কাজকর্মকে কখনো অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়নি। যেমন নারী সবযুগেই রান্না-বান্না, সেলাই, সূচিশিল্প, সুতো কাটা, ফুলতোলা ইত্যাদি কাজ অংশ নিয়ে আসছে, এর সাথে সাথে সে সন্তানদের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান এবং স্বামীর সেবা-যত্ন ইত্যাদি স্বাভাবিক দায়দায়িত্বও পালন করে আসছে।

এসব কাজ সে স্বতঃস্ফূর্ত জন্মগত স্বভাবের তাগিদেই করে থাকে। তাকে এসব বাড়তি কাজ করার জন্যে জোর জুলুম করা হয় না। এসব কাজকর্ম যদিও তার বুনিয়াদী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়, তথাপি পুরো আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে নারী এসব করে থাকে।

ইসলাম কাজকর্মের বণ্টনের সময় এ বাস্তবতাকেও বিবেচনাধীন রেখেছে যা তাদের মানবিক স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং আলী (রা) ও ফাতেমা (রা) যখন নবী করীম ﷺ-কে তাদের নিজ নিজ কর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তখন নবী করীম ﷺ আলীর ওপর বাইরের কাজকর্মের দায়িত্ব এবং ফাতেমার ওপর ঘরোয়া কাজকর্মের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

ইসলাম একসাথে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে যে, ঘরে থেকে ছেলেমেয়ের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ এবং স্বামী সেবার দিকে মহিলাদের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই বেশি। আর তা তার বুনিয়াদী দায়িত্বের পরিপন্থীও নয় বরং এতে করে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক আরো মজবুত হয়ে ওঠে।

স্ত্রী যদি কোনো বিশেষ কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে থাকে এবং ঘরের পরিবেশে তা করতে চায় এবং তাতে করে তার আয় উপার্জনও হয় তাহলে তাকে তার কাজে বাধা দেয়া উচিত নয়, বরং স্ত্রীকে কর্ম করতে দেয়ার স্বাধীনতা দেয়া উচিত। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সে তার আসল দায়িত্ব ও কর্তব্য বাদ দিয়ে সারাক্ষণ শুধু সেই কাজের মধ্যেই নিয়োজিত থাকবে।

যেহেতু প্রতিটি কুমারী মেয়েকেই কোনো না কোনো দিন কারো স্ত্রীত্ব বরণ করতে হয় এ জন্যে বিভিন্ন পারিবারিক ও দাম্পত্য জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে

ইসলাম তার অধিকার স্বীকার করে; যাতে করে সে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের সমস্যাদি সমাধানের পন্থা জানতে পারে। সে এমন শিক্ষা অর্জন করবে যার মাধ্যমে সে তার তার কর্মক্ষেত্রের যাবতীয় বর্তমান বিষয়াদি ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিষয়াদির ব্যাপারে অবহিত হতে পারে।

২. প্রকৃতিগতভাবে যেহেতু নারীকে এরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে, এজন্যে তার এসব কাজকর্ম কোনো ভ্রান্তি বা সন্দেহের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বরং যেসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা অর্জনের মতো ক্ষমতা এবং গুণাবলিও তাকে দেয়া হয়েছে।

ঘরবাড়ি হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র। ঘরবাড়িতে অবস্থান করে নারী তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে এবং বাড়িতে অবস্থান করেই সে যাবতীয় বিপদ ও অপমানের হাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ঘরবাড়িতে সে পায় পরম সুখ স্বস্তি ও অনাবিল আনন্দ। তাই ঘরবাড়িকেই নারীর ভূস্বর্গ বলা হয়ে থাকে এবং ইসলাম এ বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখেই বলেছে–

"তোমরা যেমন তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করবে না তেমনি তারা নিজেরাও বের হবে না।" (সূরা তালাক : আয়াত-১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী বলেন, "স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার কোনো অধিকার কোনো স্বামীরই নেই এবং কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া স্ত্রীর জন্যেও বৈধ নয়।"

(জামেউল আহকামুল কুরআন ঃ অষ্টাদশ খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

এ আয়াতটি আসলে ইদ্দত সংক্রান্ত আয়াতের ধারাবাহিকতাতেই নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর আদেশ সাধারণ স্ত্রীদের বেলায়ও সমানভাবে কার্যকারী হবে।

ইমাম মালেকের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আরাবী বলেন, "ইদ্দতকালীন অবস্থায় নারী নিজের ঘর থেকে মোটেই বের হবে না, অবশ্য অপরিহার্য প্রয়োজনে বের হতে পারবে আর তখন সে সাধারণ স্ত্রীদের মতোই বেরুতে পারবে, কারণ ইদ্দত বিয়েরই অন্যতম শাখা।"(আহকামুল কুরআন ইবনে আরাবী, দ্বিতীয় খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা)

ফিকাহ ও তাফসীর বিশেষজ্ঞদের মতে, আল্লাহ তাঁর বাণীতে নারীদের ব্যাপারেই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ ঘর প্রকৃত অর্থে স্বামীদের মালিকানায় হওয়া সত্ত্বেও তা নারীদের ঘর বলেই ধরা হয়েছে কারণ নারীকে সারা জীবন তার স্বামীর ঘরেই থাকতে হয় এবং বিনা দরকারে সেই ঘর থেকেই বের হওয়ার অনুমতি নেই। এ জন্য ঘরকে নারীদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(আহকামুল কুরআন লিল জাস্‌সাস) আল্লামা কাসানী এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "বিয়ের পর নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ আর তা এ জন্যই যে পবিত্র আয়াতের আদেশমূলক পরিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।"

(বাদয়েউ সমান্না'লিল কাসানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৩)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীর পক্ষে ঘরে অবস্থান করাটা তার প্রকৃতি এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও জরুরি। অবশ্য প্রয়োজনবোধে সে বাইরে বের হতে পারে। সেই স্বাধীনতা তার রয়েছে তবে তা লাগামহীন হবে না।

নবী করীম ﷺ বলেছেন, "মহিলাদের মসজিদে যেতে বাধা দিও না। কিন্তু তাদের গৃহ তাদের জন্য অধিকতর উত্তম।" (আবু দাউদ)

যেহেতু ইবাদতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ মানুষের জীবনে হতে পারে না, তাই নারীদেরকেও ইবাদতের জন্য মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তবে এটাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, নারীদের জন্যে ঘরের নামায মসজিদের নামাযের চেয়ে উত্তম। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, ঘরকে মসজিদের চেয়ে উত্তম বলা হচ্ছে। এটা শুধু নারীদের সুবিধার্থেই বলা হয়েছে। নয়তো অন্যান্য অনেক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে মসজিদ। কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ স্থানের চেয়ে নারীদের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে তার গৃহকে। এর উদ্দেশ্য হলো তার মান মর্যাদার নিরাপত্তা বিধান করা। কারণ ঘরের বাইরে নারী যে কোনো সমস্যা বা বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। মহিলাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে এ ছিল দুটি বিষয়। এ দুটি বিষয়কে বিবেচনায় রাখলে কোনো ভুলভ্রান্তি হওয়ার আশংকা থাকে না।

প্রথমত, এ যে আনুষঙ্গিক কাজকর্মে তৎপর হওয়া ভালো, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার আসল দায়িত্বে অবহেলা না করা হয়। কারণ তাতে করে তার নারীত্বে স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ব্যাহত হবে।

দ্বিতীয়ত, এই যে, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে নারীর স্বাভাবিক স্থান হচ্ছে তার গৃহ। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই তার জন্যে এ স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং বিনা দরকারে ঘর থেকে বের হওয়া তার জন্য উচিত নয়।

ইমাম মালেকের ভাষায় তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, "সে সব ক্ষতি ও বিপদদের হাত থেকে বেঁচে থাকা যার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।"

ইসলাম নারীদের তাদের স্বভাবসম্মত ক্ষেত্র সীমায় থেকে যে কোনো ধরনের দৈহিক ও মানসিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে। কোনো নারী শহরে হোক বা গ্রামে, বেতনভুক্ত হোক বা অবৈতনিক যে কোনো কর্ম করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে- সে লেবাসে পোশাকে, চরিত্রে, শিষ্টাচারে, ব্যবহারে, ইসলামের নির্ধারিত নীতি ও ব্যবস্থাবলি মেনে চলবে এবং পর পুরুষের সাথে বেপর্দা হবে না।

ইসলাম নারীদেরকে ক্ষেত খামারে গিয়ে কাজ করার এবং নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বেচা-কেনা করার স্বাধীনতা দিয়েছে। যেমন তারা নিজের জন্য বা পরিবারের লোকদের জন্যে খাদ্যদ্রব্য বা পোশাক পরিচ্ছদ কেনাকাটা করতে পারে। এছাড়া সে জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যেও বের হতে পারে। যেমন কোনো ওয়াজ-নসীহত বা ইসলামী আলোচনা সভা-সম্মেলন ইত্যাদিতেও অংশ নিতে পারে যাতে তার নিজের বা অন্যান্যদের কল্যাণ রয়েছে।

মুসলিম শিক্ষিতা নারী মানুষের দ্বীনি সমস্যাবলিতে অভিমত বা রায় দিতেও পারে এবং সিদ্ধান্তও ঘোষণা করতে পারে। কারণ ইসলামী আইনবিধি অনুযায়ী অভিমত বা রায় দেয়ার জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বিচার করার যোগ্যতাও রাখে।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় তারা মুজাহিদদের সাহায্য করার জন্যে রণাঙ্গণেও যেতে পারে। যেমন আহত সিপাহীদের চিকিৎসা, পথ্য ও ঔষধ সেবন এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাজ করতে পারে। নির্ভরযোগ্য নিখুঁত বর্ণনা মোতাবেক নবী করীম ﷺ-এর আমলে মুসলিম মহিলারা নবী করীম ﷺ-এর অনুমতি নিয়ে জিহাদের ময়দানে যেতেন। সিপাহীদের দেখাশোনা, ব্যান্ডেজ বাঁধা এবং অন্যান্য চিকিৎসা সেবা করার দায়িত্ব ছিল তাদের ওপর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম আহমদ বিনতে মউজের উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন- "আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে জিহাদে যেতাম, আমাদের কাজ ছিল সিপাহীদের খেদমত করা, তাদের পানি সরবরাহ করা এবং হতাহতদের মদীনায় পৌঁছানো।"

শুধু তাই নয় মুসলিম নারী রণাঙ্গণে অস্ত্র পরিচালনাও করতে পারে। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী আবু তালহা (রা)-এর স্ত্রী রমীসা (রা) হুনাইন যুদ্ধের সময় একটি খঞ্জর নিজের কাছে রাখেন- যখন তাঁর স্বামী এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি জবাবে বলেন, এটা আমি এজন্য রেখেছি যে, যদি কোন

মুশরিক আমার কাছে আসার চেষ্টা করে তাহলে আমি তার পেট চিরে দেব। এ খবর নবী করীম ﷺ কাছে পৌঁছলে তিনি এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি প্রকাশ করেননি।

ইবনে হাজাম বলেন, নারীকে বিচারপতির দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। ইমাম আবু হানীফাও এ মতের সমর্থন করেন। ওমর (রা) সিকা নামক এক মাহিলাকে হাটবাজার সংক্রান্ত বিষয়াবলির তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত করেছিলেন।

নারীদের এসব দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে কেউ যদি এ হাদীসটির উল্লেখ করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "কোনো জাতি কল্যাণ পেতে পারে না যদি তার বিষয়াবলির চাবিকাঠি নারীর হাতে থাকে।"

আসলে এ কথাটি নবী করীম ﷺ খিলাফতের সাধারণ বিষয়াবলি সম্পর্কে বলেছেন। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর একটি হাদীস হচ্ছে, "নারী তার স্বামীর ধনসম্পদের সংরক্ষণকারিণী। তাকে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

এ হাদীস অনুযায়ী ইমাম মালিক একথা বলেছেন যে, "নারীকে তত্ত্বাবধায়িকা, কৌশুলি এবং বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়াদির দায়িত্বশীলা হিসেবেও নিয়োগ করা যেতে পারে। কেননা এ ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ নেই।"

(মুহাল্লা-নবম খণ্ড-৪২৯-৪৩৫)

মহিলাদের চাকরি-বাকরী

উপরের আলোচনা থেকে এটা জানা গেল যে, কোনো মহিলা একান্ত অপরিহার্য কারণ ছাড়া বাইরে যাবে না এবং দরকারবশত: গেলেও ঘর-সংসারের আসল দায়িত্ব ভুলে গিয়ে অন্য কোনো কাজে দিনমান নষ্ট করে আসবে না। সুতরাং কোনো মহিলার জন্য ঘর সংসারের দায়িত্বে অবহেলা করে কলকারখানা বা দোকানপাটে অন্য কোথাও নিয়মিত চাকরি করতে যাওয়া বৈধ নয়, যেমনটি আজকালকার মহিলারা করাচ্ছেন। কারণ এভাবে নারীর কর্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘিত হয়। এভাবে সে তার ক্ষমতা ও গুণাবলিকে এমন স্থানে ও এমন কাজে ব্যবহার করার প্রয়াস পায় যা তার আদৌ কর্মস্থান নয় বা তার দায়িত্বও নয়। নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। তাছাড়া বাইরে চাকরি করতে গিয়ে আরো কতো যে অবাঞ্ছিত বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। যেসব মহিলা চাকরি করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা নিম্নে আলোচনা করছি।

প্রথমত : সাধাণত: তাদেরকে ভোরে কর্মস্থলে রওয়ানা হয়ে যেতে হয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাদেরকে এ রুটিনকে মেনে চলতে হয়। এমনকি জীবনের শেষ দিরেক এ চাকরি থেকে তারা অবসর গ্রহণ করে অথবা অযোগ্যতার জন্য তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এ নিত্যদিনের বহির্গমন সম্পূর্ণ অবৈধ। এতে তাদের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই অনেক বেশি এবং তা শান্তি, স্বস্তি ও শৃঙ্খলারও পরিপন্থী। এছাড়া স্ত্রী যখন স্বামীর মতো স্থায়ী আয় উপার্জন করবে তখন তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমন পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা হারাবে তেমনি উভয়েই শান্তি ও স্বস্তির জন্যে উন্মুক্ত হয়ে থাকবে। উভয়েই সারাদিনের ক্লান্তির পর যখন ঘরে ফিরবে তখন উভয়েই পরদিন ভোরে চাকরিস্থলে যাওয়ার আগে তরতাজা হওয়ার জন্যে করো সহযোগিতার প্রত্যাশা করবে।

এভাবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই যখন ঘরের বাইরে চাকরিতে থাকবে তো ঘরসংসারের ব্যবস্থাপনা কে সামলাবে আর স্বামীরা শান্তি আর স্বস্তি খুঁজতেই বা কোথায় যাবে? সারাদিনের ক্লান্ত স্ত্রী তাকে তার প্রত্যাশিত শান্তি ও স্বস্তি যোগাতে পারবে কি? পারবে কি তাকে সজীবতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে?

এতে করে বোঝা গেল যে, নারীর পক্ষে চাকরি করতে যাওয়া তার নিজের জন্য, স্বামীর জন্য এবং পারিবারিক তথা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তা অন্যায়। আর আল্লাহ তাদের সুখশান্তি ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য যে বিধান দান করেছেন, নারীদের চাকরি সে বিধানেরও বিরোধী।

দ্বিতীয়ত : যে চাকরিতে নারীর সময় ও জীবন নষ্ট হচ্ছে, যার চিন্তায় সে সততঃ উদ্বিগ্ন তা তার চিন্তাধারা, আদর্শ, পোশাক পরিচ্ছদ, শালীনতা, চরিত্র, রুচি ইত্যাদির ওপরও বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। তার জীবন হয়ে ওঠে বিরক্তিকর ও বিবর্ণ। মাসের পরে কয়েকটি টাকার লোভে সে তার জীবনের অনেক অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। সে নিজের বিবেকের কাছেও ছোট হয়ে থাকে। পরিণামে তার জীবন জড়পদার্থের রূপ ধারণ করে। সে তখন টাকা ছাড়া আর কোনো বিষয়কে মর্যাদাপূর্ণ বলে ভাবতেই পারে না। সে টাকার প্রতিযোগিতায় পড়ে অন্যের দেখাদেখি দিন-রাত অর্থের পিছনে ছুটতে থাকে। পরশ্রীকাতরতা আর অনুকরণের ব্যাধিতে সে এমনই আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, অবশিষ্ট জীবনে এর নিষ্ঠুর কবল থেকে মুক্তির কোনো পথই খুঁজে পায় না। ফলে যথেষ্ট টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও মুহূর্তের জন্যেও শান্তি ও স্বস্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

চিন্তা ও অনুভূতির এ প্রকৃতি তার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে দেয়। বেশি বেশি অর্থ ও স্বার্থের মোহে তার মানসিক আত্মা দারুণভাবে পীড়িত হয়। জীবনের সব মূল্যবোধ ও মহৎ চিন্তা বাদ দিয়ে সে কেবল সম্পদ অর্জনের চেষ্টাতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর এটাই তার স্বাভাবিক সৃষ্টির উদ্দেশ্য, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও বিকাশের পথে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হিসেবে সামনে দাঁড়ায়। এসব কারণে নারীকে বাইরে গিয়ে চাকরি করা উচিত নয়।

নারীর অর্থনৈতিক ব্যস্ততা ও জড়বাদী ধ্যান-ধারণা তার গর্ভধারণের অর্থাৎ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা লুপ্ত করে না সত্য কিন্তু তাতে করে যে নারীত্বের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ নারীত্ব কেবল দেহ ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সক্ষমতার নামই নয় বরং তার সাথে সাথে আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধি ও মান অনুযায়ী চিন্তা ও কর্মের একতা এবং বিশেষ প্রাকৃতিক বিধি অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে নারীত্বের পূর্ণতা ও সার্থকতা। কিন্তু যারা এ মৌলিক ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করে জড়বাদী কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করে তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অবমাননা নিজেরাই করে থাকে। কারণ এতে করে তারা তাদের জীবনের পরম লক্ষ্যপথ থেকেই বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

এখন আসুন, এ ধরনের পরিবেশে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের ধরন সম্পর্কে চিন্তা করে দেখি। নারী যে কয়টি টাকার জন্য তার দেহ-মনের সব ক্ষমতা বিকিয়ে দেয় তাতে আসলে স্বামী বা পরিবারের কারো কোনো উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না; বরং সারাক্ষণ চাকরি ও টাকার চিন্তায় বিভোর থাকার ফলে দেহমনের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। ফলে সে যথার্থভাবে স্ত্রীত্বের বৃহত্তর দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে যায়। সে কাউকে শান্তি ও স্বস্তি দেবে কি করে যখন সে নিজেই তার স্বামীর মতো শান্তি ও স্বস্তি লাভের প্রত্যাশী হয়ে থাকে?

এছাড়া স্বামীর মতো স্ত্রীও আয় করে তাদের দায়-দায়িত্বের মধ্যেও কোনো বৈচিত্র থাকে না। এতে করে তাদের মধ্যে এক ধরনের যে অর্থনৈতিক অনুভূতির সৃষ্টি হয় তাতে করে তারা পরস্পরের পৃথক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। সুতরাং পরস্পরের প্রতি তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণে ভাঁটা পড়ে। ফলে নারী তখন এ জন্য স্বামীকে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না যেহেতু সেও তার মতো টাকাকড়ি আয় করছে এবং সংসারের ব্যয়ভারও নির্বাহ করছে। এরপর বলুন, কোন সে অনুভূতি তাদের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ককে মজবুত ও স্থিতিশীল করবে এবং কেনইবা তারা পরস্পরকে শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন করবে?

স্বভাব প্রকৃতি ও আল্লাহর আইন হচ্ছে, নারী পুরুষের জন্য শান্তি ও স্বস্তির উৎস হবে। তা স্বামীর কি এমন স্ত্রীর কাছে শান্তি ও স্বস্তি পেতে পারে যে বাইরে অন্য কোথাও কারো অধীনে চাকরী করছে? আর যখন ঘরে ফেরে তখন তার এমন অবস্থা থাকে যে, সে নিজেই শ্রান্তি-ক্লান্তি দূরীকরণের জন্য অন্যের সাহায্য কামনা করে। এমন স্ত্রী, যে সারাদিন দৈহিক ও মানসিক খাটুনি আর দৈনিক আয়ের চিন্তায় মুষড়ে থাকে সে স্বামীকে শান্তি ও স্বস্তি পৌঁছানোর বাড়তি ক্ষমতা অবশিষ্ট রাখে কি? উভয়েই যখন একই অবস্থার শিকারে বিব্রত তখন কে কাকে সান্তনা দেবে, কে কার অনুপ্রেরণা যোগাবে? উভয়ই যখন দৈহিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত তখন কে কার সেবা যত্ন করবে? উভয়ই যখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরে ব্যস্ত থাকে তাহলে ঘরের ব্যবস্থাপনা আর সন্তানদের লালনপালন ও নৈতিক প্রশিক্ষণ কে দেবে? উভয়ই যখন কাজে রুক্ষ ও খিটখিটে হয়ে ঘরে কেরে তখন কে কাকে আনন্দ যোগাবে, মিষ্টি কথায় কে কার মন ভুলাবে? এমতাবস্থায় একে অন্যের ওপর যেমন নির্ভরশীল হওয়ার অনুভূতি রাখে না তেমনি কেউ কাউকে সহানুভূতি ও স্নেহ-ভালোবাসা দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না।

বস্তুতঃ গৃহস্থ নারীই কেবল পুরুষকে সান্ত্বনা স্বস্তি ও আনন্দ দিতে পারে। এ ধরনের নারী থেকেই পুরুষ পায় নব উদ্যম ও সজীবতা, পায় উৎসাহ উদ্দীপনা। এ মন স্ত্রীই স্বামীকে দিতে পারে পূর্ণ তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি। এতে পুরুষের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং শক্তি ও নতুন সাহসের সঞ্চারে সে হয় উজ্জীবিত।

বলা বাহুল্য, যখন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে শান্তি, স্বস্তি ও অনুপ্রেরণা পাবে না, তখন পুরুষও নারীকে তার কাম্য দৃঢ়তা, সমৃদ্ধি দিতে পারবে না। পারবে না তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে। এতে করে দাম্পত্য ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিয়েটাই হয়ে পড়বে অর্থহীন। পুরুষকে বাইরের কাজের এবং নারীকে ঘরের কাজের যে ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার সব কিছু বিশৃঙ্খল ও অব্যবস্থার শিকারে পরিণত হয়ে পড়বে। এভাবে আল্লাহ্ যে বিধান ঘোষণা করেছেন, তার সাথেও সুবিচার করা যাবে না। ফলে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন–

"পুরুষ নারীদের ওপর দায়িত্বশীল, এ বৈশিষ্ট্যের বুনিয়াদে যা আল্লাহ তাদের মধ্যে একে অন্যের ওপর দান করেছেন এবং এ বুনিয়াদে যে, তারা তাদের জন্যে (মোহর ও ভরণ পোষণের আকারে) নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করে থাকে।"

(সূরা নিসা : আয়াত-৬)

এ হচ্ছে ইসলামের বাস্তবভিত্তিক স্বভাবসম্মত বিধি যা নারীর মধ্যে স্নেহ, মমতা ও ধৈর্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে আর পুরুষের মধ্যে সৃষ্টি করে গঠনমূলক কর্মের উদ্দীপনা। এ কারণেই পুরুষ সব সময় নারীর সাহায্য-সহযোগিতা করে তার ভরণ-পোষণ, কামনা-বাসনা পূরণের ব্যবস্থা করে। আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি যে, এসব স্বভাবসম্মত আইন-কানুন ছাড়া পারিবারিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন ও স্থিতিশীল হতে পারে না। আর আল্লাহ পুরুষকে পরিবারের দায়িত্বশীল বলে ঘোষণা করে পরিবারের গঠন ও তার স্থিতিশীলতার ভিত্তি স্থাপন করেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষই হবে পরিবারের প্রশাসনিক প্রধান। সকলের সুযোগ সুবিধা ও প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব তারই এবং পরিবারের সব সদস্য তার সমর্থন ও আনুগত্য করবে। এ হচ্ছে বর্ণিত কোরআনী বিধির বাহ্যিক অর্থ। আর এর আধ্যাত্মিক দিক হচ্ছে এই যে, মানসিকভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ই কোরআনের এ বিধির সাথে একমত হবে এবং তা মেনে চলবে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে উভয়ই বা কোনো একজন এ বিধির পরিপন্থী কার্যকলাপে অংশ নেয় বা পরস্পরের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ করে তখন কোরআনী বিধির প্রত্যক্ষ উপকারিতা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে পড়বে। এভাবে তারা দাম্পত্য সম্পর্কের সুফল এবং পারস্পরিক সম্মান ও সমর্থন থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

নারীর বাইরে বের হওয়া এবং চাকরী করার ফলে দাম্পত্য সম্পর্কের যদি এমনই অবনতি ঘটে, যদি তারা অন্তরের সুখ-শান্তি ও পারস্পরিক ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে– যদি এর ফলে পারিবারিক ভাঙন-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তাহলে কোন যুক্তিকে বলা যাবে যে, নারীর চাকরীতে লাভ হবে বা দাম্পত্য সম্পর্কে উন্নতি ঘটবে? এ ধরনের ধারণা যারা পোষণ করে তাদের কাছে কোনো বাস্তব যুক্তিপ্রমাণ আছে কি? আর ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের অবাস্তব ও অকল্যাণকর কোনো কর্মের অনুমতি দেয় কি?

তৃতীয়ত : বর্তমান সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সত্যতা ও যথার্থ কল্যাণকারীতাকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের চাকরীর ফলে যে সকল তিক্ত পরিণাম পরিলক্ষিত হচ্ছে তা গোটা দুনিয়ার মানুষের সামনে ইসলামী শিক্ষার সত্যতা স্পষ্ট করে তুলছে। নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদেরকে এতটা লাগামহীন করে দিয়েছে যে, তারা আজ কোনো নীতি-নৈতিকতার ধার ধারতে প্রস্তুত নয়। আজ পাশ্চাত্যের প্রায় সকল যুবক যুবতী বিয়ের আগেই যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং কুমারী মেয়েদের গর্ভপাত ও কুমারী মা হওয়াটা পাশ্চাত্যের এক স্বাভাবিক ব্যাপারে

পরিণত হয়েছে। আর চাকরিরত বিবাহিতা বা অবিবাহিতা সকল মেয়ে বা মহিলাই পরপুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার বলেই বিবেচনা করে। মোটকথা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও সর্বজনীন ব্যভিচারের ফলে গোটা পাশ্চাত্যই আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

এ নির্লজ্জ পাশবিক উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম যখন ব্যাপকহারে অবৈধ অর্থাৎ জারজ সন্তানের প্রশ্ন দেখা দেয় তখন তারা এটাকে নিজেদের লাগামহীন যৌন অনাচারের সামনে একটা বড় প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। কারণ জারজ সন্তানের জন্মের পর তারা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য যৌনচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। বারে-ক্লাবে আর যত্রতত্র উচ্ছৃঙ্খলা প্রদর্শনের সুযোগ থাকে না। সুতরাং এ সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে তারা গর্ভনিরোধের উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছে। এখন তারা এ ব্যাপারে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে অবাধ যৌন স্বাধীনতা পাশ্চাত্যের নারীকে এ নতুন চিন্তার প্রতি আকর্ষিত করে তোলে যে, সারা জীবন একই পুরুষের সাথে কাটিয়ে দেয়া দরকার কি? আর নৈতিক ও চারিত্রিক বিধি নিষেধই বা মেনে চলতে হবে কেন? এসব বিধি নিষেধকে উপেক্ষা করে তো আরো অনেক কিছু অর্জন করা যেতে পারে।

পাশ্চাত্যের আধুনিক নারী এসব চিন্তার শিকারে পরিণত হয়ে যেসব পথ ও উপায় অবলম্বন করে তারই ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্যের গোটা সমাজে মারাত্মকভাবে পারিবারিক সম্পর্কের ভিত ধ্বসে পড়েছে। বিয়ে-শাদীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। সমাজে অবৈধ জারজ সন্তান এবং কুমারী মায়েদের সংখ্যা বিপুলহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর যারা বাহ্যত: বিবাহিত জীবন যাপন করছে তাদের মধ্যেও বহুগামী ও বহুগামিনীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে।

আধুনিক সমাজে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির বাস্তব ভিত্তির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে মনীষী সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ “পর্দা ও ইসলাম”-এ বলেছেন–

“নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি তাদেরকে স্বামীর মুখাপেক্ষিতা থেকে নির্লিপ্ত করে দিয়েছে। সেই চিরাচরিত নীতি যে, পুরুষ আয় উপার্জন করবে আর নারী ঘরের ব্যবস্থাবলি সম্পাদন করবে, তা এখন এ আধুনিক নীতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, নারী ও পুরুষ উভয়ই আয়-উপার্জন করবে এবং ঘরের ব্যবস্থাবলি বাজারের ওপর সোপর্দ করা হবে। এ বিপ্লবী পরিবর্তনের পর উভয়ের জীবনে শুধু এক যৌন

সম্পর্ক ছাড়া এমন কোনো সম্পর্ক অবশিষ্ট রইলো না, যা তাদেরকে পরস্পরের সাথে জড়িত থাকতে বাধ্য করবে। স্পষ্টতই, শুধু যৌন সম্পর্ক এমন কোনো বন্ধন নয়, যার জন্য নারী ও পুরুষ পরস্পরকে এক স্থায়ী সম্পর্কের বাঁধনে বেঁধে রাখবে এবং একই ঘরে যৌথ জীবন যাপনের জন্য বাধ্য করবে।

যে নারী তার নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করে এবং তার সকল চাহিদা পূরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ, জীবনে কোনো ব্যাপারে কারো সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষি নয়, সে শুধু যৌন তৃপ্তির জন্যে কোনো একটি পুরুষের অনুগত থাকবে? কেন সে নিজের ওপর এতসব চারিত্রিক ও আইনগত বিধিনিষেধ চেপে থাকতে দেবে? কেন সে একটি পরিবারের দায়িত্বের বোঝা বহন করবে? বিশেষতঃ যখন চারিত্রিক সাম্যের ধারণা তার পথ থেকে সেই সকল প্রতিবন্ধকতাও দূর করে দিয়েছে যা স্বাধীন যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আসতে পারে। সে তার যৌনতৃপ্তি লাভের জন্যে সহজ, চিত্তাকর্ষক ও আনন্দঘন পথ ছেড়ে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও দায়িত্বের বোঝায় ভারাক্রান্ত সেকেলে পন্থা কেন অবলম্বন করবে? ধর্মের ধারণা বিলুপ্তির সাথে সাথে পাপের চিন্তাও দূর হয়ে গেছে।

আর সমাজের ভয় এ জন্য নেই যে, সমাজ এখন তাকে ব্যভিচারিণী বলে ভর্ৎসনা করে না বরং তাকে উৎসাহিত করে। শেষ ভয়টি ছিল জারজ সন্তান জন্ম হবার। সে ভয় থেকেও মুক্তির জন্যে রয়েছে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থাবলি। এসব গর্ভনিরোধক ব্যবস্থাবলির পরও যদি গর্ভধারণ হয়ে যায় তাহলে গর্ভপাতের উপায় রয়েছে। এতেও যদি সফল না হয় তাহলে শিশুকে চুপচাপ হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু হতভাগিনী মাতৃ অনুভূতি (যা দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি)। শিশুকে হত্যা করা থেকে বিরত রাখে তাহলে জারজ সন্তানের মা হলেও তাতে কোনো বাধা নেই। কেন না, কুমারী মা এবং অবৈধ সন্তানের পক্ষে এতো বেশি প্রচার হয়েছে যে, এটাকে যারা ঘৃণার চোখে দেখার দুঃসাহস দেখাবে, তাদেরকে উল্টে-প্রতিক্রিয়াশীল বলে নিন্দা করা হবে এবং এ অপবাদ মাথা পেতে বরণ করতে হবে। এ হলো সেই অবস্থা যা পাশ্চাত্য সমাজের ভিত্তি ধ্বসিয়ে দিয়েছে।"

চিন্তার বিষয় এ যে, এই পথ অবম্বন করে যাদের পরিণাম এতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আমরা সেই ভুল পথ বাদ দিয়ে কেন আসল পথটি অবলম্বন করব না? কেবল এ ভাবেই তো আমাদের সমাজ মারাত্মক পরিণতির কবল থেকে বাঁচতে পারে। যারা অন্যের পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে তারা সত্যিই ভাগ্যবান লোক। দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর সত্য, সঠিক ও সত্য পথে পরিচালনা করেন।

নারীদের অধিকার সম্বন্ধে দুটি বড় অভিযোগ

কর্ম মহিলাদের স্বাভাবিক অধিকার

এ সমস্যা সম্পর্কে আমাদের মতবিরোধী আপত্তিকারীরা বলে থাকে যে, "কাজ করা নারীর স্বাভাবিক অধিকার।" কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনা করলে কথাটির অর্থ বের করা আপনার জন্যে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। যেমন, কাজ করা সম্পর্কে লোকদের ধারণা কি? এ প্রশ্ন এ হয়ে দেখা দেয় যে, স্বাভাবিকভাবে এ অধিকার মহিলাদের ঐসব অর্থনৈতিক অধিকারের মতো নয় যার আইনগত সমর্থন রয়েছে। আর তা এমনও নয় যা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে রেখেছে; বরং এ কথাটি ঐসব বিধিবিধানের পরিপন্থী বলেই প্রমাণিত হবে এবং ইতিপূর্বের আলোচনায় আমরা তা প্রমাণও করেছি।

মানব স্বভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা একথা জানতে পাই যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে বেশি কিছু অধিকার রাখে। যেমন মানুষের এটা অধিকার রয়েছে যে, যেহেতু সে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করেছে তাই তার স্বাধীনতার ওপর কোনো রকমের বিধিনিষেধ আরোপ করা চলবে না। কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই এ ধরনের লাগামহীন স্বাধীনতাকে কখনো সমর্থন করে না। একই কথা নারীদের তথাকথিত অধিকার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এটা জেনে রাখতে হবে যে, নারীকেও এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা বিপন্ন হতে পারে। শুধু তাই নয়, লাগামহীন স্বাধীনতার ফলে নারী তার আসল অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে। আর তার আসল অধিকার এই যে, সে এক আদর্শ স্ত্রী, মা এবং গৃহকর্ত্রী হবে– এ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা কারো নেই। বরং প্রতিটি নারীকে তার এ মৌলিক অধিকার দেয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র নারীর এ সব অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়।

এটা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, স্বাভাবিক যোগ্যতাই মানুষকে কোনো অধিকারের উপযুক্ত করে– সেখানে কোথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, যে অধিকার সে অর্জন করেছে তা থেকে উপকৃত হবার চেষ্টাও সে করবে। অর্থাৎ অধিকার হচ্ছে এমনই এক ফরয যা থেকে পালিয়ে বাঁচা সম্ভব নয়।

মানুষ স্বাধীন ঠিকই। কিন্তু তাই বলে অন্য কোন মানুষের স্বাধীনতা নিয়ে তামাশা করার অধিকার তার নেই। একইভাবে কেউ নিজেকে নিজে অপমানিত করার স্বাধীনতাও পেতে পারে না। অর্থাৎ স্বাধীনতা হবে গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক, স্বাধীনতা হবে সর্বজনীন। এমন কি কেউ এমন কোনো কর্ম করতে পারবে না যার কারণে তার ব্যক্তিগত মান-মর্যাদারও হানী হতে পারে।

যেমন নবী করীম ﷺ বলেছেন-

"কোনো মু'মিনের (জন্যে) এটা উচিত নয় যে, সে নিজেকে নিজে অপমানিত করে বসবে।" (ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুখারী শরীফ থেকে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।) এ থেকে স্বাধীনতা ও অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

সুতরাং নারী তার নারীত্বের অধিকার নিয়ে যখন কারো স্ত্রী, কারো মা এবং গৃহকত্রীর আসন অলঙ্কৃত করবে তখন তার ওপর এ দায়িত্বও বর্তায় যে, সে তার জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলিও পূরণ করবে। যাকে আমরা খোদায়ী নির্দেশ বলে আখ্যায়িত করে এসেছি। ইসলাম নারীর এসব অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তারিত এবং স্পষ্টভাবে বিধি-বিধান জারি করেছে। এখন সে তার অধিকার এবং দায়িত্ব কোনোটাকেই অবহেলা করতে পারবে না এবং এ ধরনের অবহেলা বা উপেক্ষা প্রদর্শনের কোনো অধিকারও তার নেই।

নারীদের অধিকার ও দায়িত্ব সংক্রান্ত ইসলামের এসব নীতি ও বিধির বাস্তবতা অস্বীকার করা কোনো বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং কোনো নারীর এ স্বাধীনতা বা অধিকার নেই যে, সে তার আসল কর্মক্ষেত্র গৃহ এবং তা আসল দায়িত্ব বাদ দিয়ে চাকরির পেশা অবলম্বন করবে। কারণ এটা তার আসল অধিকারকেই খর্ব করবে। এথেকে এখন এ কথা আরো পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, "বাইরে চাকরি করার এ অধিকার যেমন তার অর্থনৈতিক অধিকার বলে গণ্য নয় তেমনি ব্যক্তিস্বাধীনতার সাথেও এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং এটা তার স্বাভাবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তও নয়। এর পরও এটা বলব "নারীর জন্য বাইরে চাকরি করার অধিকার রয়েছে?" নিছক বাড়াবাড়ি ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের কথার কোনো যুক্তিগত ভিত্তি নেই।

মহিলাদের উৎপাদনশীল ক্ষমতা

যে কোনো কর্মের প্রতিফল হিসেবে সুফল ও কল্যাণের প্রত্যাশা করা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তামাম দুনিয়ার উন্নতির ভিত্তি প্রস্তর বলে বিবেচিত হয়। এজন্যেই মহান স্রষ্টা "আল্লাহ যে কোনো কর্মের পূর্ণাঙ্গতা সৌন্দর্য এবং শৃংখলাকে বাধ্যতামূলক" করে দিয়েছেন।

(আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)

এবং "আল্লাহ তা'আলা এটা পছন্দ করেন যে, তাঁর বান্দা যখন কোনো কাজ নিজের হাতে নেয় তখন তা যেন সূচারুরূপে এবং দক্ষতার সাথে করা হয়।" (হাদীস বায়হাকী শোআবুল ঈমান)

এখন প্রশ্ন ওঠে, কোনো দুর্বল বা অনভিজ্ঞ লোক যদি কোনো কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে তাহলে যথার্থভাবে সে কাজ করা কি তার পক্ষে সম্ভব? অথচ দৈহিক এবং মানসিকভাবে সংশ্লিষ্ট কাজ কর্ম করার মতো কোনো যোগ্যতাই তার নেই।

এ থেকে অবশ্য আমরা শুধু এটাই বুঝাতে চাচ্ছি না যে, পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীদের অনুপ্রবেশের ফলে বিরাট বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মহিলাদের চাকরিতে নেমে আসার ফলে যোগ্য ও সক্ষম পুরুষরা চাকরির সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু নারীদের চাকরির ফলে কলকারখানার উৎপাদন যে হারে কমে গেছে এবং নারীদের অযোগ্যতা ও অব্যবস্থার ফলে অফিস আদালতে যেভাবে স্বাভাবিক কাজকর্মের গতি ব্যাহত হচ্ছে, তার দিকে অবশ্যই আমরা ইঙ্গিত করব।

এ থেকে আজ এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, দৈহিক ও মানসিকভাবে দুর্বল নারীদের পক্ষে কোনোভাবে সেসব কাজকর্ম করা সম্ভব নয় যা পুরুষের পক্ষে সহজেই সম্ভব। অবস্থা যখন এই, তখন আমাদের জিজ্ঞাসা যে, এসব জেনে বুঝে-দেখে শুনেও কেন নারীদের দুর্বল কাঁধের ওপর এতো বড় দায়িত্বের ভারী বোঝা চাপানো হচ্ছে? কোন এভাবে জাতীয় উন্নয়নের গতিধারায় মন্থরতার সৃষ্টি করা হচ্ছে? যে কাজ নারীদের নয়, যা তাদের সাধ্যের বাইরের কাজ তা করার জন্য তাদের বাধ্য করা হচ্ছে কেন? এভাবে কি আমরা ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ ব্যক্তি রক্ষা করতে গিয়ে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি না? অথচ, আল্লাহ কোনো কাজে অবহেলা ও অদক্ষতার পরিচয় দিতে বারণ করেছেন, কারণ তা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী।

এ ধরনের উদাসীনতা ও খামখেয়ালির প্রত্যক্ষ পরিণাম খুবই মারাত্মক। আল্লাহ মানুষকে উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখতে বলেছেন, মানুষ প্রতি মুহূর্ত সক্রিয় থেকে তার ক্ষমতা ও দক্ষতাকে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহার করে অগ্রগতির নিত্য নতুন মঞ্জিল অতিক্রম করবে– এটাই আল্লাহর উদ্দেশ্য এবং সেই হিসেবেই আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে বিভিন্ন গুণাবলি ও ক্ষমতা দান করেছেন।

আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মানবতার মুক্তিদূত নবী করীম ﷺ বলেছেন– "আল্লাহ যে কোনো কাজের পূর্ণাঙ্গতা, সৌন্দর্য ও শৃংখলাকে বাধ্যতামূলক করেছেন।"

এ হাদীস দ্বারা এটা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী যোগ্যতা, ক্ষমতা এবং উপায় অবলম্বন দান করেছেন। আল্লাহর দেয়া এ মহান দানের ব্যবহার সচেতন বা অচেতনভাবে অবহেলা করাটা হবে সামগ্রিক উন্নয়নের পথে এক বিরাট অন্তরায়। তাছাড়া এ ধরনের অবহেলা মানবজীবনের একটা কলঙ্ক হিসেবেও বিবেচিত হবে। অন্যকথায় আল্লার দেয়া যোগ্যতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার বা তার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শনের অর্থ হবে আল্লাহর আইনের অবাধ্যতা।

যাহোক, চিন্তার বিষয় শুধু এই যে, যখন বস্তুগত উন্নতির পথও রুদ্ধ হয়ে আসবে তখন মানুষের উন্নত ইচ্ছা বাসনা শীতল হয়ে আসবে, মানুষের বিবেক বুদ্ধির সিদ্ধান্তও নাকচ হয়ে যাবে, আল্লাহর আইনেরও অমান্য করা হবে তখন ধ্বংস ও অবনতির কবল থেকে মানবতাকে কে রক্ষা করবে? কে তাদের শিক্ষা ও সভ্যতার স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দেবে?

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকে ইসলামী আইন, ইসলামী জীবন বিধান ও আদর্শের বাস্তবতা, স্বাভাবিকতা, সহজ সুন্দর এবং ভারসাম্যপূর্ণতা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইসলাম মানুষের আয় উপার্জন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও পথ-নির্দেশ করেছে, ইসলামের এ ব্যবস্থাটা কত সুন্দর তা লক্ষ্য করার বিষয়। যেমন ছেলে-মেয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদের পিতার ওপরই ন্যস্ত থাকে এবং বালেগ হওয়া পর্যন্ত পিতাই সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য দায়িত্বশীল থাকেন।

কিন্তু মেয়ে সাবালিকা হবার পরও বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পিতার দায়িত্বে থাকবে এবং বিয়ের পর তার সব দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত হবে। স্বামী যদি তাকে তালাক দিয়ে থাকে তাহলে আবার তার ভরণপোষণের বা অন্য কোনো প্রয়োজন

পূরণের জন্যে চিন্তাগ্রস্ত হতে হয় না। এ ব্যাপারে নারীর অধিকার সম্পর্কিত ইসলামের ব্যাপক বিধিব্যবস্থা রয়েছে। এখানে ওসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে আরো একটা বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যদি নারীর পিতা, স্বামী বা অন্য কোনো প্রত্যক্ষ দায়িত্বশীল নাও থাকে তাহলেও তাকে অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে না। কারণ এমতাবস্থায় ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর তার দায়িত্ব ন্যস্ত করে। সুতরাং সরকার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে তার নিজস্ব তহবিল থেকে এ ধরনের অসহায়া বা অবলম্বনহীনা নারীর ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব পালন করবে।

এ অবস্থা ও পরিস্থিতিকে বোঝার জন্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিশুদ্ধি দরকার এবং এ ভুল ধারণার অপনোদন একান্তই অপরিহার্য যে, "নারী চাকরি না করলে উন্নয়নের পথে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবে।" এটা খুবই ভুল ধারণা। আসলে নারীর প্রকৃত উন্নতি হচ্ছে এই যে, তার মানবিকতার মান উন্নত হবে, জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ ঘটবে, চারিত্রিক গুণাবলি বাড়বে, সবরকমের মন্দ প্রভাব থেকে মনপ্রাণকে মুক্ত ও পবিত্র রাখবে। এর পরিবর্তে কেউ যদি নারীর উন্নতি বলতে এটা বোঝে যে, তারা বাইরে বেরিয়ে চাকরি করবে, দোকানে, দফতরে, কলকারখানায় ও ক্লাবে, নাট্যশালায় ঘুরে বেড়াবে তাহলে তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছে। কারণ, নারীর বাইরে বের হওয়াতে তার কোনো উন্নতি তো নেই-ই বরং তার অপমান ও অমর্যাদারই আশংকা বেশি থাকে। বাইরে বের হওয়াতে নারীর লাভের চেয়ে ক্ষতি এবং উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়।

এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, নারীদের কল্যাণ ও প্রকৃত উন্নতির দিকে আমাদের অনেকেই দুরদর্শিতার পরিচয় দেন না। নারীর নম্রতা, শান্তিপ্রিয়তা, স্নেহ ভালোবাসা ও মহত্ত্বের মতো উন্নত মূল্যবোধসমূহকে আমরা প্রায়ই উপেক্ষা করি। নারীর নারীসুলভ কাজকর্মকেও আমরা যথার্থ গুরুত্ব ও মূল্য দিচ্ছি না। অথচ এসব মূল্যবোধ ও কাজকর্মই নারীকে তার প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা দান করে। অথচ তার এই আসল বিষয়টিকে বিবেচনা না করে, নিছক তার অর্থনৈতিক মুক্তির সস্তা শ্লোগান তোলা হচ্ছে।

নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র, তার অধিকার ও মর্যাদা এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। নারীর যে আধ্যাত্মিক মান মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে তার তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে আমরা ইমরানের স্ত্রীর সেই মহৎ ও মহান মননশীলতার দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছিলাম, যা মাতৃত্বের এক অমর স্বাক্ষর হিসেবে পবিত্র কুরআনের আয়াতে চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ইমরানের স্ত্রী (মরিয়মের মা) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "ওগো আমার প্রতিপালক! আমি এই সন্তানকে, যা আমার গর্ভে রয়েছে, তোমাকে উৎসর্গ করছি।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩৫)

এ প্রার্থনা থেকে একজন নিঃস্বার্থ মানবতার দরদি মা এবং একজন স্বার্থপর সংকীর্ণমনা নারীর মধ্যকার বিরাট পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আদর্শ মা তার সন্তানের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবতার বৃহত্তর কল্যাণ কামনা করে আর একজন বিভ্রান্ত বস্তুপূজারী নারী তার সন্তানের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করে সামান্য অর্থের জন্য নিজের নারীত্বকে ধুলোয় লুটিয়ে দেয়। একজন আদর্শ স্ত্রী, মা ও গৃহিণী তার অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও সন্তুষ্ট। আর অন্য একজন নারী তার অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে নির্লিপ্ত থেকে নিজের এবং অপরাপর মানুষের জীবনকে করে তোলে বিড়ম্বনাময় ও বিপদগ্রস্ত।

আজকের আধুনিক নারীর এ অধঃপতনের সমস্যা কোনো জাতি বিশেষের সমস্যাই নয় বরং এর বিষাক্ত প্রভাব গোটা দুনিয়ার মানবতাকে আক্রান্ত করে ছেড়েছে। সুতরাং এর সমাধান ও প্রতিকারের ভার ব্যক্তিবর্গের ওপর ছেড়ে না দিয়ে সামষ্টিকভাবে সব মানুষকেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। কারণ ব্যক্তিগতভাবে লোভ ও কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বেশি বেশি টাকা পয়সা উপার্জনের জন্যে লালায়িত থাকে। তাছাড়া এমন কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শন করে নারীদের ওপর বাড়তি দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং নিজেদের অপরাধী মুখ ঢাকা দেয়ার জন্যে বলে থাকে যে, "নারীর চাকরি করাটা আজকের সামাজিক প্রয়োজন।" তাদের মতে "নারীর চাকরি করা ছাড়া নাকি জীবন অপূর্ণ থেকে যায়।"

আসলে এ ধরনের কথা কেবল লোভী-স্বার্থপর শ্রেণীর লোকেরাই বলে থাকে। তাদের কথা অনুযায়ী যদি নারীকে চাকরির বাহানায় লাগামহীন ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে উন্নত গুণাবলিসম্পন্না ও চরিত্রবতী স্ত্রী অথবা মা সৃষ্টি হবে কোথা থেকে? পরিবারের সংরক্ষিতা, তত্ত্বাবধায়িকা ও সমাজ সংস্কারিকা মা আসবে কোত্থেকে? এ ধরনের আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মা ছাড়া উন্নত ও পবিত্র সমাজ এবং সভ্যতার বিকাশ ঘটবে কেমন করে? সুতরাং আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, নারীর স্বার্থে তথা মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে, ইসলামী শিক্ষার আলোকে, রাষ্ট্র ও সরকার এ সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত এবং প্রত্যক্ষ করে পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

এক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার যেসব বাস্তবভিত্তিক বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে তা থেকে বিরাট সহায়তা নেয়া যেতে পারে। বস্তুত, ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন করেই নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য যাবতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। পরিবার ও সমাজ গঠনে নারী যে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব স্বামী, পিতা, সমাজ এবং রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত করে রেখেছে। যেন কোনো রকমে অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তায় নারীর আসল দায়িত্ব পালনে শিথিলতা দেখা না দেয়। নারী তার সন্তান ও পরিবারকে উত্তম গুণাবলিতে গড়ে তোলে শুধু তার নিজ পরিবারেরই উপকার করে না বরং এ থেকে সমাজ, রাষ্ট্র তথা গোটা বিশ্বমানবতাই উপকৃত হয়।

এ প্রসঙ্গে চমৎকার ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে মিশরের বিখ্যাত প্রগতিবাদী সাংবাদিক আনিস মঞ্জুর আল আখবার পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলেন–

"দাম্পত্য জীবনের সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, আমরা এসব কাজকে কোনো কাজ বলে বিবেচনা করি না। অথচ এটাও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক কর্ম এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে তো এখন এজন্যে নিয়মিত পারিশ্রমিক দেয়া হচ্ছে কারণ তারা গৃহের কাজকর্ম করে। সেদিন আর দূরে নয়, যখন আপনারা দেখবেন যে, নারীকে চাকরি অথবা সন্তানের লালন-পালন উভয় কর্মের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণের প্রস্তাব করা হবে, সে এর কোনো একটা গ্রহণ করতে পারে। তখন আপনারা অবশ্যই দেখবেন যে নারী সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বটাই আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততবোধ করবে না।"

বস্তুতঃ মানবতার ভবিষ্যৎকে সুন্দর ও শান্তিময় রাখার একমাত্র পথ হচ্ছে এই যে, নারীকে তার আসল মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে, তাকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তার আধ্যাত্মিক মর্যাদা অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে কতটা উন্নত ও অধিকতর উপকারী। আর সামষ্টিকভাবে সকল মানুষকে, মানবিক গুরুত্ব ও মর্যাদা অর্জনের জন্যেও এটা জরুরি যে, তারা উভয়েই নর ও নারী হিসেবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবস্থান করে নিজের অধিকার, মর্যাদা, গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে, উভয়েরই গুরুত্ব বরাবর।

পরিশিষ্ট

তথাকথিত আধুনিকতার শিকারে পরিণত হয়ে কি নারী নিজের সাথে সুবিচার করছে?

এখানে আধুনিকতা বলতে পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তাকে বোঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন এ জন্যই অনুভব করেছি যে, আমরা মানি বা না মানি– একথা সত্য যে, আজকাল ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত একশ্রেণীর মুসলিম নারীও এ তথাকথিত আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকে নিজেদের ফ্যাশনে পরিণত করে নিয়েছে। তারা অজ্ঞতাবশতঃ নিজেদেরকে পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যের বর্ণে বর্ণিত করার ব্যাধিতে ভুগছে। এ ব্যাধিকে আরো আকর্ষণীয়ভাবে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করছে কতিপয় অপরিণামদর্শী সাহিত্যিক। এরা বিশেষ করে যুবক যুবতিদের পাশ্চাত্য প্রীতির তালিম দিয়ে থাকে এবং পাশ্চাত্যের যে কোনো রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরার জন্যে জনসাধারণকে উৎসাহিত করে।

পাশ্চাত্যের উৎকট ভোগবিলাস ও ফ্যাশন প্রিয়তাকেই এরা 'আধুনিক' ছদ্মনামে পেশ করে। এসব পণ্ডিত-সাহিত্যিকদের মানসিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলার প্রয়োজন এখানে নেই, কিন্তু তারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ শিখিয়ে মুসলিম জাতির কত বড় ক্ষতি যে করেছেন, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তারা নিজেদের হীনমন্যতা ও বিকৃত মানসিকতার আড়ালে, প্রগতিশীলতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির বাহানায় নবীন যুবক যুবতীদের অস্তিত্বের মূলে যে কুঠার-ঘাত করেছেন, তা তারা অবশ্যই জানেন এবং জেনে বুঝেই তারা এ অপকর্মে লিপ্ত রয়েছেন।

এ আলোচনায় আমরা পাশ্চাত্যের নারীর ক্রমবিকাশ, তার কারণ ও উপায়, তার ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যে তাকে যে সব স্তর অতিক্রম করে আসতে হয়েছে তা নিয়েও আমরা আলোচনা করতে যাব না, আমরা বরং পাশ্চাত্যের নারী-সমাজের বর্তমান অবস্থা নিয়েই আমাদের আলোচনাকে সীমিত রাখব।

আমরা এখানে দেখতে চাই যে, তারা কি সত্যিই সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছে যা তাদের স্বভাব ও মানসিকতার দাবি ছিল? তারা কি তাদের নারীত্বের অধিকার পেয়েছে এবং তারা কি তাদের নারীত্বের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছে? নাকি বুনো ঘোটকীর মতো নিজেরাই নিজেদের অধিকার ও দায়িত্বকে পদদলিত করছে। এখানে আমরা তাদের মধ্যে নম্রতা, শালীনতা, শিষ্টতা ও নৈতিকতার অভাবের প্রসঙ্গও তুলব না এবং পুরুষের সাথে পাল্লা দিতে নেমে কি

পেয়েছে কি আর হারিয়েছে সে সম্পর্কেও বিস্তারিত কিছু বলব না। কারণ এতে করে আলোচনা বিলম্বিত হয়ে পড়বে। তাছাড়া এসব প্রশ্নের অনেক জবাব আপনারাও জেনে থাকবেন যা আমরা ইতিপূর্বে জানিয়ে এসেছি। তবে আমরা এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার অবতারণা অবশ্যই করব।

প্রথম বাস্তবতা : প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে তাদের লাগামহীন স্বাধীনতা। এ উশৃঙ্খল স্বাধীনতার ধারণা হচ্ছে অষ্টাদশ শতকের উৎপাদন। পরে শিল্প, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবাদি এ লাগামহীনতাকে আরো উৎসাহিত করে, ক্রমে বিংশশতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্যের নারীদের এ লাগামহীনতা চরমরূপ ধারণ করে।

ক্রমে যুগের পরিবর্তন ঘটে। খ্রিস্টান ধর্ম ও ইহুদী ধর্মের গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অমানুসিক জুলুম নির্যাতনের ফলে গোটা পাশ্চাত্য জগৎ মানবাধিকারের শ্লোগানে কেঁপে ওঠে। প্রচলিত মান-মর্যাদা, ভদ্রতা ও উদারতার অর্থ বদলে যায়, বদলে যায় মানুষের ব্যবহার ও অভিরুচি। গোটা পাশ্চাত্যবাসী ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। খ্রিস্ট ধর্ম ও ইহুদী ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে তারা বিকল্প জীবন ব্যবস্থার অন্বেষণে সচেষ্ট হয়। দুর্ভাগ্যবশষতঃ এ যুগ সন্ধিক্ষণে তারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে পরিচয় লাভ করতে পারেনি। যেহেতু তাদের এসব জীবনদর্শন ছিল খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদী ধর্মের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বাস্তব ফসল, তাই তারা চরম বস্তুবাদী পথই অবলম্বন করে, ফলে তারা আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও বিধ্বংসী পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়।

এ নারী বস্তুবাদী বিপ্লবের সয়লাবে নারী-পুরুষ সবাই একাকার হয়ে যায়। ধর্মকে তারা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে এবং লজ্জা-শরম, সম্মান, শালীনতা, পবিত্রতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলি তাদের কাছে একান্ত অর্থহীন কথা বলে মনে হয়। জড়বাদী বিপ্লবের এ হুজুগী স্রোতে নারী তার নারীত্বকে বর্জন করে গা ভাসিয়ে দেয়। অবাধ মেলামেশা, সামষ্টিক বিলাস আনন্দ আর নাচগানের যৌথ সরগরমে তারা হয়ে ওঠে ব্যস্ত-উদ্বেলিত। নাচগান আর মদের আড্ডায় তারা হয়ে ওঠে মাতাল পুরুষের সম অংশীদার। এখন তারা যে কোনো পুরুষের সাথে অবাধ যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হতে আর ইতস্ততঃ বোধ করে না বরং এ লাগামহীন ব্যভিচার আর বিলাসমত্ততাই হয়ে ওঠে সকলের প্রিয় ফ্যাশন।

পাশ্চাত্য সমাজে অবাধ ব্যভিচারের এ কলঙ্কজনক ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে জর্জ রয়লী স্কট তাঁর গ্রন্থ A HISTORY OF PROSTITUTION (বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাস) এ লিখেছেন–

"তার কাছে জীবনের আনন্দ এই যে যৌবনে যৌন সুধার পেয়ালা আকণ্ঠ পান করা হবে। এরই সন্ধানে সে নৃত্যশালা, নৈশক্লাব, আবাসিক হোটেল, রেস্তোঁরা

ইত্যাদির চারদিকে ঘুরতে থাকে, এরই সন্ধানে সে অপরিচিত পুরুষের সাথে মোটর-ভ্রমণে যেতেও সম্মত হয়। অন্যকথায় সে জেনে বুঝে নিজের কামনার তাগিদে নিজেকে এমন পরিবেশে ও এমন অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেয় এবং অন্যকেও পৌঁছায় যেখানে যৌন উত্তেজনাকে উস্কে দেয়ার মতো লোকেরা অবস্থান করে এবং এরপর তার যে স্বাভাবিক প্রতিফলন দেখা দেয় তাতে সে শঙ্কিত হয় না বরং তাকে স্বাগত জানায়।"

এটা এমন এক কঠিন বাস্তবতা যা কেউই অস্বীকার করতে পারে না এবং এটাই হচ্ছে সেই অবাধ স্বাধীনতা যা পাশ্চাত্যের নারী পুরুষ সমানভাবে ভোগ করছে। তাদের মতো ব্যক্তিগত জীবনে কিছু করা না করার ব্যাপারে প্রতিটি নর-নারীই স্বাধীন। তারা যে কোনো নৈতিক ও চারিত্রিক বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে যা খুশি তা করার অধিকার রাখে। এ ব্যাপারে বাধা দেয়ার বা কিছু বলার কোনো অধিকার সমাজ বা রাষ্ট্রের নেই। তবে সরকার কেবল সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে যেখানে সামষ্টিকতার স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে বলে মনে হবে।

দ্বিতীয় বাস্তবতা : দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা হচ্ছে, নারী ও পুরুষের মধ্যকার সাম্যের ভুল ধারণা। এ ভ্রান্তি নারীকে তার স্বাভাবিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন এবং অস্বীকারকারী করে ছেড়েছে। এর পরিবর্তে সে পুরুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এখন সে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বর্জন করে পুরুষের ওপর অধিকার দাবি করছে এবং এখন নারী-অধিকার বলতে পুরুষের অংশের অধিকারই বোঝায় এবং তার জন্য সর্বত্র চেঁচামেচি ও সংগ্রাম করে বেড়াচ্ছে।

নর-নারীর সাম্য বলতে পাশ্চাত্যের জড়বাদীরা এটা ধরে নিয়েছে যে, শুধু মর্যাদার ক্ষেত্রে নয় বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বকর্মেই তারা পুরুষের বরাবর ও সমান অংশীদার। পুরুষ যে কাজ করবে– নারীরাও সেই কাজ করেব। সুতরাং পুরুষ যে ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করে নারীও সেই একই শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে এখন নারীই সেসব কাজ করছে যা কেবল পুরুষেরই কর্তব্য ছিল। বলাবাহুল্য, আজ পুরুষের মতো নারীও ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষক, আইনবিদ ইত্যাদি কর্মেও অংশীদার হচ্ছে। এখন নারী ও পুরুষ বলতে তাদের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। এখন তারা সরকারি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও পূর্ণ সমানাধিকার দাবি করছে– যেখানে এখনো নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য বর্তমান রয়ে গেছে বলে মনে করে।

পুরুষের কাজকর্মে আগ্রহী হওয়ার ফলে নারী তার স্বাভাবিক দায়দায়িত্বের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করেছে। সুতরাং তাদেরকে কোথাও দাম্পত্য সম্পর্কের

উন্নয়ন বা পারিবারিক দায়িত্ব পালন অথবা মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলতে শোনা যায় না। কিন্তু নৃত্যশালা, নাট্যশালা, সিনেমা, ক্লাব ইত্যাদি স্থাপনের তৎপরতায় তাদেরকে বড্ড ব্যস্ত দেখা যায় এবং তাদের এসব তৎপরতা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

অবশ্য আমরা নারীদের প্রশিক্ষণমূলক যেমন কুটিরশিল্প, খাদ্যপ্রস্তুত, পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি করার প্রশিক্ষণ ও এ ধরনের গঠনমূলক তৎপরতার বিরোধিতা করছি না। কারণ স্ত্রী ও মা হিসেবে নারীর দায়িত্ব অত্যন্ত ব্যাপক, এ জন্য তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কারণ এ গঠনমূলক প্রশিক্ষণই আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মাকে পরিবার ও সমাজ গঠনের ভূমিকা পালনের কৌশল ও দক্ষতা দান করে। কেবল রান্না ও সেলাই করে স্ত্রীরা বা মায়েরা তাদের সেই বিরাট দায়িত্ব পালন করতে পারে না। সুতরাং তাদেরকে আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মা হিসেবে যোগ্য করে তোলার যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া একান্তই জরুরি।

কিন্তু এ কাজের এতো বেশি প্রয়োজন ও গুরুত্ব থাকা সত্বেও আধুনিক নারী কখনো এর জন্যে দাবি তোলেনি। তারা নিজেদের আসল দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথায় ভীষণ অসন্তুষ্ট। কিন্তু যদি তাদেরকে একথা বলা হয় যে, ভবিষ্যতে তাদেরকে আর সন্তান ধারণ, তাদের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে না-তখন সেই অনাগত ভবিষ্যতকে স্বাগত জানাতে মুহূর্ত মাত্রও বিলম্ব করে না।

নিজেদের স্বাভাবিক দায়িত্বে তাদের এ নির্লিপ্ততা এবং পুরুষদের সাথে এত ঘনিষ্ট মেলামেশা এ কথারই পরিচায়ক যে, নারীত্বের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। এটা তাদের এক ভয়ঙ্কর মানসিক দুর্বলতারও ইঙ্গিত বহন করে যে, সে তার নারীত্বকে নিয়ে লজ্জা ও হীনমন্যতাবোধ করে এবং পুরুষ হয়ে জন্মায়নি বলে আক্ষেপ করে। যেহেতু তাকে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেনি তাই বলে অন্ততঃ বাহ্যিকভাবে কৃত্রিম পুরুষের বেশ ধারণ করে নেয়। শুধু তাই নয়, সে এ মানসিকতা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সবরকমের উপায় অবলম্বন করে যেন তার "অবাধ্য কামনা" সেই লক্ষ্যে অর্জন করতে পারে। কিন্তু তাও কি সম্ভব? নারী, নারীই থাকবে– তা সে যতই অনুকরণ করুন আর যতই কৃত্রিমতা অবলম্বন করুক না কেন। কিন্তু সে যদি নারী হিসেবে নিজের মহত্তম লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায় তাহলে এতো সব অনুকরণ আর কৃত্রিমতার কোনো প্রয়োজন নেই।

উদাহরণস্বরূপ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত দাবির কথা ভেবে দেখুন এবং বলুন যে, আসলে কি এটা তেমন কোনো জরুরি বিষয় যার জন্যে তারা এতো হৈ-হল্লা করছে? এতে করে বরং পুরুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে

এবং তারা নারীদের এ দাবিকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য বিভিন্ন সরকারের উৎখাত করে নয়া বিপ্লবী সরকার কায়েম করে। এভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম অধিকারের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই শুধু করেছে। নয় কি?

বলা হয়ে থাকে যে বিভিন্ন দেশের নারী পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্যে এগিয়ে এসেছে। এ সুযোগ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে অনেক আগে থেকেই রাখা হয়েছে। কিন্তু সেসব দেশে সবরকমের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের তুলনায় নারীদের পার্লামেন্টের সদস্যপদ প্রার্থীনীদের অনুপাত হচ্ছে শতকরা মাত্র আড়াই ভাগ। অথচ দুনিয়ার প্রতিটি দেশে প্রাকৃতিকভাবে নারী ও পুরুষদের অনুপাত প্রায় সমান হয়ে থাকে। সেদিক থেকে পার্লামেন্টে সদস্যা পদ প্রার্থীদের অনুপাত পুরুষের সমান হওয়াই উচিত ছিল– যখন তার পূর্ণ সুযোগও রয়েছে।

অন্যদিক আধুনিক নারী সাধারণ যানবাহনে তাদের জন্যে নির্ধারিত কক্ষ বা আসনের পরিবর্তে পুরুষের সাথে একই আসনে বসার সুযোগ দেয়ার দাবি করার পেছনে যুক্তি বা অর্থ কি? আর তারা তাদের জন্যে পৃথক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি না করে পুরুষের সাথে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম অধিকার দাবি করার অর্থই বা কি? আধুনিক নারীসূলভ পোশাক পরিচ্ছদের পরিবর্তে পুরুষের মতো প্যান্ট-শার্ট পরার নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে কোন মানসিকতায়? এভাবে অন্যান্য সব ব্যাপারেও তারা পুরুষের অনুকরণ করতে চায় কেন? ইদানিং তারা লিখনে ও বলনে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার বর্জন করারও দাবি তুলছে? তারা বলনে ও লিখনে নিজেদের জন্যে পুংলিঙ্গ ব্যবহারের পক্ষপাতি। কিন্তু কেন? তথাকথিত আধুনিক নারীদের এসব কথাবার্তায় এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, নারী হওয়াটা যেন কোনো লজ্জা বা দুর্ভাগ্যের বিষয়। তারা নারী হয়েছে বলে নিজেদেরকে হীনতর ভাবে। আর তাই পুরুষের সমান হওয়ার জন্য তাদের এ অস্বাভাবিক চেষ্টা সাধনা।

তথাকথিত আধুনিক নারীর উন্নতির অর্থ বোঝার জন্য উপরে বর্ণিত দুটি বাস্তবতাকে সামনে রাখা দরকার। অর্থাৎ লাগামহীন স্বাধীনতা ও নারী পুরুষের সমক্ষেত্রিয় সমানাধিকার এর দৃষ্টিকোণ থেকে– মানুষ হিসেবে অথবা নারী হিসেবে তারা কি উন্নতিটা করছে? আর নারীত্বের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন এবং স্বাভাবিক কাজকর্মের বাস্তবায়নেই তা তারা কতটুকু উন্নতি অর্জন করেছে?

লাগামহীন স্বাধীনতার অর্থ এবং অবস্থার প্রামাণ্য চিত্র আমরা উপরে তুলে ধরেছি। আমরা দেখেছি যে এই লাগামগীন স্বাধীনতা নারী ও পুরুষের অবাধ

যৌন উশৃঙ্খলা এবং নির্লজ্জ ফ্যাশন-বিলাসিতায় অভ্যস্ত করে তুলেছে। আর তাদের স্বাধীনতার অর্থ কী? কার কাছ থেকে কিসের স্বাধীনতা? তাদের স্বাধীনতার অর্থ শুধু এ যে- তারা বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে স্বাধীনতা চায়, তারা মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে স্বাধীনতা চায়।

স্মরণযোগ্য যে, দীর্ঘকাল ধরে নারী তার স্বাভাবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্রিয় ছিল। গত শতকের শেষ এবং চলতি শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত এ অবস্থা চলছিল। এরপর কতিপয় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ও চিন্তাবিদ আকাশে এ শ্লোগান ছাড়ে যে, নারীকে তার আসল কর্মক্ষেত্র ছেড়ে আধুনিক যুগের চাহিদা পূরণে এগিয়ে আসতে হবে। তারা তাদের এ শ্লোগানকে দার্শনিক রূপ দেয় এবং আধুনিক জড়বাদী চিন্তাবিদদের মন্তব্যের আলোকে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। তারা অশ্লীলতা, ব্যভিচার এবং অন্যান্য নোংরামীকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় আধুনিক নামে নামকরণ করে।

কিন্তু তবুও সাধারণভাবে নারীরা তাদের প্ররোচনায় কান দিতে ইতস্ততঃ করে। কারণ এত দিনের নারীসুলভ সংস্কারবোধ তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্লজ্জতার সাথে হাত মেলাতে বাধা দেয়। কিন্তু দু' দুটি মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট পরিবেশ নারীদের সেই শেষ ইতস্ততঃবোধকেও শেষ করে দেয় এবং তাদেরকে খোলাখুলি যৌন নোংরামী ও আধুনিক পাশবিকতার চরম পর্যায়ে টেনে আনে।

সুতরাং আজ এ লাগামহীনতা আর অস্বাভাবিক ভুল ধারণাই পাশ্চাত্যে বিয়ের সম্পর্ককে একেবারে অর্থহীন ও ঠুনকো করে দিয়েছে। কারণ যৌন মিলন ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কোনো সম্পর্কই বর্তমান রাখা হয়নি। দাম্পত্য সম্পর্ককে সুন্দর ও স্থিতিশীল রাখার সব বুনিয়াদকেই তারা উল্টে দিয়েছে। তাদের যত্রতত্র অবাধ প্রেম-ভালোবাসার ফলশ্রুতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম-ভালোবাসার সব সম্পর্ককে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। এখন তারা বিয়ে ছাড়াই যে কোনো পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। গর্ভনিরোধের ব্যাপক সুবিধে রয়েছে বলে জারজ সন্তানেরও কোনো দুশ্চিন্তা নেই। শতাব্দীর মহান মনীষী সাইয়েদ মওদুদী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "পর্দা ও ইসলাম" এ পাশ্চাত্যের এ ভয়াবহ অবস্থার অনেক প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

তিনি Detroit-এর বিখ্যাত পত্রিকা Free Press-এর একটি রিপোর্টও তুলে ধরেন। তাতে বলা হয়েছে-

"বিয়েশাদীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং বিয়ে ছাড়াই স্থায়ী ও অস্থায়ী অবৈধ যৌন সম্পর্কের সংখ্যাধিক্য একথাই প্রমাণ করে যে,

আমরা পাশবিকতার দিকেই ফিরে যাচ্ছি এবং সন্তান উৎপাদনের স্বাভাবিক বাসনা বিলোপ পাচ্ছে।"

অন্য এক স্থানে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মেয়েদের অভিমতকে ব্যক্ত করেছেন এ ভাষায়–
"আমি বিয়ে করব কেন? আমি মনে করি এ যুগের মেয়ে ভালোবাসার ক্ষেত্রে স্বাধীন ক্রিয়ার স্বাভাবিক অধিকার রাখে। আমরা গর্ভনিরোধের অসংখ্য উপায় জানি। এভাবে জারজ সন্তান জন্মানোর আশংকাও দূর করা যেতে পারে। ফলে কোনো জটিল অবস্থার ভয় নেই। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রচলিত পন্থাগুলোকে এ আধুনিক পন্থায় বদলে দেওয়াটা বুদ্ধির অনুকূল।"

আর এ ধারণা পোষণকারী নির্লজ্জ নারীদের পাশ্চাত্যের সমাজ-ব্যবস্থায় স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত রয়েছে। তাদের এ নির্লজ্জ স্বাধীনতাকে রুখে দেয়ার অধিকার আইন-কানুন বা সমাজ সরকার কারোরই নেই। কেউ নিন্দা সমালোচনাও করতে পারে না। কেন না স্বয়ং তাদের সমাজ আর সরকারই তাদেরকে যথেষ্ট ব্যভিচারের সেই অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে।

পাশ্চাত্যের বর্তমান চরমপন্থী স্বেচ্ছাচারিতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নারীদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি ও বিধানকে অনেকটা কঠিন মনে হতে পারে। কারণ ইসলাম লাগামহীন স্বাধীনতার অনুমতি দেয় না বরং এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ বিষয়ে স্পষ্ট অবগতির জন্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ব্যাপক অধ্যয়ন করা জরুরি। ইসলাম মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়কেই স্বাধীনতা দান করেছে এবং প্রত্যেকের অধিকার ও দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তারা নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীন। কিন্তু অন্যের ক্ষেত্র ও দায়িত্বে হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশের কোন স্বাধীনতাই কারো নেই। কারণ এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতা চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। যা পাশ্চাত্য সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ইসলামের বিধি ও ব্যবস্থা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে আমাদের পূর্বপুরুষরা এর কার্যকারিতা ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর ধনসম্পদ, অভিমত এবং ধর্মীয় মতামতের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অধিকার দেয়নি স্বামীকে এমন কোনো কথা বলার বা কাজ করার অধিকার দেয়া হয়নি যাতে করে স্ত্রীর যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের অবসান হতে পারে। এমনকি ইসলাম স্বামীকে এ অধিকারও দেয় না যে, স্ত্রীকে নামের সাথে স্বামীর নাম যোগ করতে হবে। অথচ পাশ্চাত্যে এর সাধারণ প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু এ প্রচলনটা যদি ইসলামী সমাজের কেবল থাকত তাহলে এসব লোকেরা কতই

অপপ্রচার করত এবং ইসলামের ব্যাপারে নাক সিটকাত, একে তারা প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে সমালোচনা করত। কিন্তু এখন তারা নিজেরাই এ কু-প্রথার অনুসারী বলেই এটাকে মন্দ না বলে বরং ফ্যাশন বলেই চালিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য কথা! ইসলামের ভালো কথাটাও তাদের কাছে বিবেচনার অযোগ্য আর তাদের সকল মন্দ কার্যকলাপই ফ্যাশন ও আভিজাত বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু ইসলাম নারীকে তার আসল অধিকার দান করেছে, ইসলাম তাদের যে অধিকার দিয়েছে সেই অনুসারে কোনো স্বামী তার স্ত্রীর ধনসম্পদ, মতামত ও ধর্মীয় বিশ্বাসে কোনো রকমের হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের যে ভিত্তি রচনা করেছে তাতে যে কোনো অর্থে উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ বলা যেতে পারে। যদি কোনো স্বামী কোনোভাবে স্ত্রীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করে এবং স্ত্রী যদি ইসলামী আইন মোতাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে সুবিচার দাবি করে তাহলে তাকে অবশ্যই সুবিচার দিতে হবে। এভাবে নারীর ওপর কোনো রকমের জোরজুলুম বা শোষণের কোনো অবকাশই রাখা হয়নি। ইসলাম সমাজ ও সরকারকে নারীর ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ ও তার সাথে সহানুভূতির ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছে এবং তাকে তার সুবিচার পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলেছে।

কিন্তু দুনিয়ার নারী সমাজ ইসলামী আদর্শের অনুসরণ না করে নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছে। আজ তারা জীবনের বৃহত্তম লক্ষ্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পুরুষের সাথে বিড়ম্বনাময় ঘানি টেনে ফিরছে। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তারা আদর্শ নারী হওয়ার মৌলিক গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। তারা আজ পুরুষের অনুকরণ ও পুরুষের ঘৃণ্য প্রবৃত্তির দাসীবৃত্তি করাকে নিজেদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছে। তারা পুরুষের বেশ আর পুরুষের কর্ম লাভকেই মনে করেছে সমতার অর্থ।

নারী কি যুগের সাথে সুবিচার করছে? তারা কি অতীত পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়াতেই মুক্তির নামে আজকের এ চরম পন্থা খুঁজে বের করার অভিনয় করছে না?– আফসোস! তারা ভুলের পর ভুলই করে যাচ্ছে। তাদের এক একটি ভুল সিদ্ধান্ত থেকে জন্ম নিচ্ছে আরও অসংখ্য ভুল। তারা যদি সত্যি মুক্তি চাইত, সত্যি সত্যিই যদি তারা সুবিচার চাইত, চাইত যদি তারা তাদের ন্যায্য অধিকার, তাহলে তারা সে সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা অবশ্যই করত যা ইসলাম তাদের শিখিয়েছে। ইসলামের এসব শিক্ষা ও নীতিমালা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি।

বস্তুত: সমাজ-সংস্কার ও সংগঠন এবং উন্নত উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে যথার্থ মর্যাদা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ইসলামী নীতি ও শিক্ষার বাস্তবায়ন একান্তই অপরিহার্য।

"অধিকার সাম্য" দাবি করার অস্পষ্ট শ্লোগানের আড়ালে নারীর প্রকৃত অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিাকর কারো নেই। নারী জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে নারীর প্রতি সুবিচার প্রদর্শন কখনো সম্ভব নয়। তাছাড়া অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে কখনো সত্যিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। জানি, স্বঘোষিত প্রতিবাদী ও আধুনিকতাবাদীদের কাছে কোনো প্রশ্নেরই যুক্তিযুক্ত উত্তর নেই এবং কোনো সমস্যার সমাধানও নেই। তারা কেবল সমস্যাকে জটিল করতেই পারদর্শী। তাই তারা কোনো বাস্তবভিত্তিক নীতি ও যুক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে আমাদের সেকেলে প্রতিক্রিয়াশীল ও গোঁড়া বলে গালি দিয়ে আত্মতুষ্টি অর্জন করে।

তারা নিজেদেরকে প্রগতিবাদী বলে প্রচার করে। কিন্তু যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, প্রগতির অর্থ কি? তখন তারা শুধু এটুকুই অর্থ করে যে, প্রগতি মানে শিক্ষা ও বস্তুগত উন্নতি। এছাড়া তারা আর কোনো উন্নতির কথা ভুলেও মুখে আনে না। কারণ তারা জানে যে, আসল অর্থ করতে গেলে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হবে ও বেকাদায় পড়তে হবে।

প্রগতির বিভ্রান্তির শ্লোগান তুলে তারা শুধু সমাজের বুকে জড়বাদী ধারণার বীজ বুনতেই সচেষ্ট। তারা প্রগতির ব্যাখ্যা দিতে চায় না। এই জন্যে যে, তারা জানে তারা যা বলছে ও করছে তার সাথে প্রগতির কোনো সম্পর্ক নেই। তারা প্রগতির যে ঠুনকো মনে করে তা একান্তই বিভ্রান্তিকর। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের মুখোশ লুকানোর জন্যে বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত উন্নতির গালভরা বুলি আওড়ায়। তারা খুব ভালো করেই জানে যে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিত্য নতুন অধিকার– উদ্ভাবন ঘটেছে তেমনি তা ঘরের নারীকে বাইরে এনে পুরুষের সাথে কলকারখানায় জুড়ে দিয়েছে। নারী তার নারীত্ব হারিয়ে পরিণত হয়েছে পুরুষের শোষণ ও সম্ভোগের কাঁচা দ্রব্যে। এটাই হলো তাদের প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার অর্থ।

একবার যখন নারীকে ঘর থেকে বের করে উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে সে তখন আর ঘরে বসে স্বস্তি পাবে কেন? আর চরে বেড়ানোর এতো বিরাট ময়দান পড়ে থাকতে সে বিয়ে করে ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্যই বা করতে যাবে কেন? যৌনতৃপ্তি লাভের কোনো অসুবিধে তো তার এমনিতে নেই। বিয়ে ছাড়াই

তা সে অনায়াসে ভোগ করতে পারে। সুতরাং পাশ্চাত্যের মুক্ত নারী মুক্ত সমাজের বুকে এভাবেই জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ হচ্ছে তাদের প্রগতিশীল জীবনের দর্শন। এসব গোলকধাঁধা আর ভ্রান্তির মায়াজালে ঘটে চলেছে যত অনাচার অঘটন।

এ তথাকথিত প্রগতিশীলতার পিছনে কেটে যাচ্ছে তাদের ক্ষয়িষ্ণু জীবন। তারা এখন তাদের সামাজিক ও সরকারি আইনের ছত্রছায়ায় জারজ সন্তান জন্ম দেয় এবং এসব কাজে সন্তানকে লালন-পালন করার জন্যেও তারা বাধ্য নয়। এ হচ্ছে পাশ্চাত্যের সাধারণ সমাজচিত্র।

এরই গুণগান প্রচার করে বেড়াচ্ছে তাদের রথী-মহারথীরা। এটাই নাকি উদার নীতি, প্রগতি, আধুনিকতা আর উন্নত মননশীলতা। এ নোংরামীর দূষিত বিষাক্ত পরিবেশেই তাদের প্রগতি সহস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে– গোটা বিশ্বময়।

নারীকে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের সীমালঙ্ঘন করে বাইরে ঘুরে বেড়ালে যে সামাজিক সমস্যাবলির সৃষ্টি হয় তাতে দ্বিমত পোষণের কোনো উপায় নেই। রইলো শিল্পোন্নয়নের কথা। শিল্পোন্নয়নের গুরুত্বকে অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না, একইভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে উদ্ভাবন ও মানবতার জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। ইসলাম শিল্পোন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস মোতাবেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার উদ্ভাবন এবং সামগ্রিক অর্থে শিল্পোন্নয়ন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে মুসলমানদের জন্যে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একইভাবে সভ্যতার বিকাশ সাধনও ইসলামী জীবনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে সৃজনশীল প্রতিভা দান করেছেন এ জন্যে যে, তারা আল্লাহর এ পৃথিবীর বিভিন্ন পদার্থকে কল্যাণকর উদ্দেশ্যে ব্যবহারাধীনে আনার চেষ্টা সাধনা করবে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেক বিবেচনার শক্তি দান করেছেন। এজন্য ইসলাম সর্বোতভাবে উন্নয়নের সমর্থন। মানুষ তার বৃহত্তম কল্যাণের জন্যে জীবনের সর্বক্ষেত্র উন্নতি করুক ইসলাম তাই কামনা করে। এজন্যে ইসলাম ইতিবাচক ও গঠনমূলক চিন্তাভাবনা এবং পরিকল্পনাভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলাম, মানবতার যথার্থ উন্নয়ন ও বৃহত্তম কল্যাণের স্বার্থে নর-নারীর কর্মক্ষেত্র এবং তাদের মেধা ও ক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছে যাতে করে তারা বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকভাবে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।

কিন্তু ইসলামের এ সহজ সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার বিপরীতে যারা নারীকে পুরুষের সাথে খাপছাড়া প্রতিযোগিতায় নামানোকেই উন্নতি ও প্রগতির পরিচায়ক বলে মনে করে তাদের জ্ঞান-বিবেক ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগা খুবই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ এ ধরনের অপরিণামদর্শী ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত লোকেরাই নারী তথা গোটা বিশ্বমানবতার নিকৃষ্টতম শত্রু। এমন মূর্খ ও ভোগবাদী শোষকগোষ্ঠীর হীন চক্রান্ত থেকে বিশেষভাবে নারী সমাজকে এবং সাধারণভাবে গোটা মানবতাকে মুক্ত করানোর সময় এসে গেছে। আর সমাজকেও এটা বুঝে নিতে হবে যে, কলকারখানা, অফিস-আদালত আর দোকানপাটে খেটে খাওয়ার নাম উন্নতি নয়। যারা এটাকে উন্নতি মনে করে তারা আসলে উন্নতির অর্থই বোঝে না, অথবা জেনেশুনেই ভুল অর্থ করে।

বলুন তো, চাকরিরতা নারীরা যদি চাকরিতে যাওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে কি উন্নতির গতি রুখে যাবে? তারা বাইরে না বের হলে বাইরের কাজকর্ম কি বন্ধ হয়ে যাবে? বরং বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, যে সকল জায়গায় নারীরা কাজ করে না সেখানে উৎপাদন উন্নতি তুলনামূলকভাবে বেশিই হয়। আর যে সকল জায়গায় নারী কাজ করে সে সকল জায়গায় উৎপাদন ও উন্নতি তুলনামূলকভাবে কমই হয়। বিশেষজ্ঞরা আরো বলেছেন যে, কলকারখানা, অফিস আদালত ও দোকানপাট থেকে যদি নারীরা সরে যায় তাহলে আজকের যুগের বেকার সমস্যার যেমন অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে তেমনি সামষ্টিক উন্নতির হারও বৃদ্ধি পাবে। আরো দেখা গেছে, যে সকল কলকারখানায় নারীদের রাখা হয় না সে সব কলকারখানায় কখনো উৎপাদন হ্রাস দেখা দেয় না। বরং সক্ষম ও পরিশ্রমী পুরুষদের কর্মদক্ষতায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেতেই থাকে।

সুতরাং নারীদের দিয়ে পুরুষালী কাজ করিয়ে যারা উন্নয়নের কথা বলেন বা নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেন তাঁরা আসলে মানুষকে প্রবঞ্চিতই করেন। তাদের এ প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত হয়ে নারী ও পুরুষ উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। তারা কেবল তাদের ঘৃণ্য মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যেই নারীকে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে টেনে আনছেন। এতে করে নারীরা তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে পড়ছে এবং তার সুফল থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।

এটা শুধু আমাদের মুখের কথাই নয়। আজকের পাশ্চাত্য সমাজের নারীদের অবস্থার পর্যালোচনা করলে আপনারাও একই কথা বলতে বাধ্য হবেন এবং দুনিয়ার সমাজ বিশেষজ্ঞ ও সচেতন পর্যবেক্ষকরা আমাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে প্রায়ই মতামত প্রকাশ করেছেন। যে পাশ্চাত্যের স্বাধীনতার ও

নারীমুক্তি শ্লোগান সবচেয়ে বেশি উঠে থাকে সে পাশ্চাত্যের নারীদের অধিকার ও মান-মর্যাদার কি অবস্থা হচ্ছে? নারীর মান-মর্যাদা ও অধিকার কি নিরাপদে আছে? যদি নিরাপদই থাকবে তাহলে এতো হৈ-হল্লা আর চেঁচামেচি কেন? কেন এত খুন, ছিনতাই, ধর্ষণ আর রকমারী নারীনির্যাতনের লোমহর্ষক খবরাখবরে পাশ্চাত্যের পত্রপত্রিকা আর সংবাদমাধ্যমগুলো ভরে থাকে? ইউরোপ আমেরিকায় নারী নির্যাতনের যত নিষ্ঠুর ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে– সমগ্র মুসলিম বিশ্ব জুড়ে তার একটিমাত্র তুলনাও পাওয়া যায় না কেন? তার কারণ মুসলমান জাতি নামেমাত্র হলেও এখনও ইসলামের কোনো কোনো বিধান মেনে চলছে বলে মুসলিম সমাজে নারীদের অধিকার ও মানমর্যাদা এখনো নিরাপদ রয়েছে। দুনিয়ার যে কোনো জাতির নারীদের তুলনায় মুসলিম নারী তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে পূর্ণ সন্তুষ্টি ও সম্মানের সাথে জীবন যাপন করছে।

কিন্তু জড়বাদী পাশ্চাত্যে নারীমুক্তির শ্লোগান নিছক এক প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুক্তি বা উন্নতির সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই। আজকাল পাশ্চাত্যের সচেতন বুদ্ধিজীবী এমনকি পুঁজিপতিরাও একথা স্বীকার করছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের এ মহামারী ব্যাধি নিরাময়ের প্রচেষ্টা গ্রহণের সৎসাহস তাদের নেই। ফলে তারা সবকিছু দেখে শুনেও চোখ বুজে সহ্য করেছেন। তাছাড়া যথার্থ সংস্কার ও সংশোধনের ফলে তাদের গোটা পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী কাঠামোই ধ্বসে পড়বে। কারণ পাশ্চাত্যের উভয় জড়বাদী দর্শনই নারীকে তার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং ইসলাম যখন গোটা বিশ্বমানবতার সামগ্রিক মুক্তি ও কল্যাণের জন্যে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান বাস্তবায়নের আহ্বান জানায় তখন কায়েমী স্বার্থের এসব পুঁজিপতি এবং সমাজবাদী চক্রই তাদের মুখোশ লুকাতে গিয়ে দাগী অপরাধীদের মতো ইসলামের বিরোধিতা করে।

এখানে আমরা অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক আর উদ্দেশ্যহীন আলোচনায় পড়তে চাই না। আসলে আমরা ঐসব অপরাধচক্রের মুখোশ উন্মোচন করতে চাই যারা মুক্তি ও প্রগতির মুখরোচক বুলিতে বিপদগ্রস্ত মানবতাকে তাদের হীন স্বার্থের শিকারে পরিণত করে আসছে। এরাই নারীকে বাজারের পণ্য-বিজ্ঞাপণ আর দু'কড়ির বিলাসদ্রব্যে পরিণত করেছে। কাঁচা পয়সার চাকচিক্য দেখিয়ে এরাই নারীর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে এবং এরাই নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এরা নারীকে তার মানবিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত করেছে। এরাই নারীর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে চরম অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দিয়েছে। এ পুঁজিবাদী গোষ্ঠী

আর সমাজবাদী চক্র তাদের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন একটি কাজও করেনি যাতে নারী তথা মানবতার কোনো কল্যাণ হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পাশ্চাত্যের নারী এসব অপরাধী গোষ্ঠীর হাতের পুতুল সেজে নিজেদের মান-মর্যাদা ও অধিকারকে পানির দামে বিকিয়ে কি নিজেদের সাথে সুবিচার করছে? আমরা এ প্রশ্নের জবাব চাই। তারা যদি এখন নেশার ঘোরে তোমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে না পারে, বা তারা যদি এর জবাব দিতে অপ্রস্তুত হন, তাহলে আমরা অন্য প্রশ্ন করব যে, তারা কি স্রষ্টার পক্ষ থেকে ন্যস্ত তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করেছেন? তারা কি তাঁদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন?

স্পষ্টত, যদি তাদের জীবন দাম্পত্য ও মাতৃত্বের মহান উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ, স্নেহপ্রীতি, ভালোবাসা, দয়া, ও সহানুভূতির মহত্তম বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত থেকে থাকে তাহলে তা সত্যিই আক্ষেপের বিষয়। যদি তাঁরা এসব গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত থাকেন তাহলে তাদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না। ব্যস, যেমন চলল তেমনই জীবন কাটিয়ে দেয়া হলো। পরিবার-সমাজ ও সভ্যতার পোড়াপত্তনে তাদের কোনো ভূমিকা রইলো না। রইলো না কোনো মহৎ লক্ষ্য।

যেখানে ইচ্ছা যার তার সাথে যৌনতৃপ্তি মেটানোর মধ্যে জীবনের কি মূল্য থাকতে পারে? জীবনে যদি তাদের কোনো মূল্য বা মর্যাদাই না থাকে তাহলে তাদের মানুষ হয়ে জন্মানোর অর্থটাই কি থাকবে? তাঁরা যে অবনতির কোন নিম্নতম অতল তলে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সম্ভবতঃ সেই অনুভূতি থেকেও তারা আজ উদাসীন। তারা যে কতো হীন-অসহায় অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন সেই অনুমানও হয়তো তাদের নেই!

এতসব বাস্তবতার প্রত্যক্ষ উদাহরণের পরও কি আমাদের চোখ খোলেনি এবং আমরা কি এখনো এটা বুঝতে পারিনি যে, আধুনিক নারী তার নিজের সাথে সুবিচার করছে না কি অবিচার?

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে : নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী

১. **বিবাহ সম্বন্ধে অন্ধকারে থাকা :** বিবাহ হচ্ছে পরবর্তী জীবনের জন্য এক সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার এক বিশেষ কার্যক্রম। সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকা, না জানা, না বুঝা, বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ জনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ না করা এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিবাহ কী, সংসার জীবন কেমন, স্বামী-স্ত্রীর কার কী দায়িত্ব, কী কর্তব্য, কী কী কাজ করলে সংসার জীবন সুখী হবে, কী কী কাজ জীবনে দুঃখ ডেকে আনে, পারস্পরিক সম্পর্ক হানি হয় তা অবশ্যই জানা উচিত। তবে তা হতে হবে মার্জিতভাবে। এক্ষেত্রেও সীমালঙ্গন করা যাবে না।

২. **মেয়ে দেখা :** নিজের জীবন সঙ্গী যে হবে তাকে প্রাথমিক দর্শন, জানা ইত্যাদি প্রয়োজন। হাদীসেও বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। তবুও কেউ কেউ বলেন– আমার মা দেখলে এবং পছন্দ করলেই চলবে। আমার বোন দেখলে, আমার ভগ্নিপতি দেখলেই চলবে। মনে রাখতে হবে **'দেখে বিবাহ করা সুন্নাত'** এবং ব্যক্তির পরিবর্তনে রুচির পরিবর্তন অবশ্যই হয়। আরো মনে রাখতে হবে **"চাচা পিতার মতো"** কিন্তু **'চাচা কোনো দিনই পিতা নন'** সুতরাং যার দেখা তারই দেখে নেয়া উচিত। কাজেই চাচা, ছোট বা বড় ভাই, দুলাভাই ও বন্ধুবান্ধবসহ অন্য গাইরে মুহাররাম কোনো পুরুষের মেয়ে দেখা কোনো ক্রমেই সঙ্গত নয়।

৩. **বউ সাজ ও বর সাজ :** বিয়ের পূর্ব মুহূর্তে কনেকে সাজানোর জন্য অনেকে খুব বেশি অতিরঞ্জিত করেন। যেমন– কনেকে বিউটি পার্লারে নিয়ে সাজিয়ে আনে। বরকে তার হবু শালীরা গোসল দেয়ার নামে অশ্লীল যত কাজ আছে তার প্রায় সবগুলোই করে থাকে। আর কনেকে হবু দেবররাও কম করে না।

৪. **সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা :** আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। তাই আল্লাহ বনি আদমকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ত্বীন : আয়াত-৪) অনেকে সৌন্দর্যকে আরো বাড়ানোর জন্য হারাম উপায়ে তৈরিকৃত প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করে থাকে। অনেকে আলগা লম্বা চুল ব্যবহার করে। এটা ঠিক নয়। যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বাস্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

৫. **মহরানা নির্ধারণ :** স্ত্রীকে মহরানা প্রদান করা ফরয তথা আল্লাহর বিধান। কম হোক বেশি হোক বিবাহে মহরানা নির্ধারণ করা এবং স্ত্রীকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেয়া ফরয। বরের অবস্থা অনুসারে সাধ্যমত মহরানা নির্ধারিত হবে এবং স্বামী স্ত্রী সাক্ষাতের (বাসর) পূর্ব পর্যন্ত তা বাকী থাকতে পারে। সাক্ষাতের পরে জীবনব্যাপী তা বাকী রাখার কোন সুযোগ নেই এবং মাফ চাওয়া বা মাফ করে দেয়ারও কোন এখতিয়ার স্বামী-স্ত্রীর নেই। কারণ, ফরয নির্ধারণ করেন আল্লাহ, হ্যাঁ পরিমাণ কম হতে পারে। লক্ষ টাকা মহরানা নির্ধারণ করার মধ্যে সাওয়াব নেই, গুনাহ আছে, দ্বীন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি আছে।

৬. **বেশি মহরানার উদ্দেশ্য :** যারা বেশি মহরানা নির্ধারণে অতি আগ্রহী তাদের মধ্যে মহরানার বিধান 'ফরয' সম্পর্কে যত না গরজ তার চেয়ে বেশি গরজ মহরানার পরিমাণ বেশি করার প্রতি। উদ্দেশ্য যদি ছাড়াছাড়ি হয় তা হলে বিশাল মহরানার অঙ্ক গুনতে হবে। তা হলে কি মনের অন্ধকার মণি কোঠায় মন্দ কিছুর আশঙ্কা আছে? নিয়্যাত শুদ্ধ করুন। বিবাহের জন্য বিবাহ করুন। অন্য চিন্তা দূর করুন। সর্বনিকৃষ্ট ঘৃণ্য কাজটির (তালাক) চিন্তা কখনও মাথায় নিবেন না তাহলে সংসারে সুখ হবে।

৭. **নব বধু দ্বারা অর্থ আয় :** বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ এলাকায় দেখা যায় যে, বিয়ের একদিন বা কয়েকদিন পর নববধু তার স্বামীর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যারা মুরব্বী তাদের পা ছুয়ে মাথা নত করে কদম মুছি করে থাকে। তার ফলে তারা নববধুকে উপহার হিসেবে মোটা অংকের টাকা বা অন্য কিছু দেয়। আবার এটাও দেখা যায় যে, দুলাভাই, বাসরসহ অন্য মুরব্বীরা নববধূকে নিজ হাতে আংটি পড়িয়ে দেয়। যা শরীয়াতের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৮. **বসতঘর আলাদাকরণ :** আমাদের দেশে ছেলেদের বিবাহ করানোর পরে পিতার সংসারে যৌথ পরিবারেযুক্ত থাকে কিন্তু বর-কনের জন্য আলাদা ঘর হওয়া উত্তম। অন্তত নিশ্ছিদ্র কক্ষ হওয়া চাই। বিবাহের পরে বর-কনের বাসর যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৯. **বিলম্বে সন্তান গ্রহণ :** আধুনিক দম্পতিরা বিভিন্ন চিন্তায় বিলম্বে সন্তান গ্রহণ করতে চান কিন্তু এটা বিভিন্ন অসুবিধা ও জটিলতা সৃষ্টি করে। তন্মধ্যে সন্তান গ্রহণে যোগ্যতা হারিয়ে ফেলা। যেমন, জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোনো কোনো পদ্ধতি গ্রহণের ফলে স্ত্রীর জরায়ু নষ্ট করে ফেলা, স্বামীর স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। বিলম্বে নেয়া সন্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই মাতা-পিতা বার্ধক্যে পৌঁছে যায়।

১০. **মেয়ে সন্তানের প্রতি অনীহা :** মাতা-পিতার গুরুত্ব বুঝার ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে তবুও অন্য ধর্মের কোনো কুশিক্ষার কারণেই হোক আর যে কারণেই হোক মেয়ে সন্তানের প্রতি অনেকের এই ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত। অপর দিকে বিজ্ঞানের ভাষায় xy ও xx থিওরিতে মেয়ে জন্ম হওয়া পুরুষের বিষয়, যদি বলা হয় দুর্বলতা তা হলে স্বামীর দুর্বলতা।

১১. **কম সম্পদের ভয় :** পরিশ্রমে ধন আনে, পুণ্যে আনে সুখ। সুতরাং শ্রম দিতে হবে। মুসলমান মাত্রই তকদীরে বিশ্বাস করে। আর প্রত্যেক সৃষ্টির রিযক তার স্রষ্টা পূর্বেই প্রস্তুত করে রেখেছেন। মৃত্যু যেমন অবধারিত প্রাপ্য রিযক সম্পদও তেমনি অবধারিত আসবেই। বরং দুনিয়ার শেষ দিকে মানুষের ধন-সম্পদ অনেক বেশি থাকবে অতএব ঐ ভয় করার কোনো মানে নেই, কারণও নেই। আয়-রোজগার কম। বিবাহ করলে অভাবে পড়তে হবে এ ধরনের আশঙ্কা করা মোটেও ঠিক নয়। বিবাহ করলে মানুষের আয়-রোজগার বেড়ে যায়।

১২. **Brith Control বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ :** কন্ট্রোলের কাজটি যার সৃষ্টি তাঁরই দায়িত্বে। সুতরাং তাঁর উপর ছেড়ে দেয়াই ভালো। তবুও এ বিষয়ে একাধিক বিজ্ঞ লোকের সাথে পরামর্শ না করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয়।

১৩. **বিবাহ করে স্ত্রীকে মা-বাবার খেদমতে দিয়ে বিদেশ যাত্রা :** দেশে আত্মকর্মসংস্থানের চেষ্টা না করে জায়গা-জমি পুঁজিপাট্টা বিক্রি করে রঙিন স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অনেকেই বিদেশ পাড়ি জমান এবং বিদেশে গিয়ে অদক্ষ-দক্ষ অনেকেই তেমন কোনো সম্মানজনক কাজও হয়ত পান না তবুও বিদেশে যাওয়া চাই এবং সেই সাথে আরেক উপসর্গ সৃষ্টি করে যাওয়া আর তা হলো বিবাহ করে স্ত্রীকে মা-বাবার খেদমতে দিয়ে যাওয়া। এটা কোনো যৌক্তিক কাজ তো নয়ই তাছাড়া শরয়ী দিক থেকেও এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ স্ত্রী যে কোনো সময়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়াতে পারে এবং সে জন্য শুধুই মহিলাকে দোষারোপ করা যায় না।

১৪. **বিদেশে থেকে স্ত্রীর একাউন্টে টাকা জমা করা :** বিদেশে থেকে সংসার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা স্ত্রীর একাউন্টে পাঠানো হয়। এমনকি অনেকে সমুদয় কামাই স্ত্রীর হিসাব নম্বরে জমা দেন। বেশি টাকার অবৈধ গরমে ততদিনে স্ত্রী পরকিয়ায় মজে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সব নিয়ে অন্যত্র ঘর বাঁধে পরে টাকার সাথে নিজের জীবনও যাওয়ার উপক্রম হয়। এ জন্য যৌথ একাউন্ট থাকলে সমস্যা খুব বেশি হবে না।

১৫. **বিলম্বে বিবাহ :** পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে কেউ কেউ বিলম্বে বিবাহ করেন। এটা পুরুষদের জন্য ক্ষতিকর এ জন্য যে, ছেলে মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

পূর্বেই নিজের বার্ধক্য এসে যায় এবং মহিলাদের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন কারণে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সময় পার হয়ে গেলে পছন্দমত বর পাওয়া যায় না। পরিশেষে সমতার দিক রক্ষা করা যায় না এবং এটা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনেরও অসমতা সৃষ্টি করে।

১৬. **উভয়ের আত্মীয়কে মূল্যায়ন করা :** যেহেতু স্বামী-স্ত্রী মিলেই সংসার। অপর দিকে যেহেতু প্রত্যেকেরই আত্মীয়-স্বজন আছে এবং তাদেরও ন্যায্য দাবী আছে সুতরাং প্রত্যেকের ন্যায্য পাওনার দিকে ইনসাফের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা উচিত। কারও জন্য আয়োজন এমন না হয় যা অপরের তুলনায় আপত্তিকর।

১৭. **স্ত্রীর গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ :** রাসূল (সাঃ) হেরা গুহা থেকে প্রথম ওহী প্রাপ্ত হয়ে কম্পমান অবস্থায় স্ত্রী খাদীজা (রা)-এর কাছে আসলে তিনি মহানবী (সাঃ)-কে অভয় দিলেন এবং নিজ চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফলের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সুন্দর দিক নির্দেশনা পেলেন, সাহস পেলেন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে সুন্দর পরামর্শ দিয়ে এগিয়ে নিবেন মনে রাখতে হবে "উপস্থিত বুদ্ধি মহিলাদের বেশি থাকে"।

১৮. **দম্পতি একে অপরকে অবজ্ঞা না করা :** সত্য কৌতুক সুন্নত। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে কোনোভাবে অবজ্ঞা করা উচিত নয় বরং যেখানে যার দুর্বলতা আছে সতর্কতার সাথে তা এড়িয়ে থাকলে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশের মহিলারা একটা জায়গায় বড্ড বেশি ভুল করে। আর তাহলে স্বামীকে অনেক ক্ষেত্রে অবজ্ঞা বশত বলে "আমি বলে তোমার সংসার করলাম অন্যকেই হলে তোমার সাথে সংসার করত না। পারলে আরেকটা বিয়ে করে দেখো কে কত দিন তোমার সংসার করে। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় স্বামী জিদের বশবর্তী হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে। তখন সংসারে অশান্তি নেমে আসে। তাই এ ব্যাপারে মহিলাদের সতর্ক থাকা উচিত।

১৯. **স্ত্রীকে শূন্য হাতে রাখা :** স্ত্রীর হক তাকে না দেয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্ত্রী খালি হাতে থাকে। প্রথমতঃ তার মহরানার টাকা তার হাতে দিলে এবং তা থেকে আয়ের ব্যবস্থা থাকলে স্ত্রীর আলাদা কিছু সম্পদ জমা হত এবং তা থেকে স্ত্রী যেমন নিজের চাহিদা মত ব্যবহার করতে পারত তেমনি স্বামীও প্রয়োজনমত স্ত্রীর থেকে ধার-কর্জ নিয়ে উপকৃত হতে পারতো। বাইরে ধারের জন্য হাত পাততে হত না।

২০. **সামর্থ থাকার পরও একা হজ্জ্ব করা :** আমাদের দেশে সংসারের উপার্জন একক ব্যক্তি স্বামীর হাতে পরিচালিত হয় অথচ উপার্জনে বড় সহযোগিতা থাকে স্ত্রীর। এমতাবস্থায় আল্লাহর ফরয হজ্জ্ব আদায়ের সময়ে স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে হজ্জ্ব করা উচিত।

২১. **পরস্পর হাদিয়া দেয়া :** স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে বিভিন্ন উপলক্ষে উপহার লেন-দেন করতে পারেন। হোক তা স্বল্প মূল্যের তবুও তা পারস্পরিক আন্তরিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

২২. **বড় মাছ ও খাসির মাথা স্ত্রীগণও পেতে পারেন :** খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম খাবারের প্রতি সকলেরই কমবেশি আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মহিলাদের বঞ্চিত করতে করতে অবস্থা এমন হয়েছে যে, মেয়েরা বড় মাছ ও খাসির মাথা খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। এগুলো যেন পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। মহিলাগণ লেজ অথবা যা পরিত্যাক্ত যদি থাকে তার জন্য অপেক্ষা করবে এটা ইনসাফ নয়। অভাব অনটনের সংসারে অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রী না খেয়ে সব খাবার স্বামীর সামনে উপস্থাপন করে। অনেক অবিবেচক স্বামী-স্ত্রীর খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ খবর না নিয়ে নিজে পুরোটাই সাবাড় করে এটা কিছুতেই উচিত নয়। এতে স্ত্রী মুখে কিছু না বললেও মনে মনে কষ্ট পেয়ে থাকে। তাইএ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

২৩. **নিজে ইসলামী আন্দোলনে শরীক কিন্তু স্ত্রীর নয় :** দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সকল ফরযের বড় ফরয। (সূরা শূরা, আয়াত-১৩) এ ফরয আদায়ের আন্দোলনে যার যার অবস্থান থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং নিজে আন্দোলন নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকলেও অনেকে স্বীয় স্ত্রীকে এ কাজে ব্যাপৃত করতে চান না। বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।

২৪. **ইসলামের মৌলিক শিক্ষা চর্চা :** স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার চর্চা থাকা উচিত। এ জন্য বই পত্র অত্যন্ত সহায়ক। এ ছাড়া আলোচনার মাধ্যমে ঈমান, ইসলাম, সালাত, যাকাত, হজ্জ, সাওম, হালাল, হারাম, মাকরূহ, শিরক, বিদআত, কুসংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রত্যেকের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা উচিত। এ জন্য মাঝে মধ্যে অভিজ্ঞ আলিম নিজ ঘরে এনে তা'লীমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২৫. **সন্তানদের লুকমান (আ)-এর শিক্ষা প্রদান :** লুকমান হাকীম (আ)-এর উপদেশ সন্তানদের জন্য ফরয তাই তো আল্লাহ তা'আলা সে উপদেশ কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। সূরা লুকমান আয়াত ১৩-১৯সহ অন্যান্য শিক্ষামূলক কাহিনীগুলো সন্তানদের মাঝে গল্প আকারে বলা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় আদব-কায়দা ও দোয়া-কালাম শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে রাখা উচিত।

২৬. **টিভি কন্ট্রোল করা :** টিভিতে যদি সারা দুনিয়ার সব চ্যানেলের লাইন দেয়াও থাকে তবুও দ্বীনের কথা চিন্তা করে তার কতগুলো লাইন আপনি লাইনম্যানদের মাধ্যমে বন্ধ করে দিতে পারেন। এটা উপকারী। তবে

বাংলা পিস টিভি এবং সৌদী আরবের আল মুবাশিরা টিভি আপনি ২৪ ঘণ্টাও দেখতে পারেন যদি আপনার হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকে এছাড়াও দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভিতে অনেক শিক্ষামূলক ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

২৭. **সন্তানদের উপস্থিতিতে ঝগড়া বিবাদ না করা :** সংসারে চলতে গেলে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া বিবাদ হতে পারে কিন্তু তা সন্তানদের সামনে হওয়া আরো খারাপ, এটা পরিহার করা উচিত। ঝগড়া যদি করতেই হয় তাহলে সন্তানদের অনুপস্থিতিতে করতে হবে।

২৮. **সন্তানদের চাহিদা পূরণে অহেতুক বিলম্ব :** স্ত্রী সন্তানদের প্রয়োজনে খরচ করা সাওয়াবের কাজ। সাধ্যমত প্রত্যেকেই এ কাজে এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু কখনও দেখা যায় এ ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব যা সন্তানদের অবজ্ঞার শামিল। কখনও এ কাজ তাদের মধ্যে বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ জন্য বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার।

২৯. **বড় হলে, বুঝলে ছেলেমেয়েরা অন্যায় করবে না :** ছোট বেলায় অন্যায় কাজ করলে, আদবের খেলাপ কাজ করলে কোনো কোনো অভিভাবক বলেন, ছোট তো বুঝে না, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। আসলে সময়মত আদব-কায়দা না শিখালে বড় হলে ও ঠিক না হয়ে "আপনাকেও ঠিক করে দিতে পারে" অতএব, সাধু সাবধান!

৩০. **প্রয়োজনীয় বাজার নিয়মিত করা :** সংসারের প্রয়োজনীয় বাজার সময়মত করে দিলে রান্না-বান্নায় বিড়ম্বনা হয় না। "সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়" কথাটা জানার পরেও আমাদের অসতর্ক থাকা উচিত না।

৩১. **স্বামীকে খাবার দিতে হাড়িশুদ্ধ সামনে না দেয়া :** খাবার বিতরণের দায়িত্বে যেহেতু মহিলাগণ থাকেন সুতরাং তিনি জানেন সদস্য কত এবং কে কত পরিমাণ খেতে পারবেন। তরকারীর স্বাদ ভালো হলে কর্তা যদি হাড়িশুদ্ধ খেয়ে ফেলেন তবে পরিশেষে অন্য সদস্যকে অভুক্ত থাকতে হতে পারে। বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে।

৩২. **বোনসহ অন্য অংশীদারদের অংশ না দেয়া :** অংশীদারের প্রাপ্য অংশ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত-ফরয, এর মধ্যে কম-বেশি করা, না দেয়া, ঠকানো, বিলম্ব করা কোনোটাই পাপমুক্ত নয়; বরং অংশীদারের অংশ না দিলে তার জন্য অবধারিত 'জাহান্নাম' (সূরা নিসা-আয়াত ১৪, হাদীস তিরমিযীসহ অনেক) নির্ধারিত অংশ না নেয়াও পাপ এবং গ্রহণপূর্বক দান করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। অংশীদারদের তাদের অংশ বুঝিয়ে না দেয়া,

দাবী করে আদায় করে নিলে সম্পর্ক ছিন্ন করা উভয়টি কঠিন অপরাধ এবং জান্নাত বাতিল হয়ে জাহান্নাম অবধারিত হওয়ার অন্যতম কারণ। আমরা এ অপরাধ থেকে যেন অবশ্য বিরত থাকি।

৩৩. **মাদুমুল মিরাস :** পিতা মারা গেলে দাদার থেকে অসহায় নাতি-নাতনী (পৌত্র- পৌত্রী) দাদার আলাদা আলাদা নেক নজর পেতে পারে কিন্তু তাকে মৌলিকভাবে পিতার থেকেই মালিক হতে হবে। অথচ এ ক্ষেত্রে অনেক দাদার অবজ্ঞা যেমন দেখা যায় পক্ষান্তরে কোনো কোনো পৌত্র-পৌত্রী দাদার দয়া-দাক্ষিণ্য গ্রহণের পরে আবার ইসলাম বিরোধী কোনো আইনের বলে ২য় দফা দাদার সম্পত্তিতে ভাগ বাসায়, উভয়টিই খারাপ।

৩৪. **বাপের বাড়ি থেকে শুধু আনা :** প্রত্যেক মা-বাবাই চান তার মেয়ে সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক। সে জন্য মেয়ের সাথে তার শ্বশুর বাড়ির জন্য কমবেশি হাদিয়া দিয়ে থাকেন কিন্তু আত্মীয়তার সুবাদে ঐ দিক থেকে যদি কিছু না আসে তা হলে এটা একতরফা হয়ে যায় যা দিনে দিনে মনস্তাত্তিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করে।

৩৫. **বাপের বাড়িতে শুধু পাঠানো :** কোনো কোনো কুলবধূ আছেন এমন যারা স্বামীর বাড়ি থেকে পিপিলিকার মত এটা ওটা টানতে থাকেন। এভাবে চললে স্বামী বেচারা সংসারটা সহজে দাঁড় করাতে পারবে কেমন করে? পারস্পরিক সমঝোতা ছাড়া গোপনে এ কাজ করা মোটেও উচিত নয়। মনে রাখতে হবে সংসার স্ত্রীর কাছে আমানত। যদি তার সে ঝুড়ির তলা ছিদ্র থাকে তা কখনও ভর্তি করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সুমতি দান করুন। আমীন!

৩৬. **শালদুধ খাওয়ানো :** মানব সৃষ্টির অনেক পূর্বেই আল্লাহ তার রিযকের ব্যবস্থা করেছেন (৫০ হাজার বছর পূর্বে)। সুতরাং কাকে কখন কোথা থেকে খাদ্য দেয়া হবে তা তিনিই ভালো জানেন। এখন তো এটা প্রমাণিত সত্য যে, শাল দুধ সন্তানের জন্য ঐ সময়ে দুনিয়ার সকল খাদ্যের চেয়ে উপযুক্ত। বরং এখন চিকিৎসকদের শ্লোগান হচ্ছে "মায়ের দুধের চেয়ে উত্তম কোনো খাদ্য নেই, মায়ের দুধের সমান কোনো খাদ্য নেই, মায়ের দুধের বিকল্প নেই। অধিকন্তু বুকের দুধ সন্তানকে (২ বছর) খাওয়ালে ব্রেস্ট ক্যান্সারের আশঙ্কা থাকে না।

৩৭. **তালাক :** তালাক ইসলামের সর্বনিকৃষ্ট একটি ব্যবস্থা। কেবলমাত্র চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবেই তালাক হতে পারে। যে পদ্ধতিতে বিবাহ হয়েছিল তালাকও সে পদ্ধতিতে ধীর গতিতে হওয়া উচিত। মনোমালিন্য হওয়া মাত্রই তালাক, অপবিত্র অবস্থায় তালাক-এ গুলো মোটেই ঠিক নয়। এ

বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন ফরয। না জেনে না শুনে কথায় কথায় তালাক আবার শালিসি দরবার করে স্ত্রী ঘরে অথবা অবৈধ হিলার নামে ব্যভিচার সমাজকে একেবারে নোংরা করে দিচ্ছে। যা অন্যতম কবিরা গুনাহ।

৩৮. **পর্দা :** স্বামী-স্ত্রী (পুরুষ-মহিলা) সকলের জন্য পর্দা ফরয। বেপর্দা নারী পুরুষ জান্নাতে যাবে না। নির্দিষ্ট কিছু লোকের সাথে নামকা ওয়াস্তে পর্দা কোনো পর্দাই নয়। ফেরিওয়ালা, চুরীওয়ালা বাড়িতে এলে সকলে গোলদিয়ে তার চারপাশে বসে কেনাকাটায় কোনো অসুবিধা বোধ না করলেও ইমাম সাহেবকে দেখলেই শুধু পর্দা করা কোনো পর্দার মধ্যে পড়ে না।

৩৯. **আযান, নাম ও আকীকা :** জন্মের পরে নবজাতকের কানে আযান দেয়া সুন্নাত। কিন্তু কোথাও কোথাও দেখা যায় ছেলে হলে বাড়ির দরজায় আযান দেয়া হয় এবং মেয়ে হলে পুরুষ লোক না পেয়ে মহিলাগণই আযান দেয়। এটা দুঃখজনক। ৭ দিন বা ২১ দিনে সন্তানের সুন্দর একটি নাম রাখবে। মাথা মুণ্ডিয়ে চুলের ওজনে রূপ্য সদকা করা খুবই সওয়াবের কাজ। ছেলের জন্য ২টি ছাগল এবং মেয়ে জন্য ১টি ছাগল আকীকা দেয়া সন্তানের জীবনের সাথে জড়িত সুন্নাত। আমাদের অনেকে কুরবানীর সাথে আকীকা দিয়ে থাকে, এটা ঠিক নয়। আকীকা আলাদা দিতে হবে। সন্তানের একটি সুন্দর ও অর্থবোধক নাম রাখা চাই।

৪০. **শিরক বিদআতের ছড়াছড়ি :** সন্তানাদী না হলে অনেককে দেখা যায় নির্দিষ্ট কিছু মাজার বা দরবারে গিয়ে ঐখানে মান্নত করে গরু, খাসী, দুম্বাসহ অনেক টাকা পয়সা নষ্ট করে। যেমন– ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী যারা আছে তারা হুজুর সায়েদাবাদ, আরামবাগ, গোলাপশাহ এর মাজার ও হযরত শাহ আলীর মাজার। সিলেটবাসীর অনেকে শাহজালাল (রহ)-এর মাজারে, চট্টগ্রাম বাসীর অনেকে শাহপরান ও বায়জিদ বোস্তামী (রহ)-এর মাজারে, দক্ষিণ বাংলার অনেকে খাঁন জাহান আলীর মাজার ও পটুয়াখালীর ইয়ারুদ্দীন খলিফা এর মাজার এবং উত্তর বাংলার অনেকে শাহ মাখদুম, পাবনার এনায়েতপুরসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জানা-অজানা আরো অনেক মাজার ও দরগা আছে সেখানে গিয়ে সন্তান প্রার্থনা করে। যা সুস্পষ্ট শিরক। সন্তান দেয়া না দেয়া একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ার। যেখান থেকে শিরক ও বিদআত আমদানী করা হয়। ভালো ও নেক সন্তানের জন্য নবী-রাসূলগণ যেভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন সে রকম আমাদেরকেও তাওহীদী পন্থায় রাতের গভীরে আল্লাহর কাছে ধরনা দিতে হবে।

লেখক, গবেষক ও মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম		মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)		১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN		২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান		
৪.	কিতাবুত তাওহীদ	–মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৫.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন	–মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৬.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-২ লা-তাহযান হতাশ হবেন না	–আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৩ বুলূগুল মারাম	–হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৪০০
৮.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৪, সহীহ হাদীস প্রতিদিন বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন		
৯.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির	–মো : নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১০.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	–ইকবাল কিলানী	১৫০
১১.	সহীহ মুকসূদুল মুকমিনীন		৪০০
১২.	সহীহ নেয়ামুল কুরআন		৪০০
১৩.	সহীহ আমলে নাজাত		২২৫
১৪.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায	–মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৫.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	–মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৬.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন	–যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৭.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা	–মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
১৮.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়	– আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২২৫
১৯.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী	–মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২০.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী	–মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২১.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	–সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২২.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	–মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৩.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা	–মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৪.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে	–ইকবাল কিলানী	১৩০
২৫.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	–ইকবাল কিলানী	২২৫
২৬.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে)	–ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব)	–ইকবাল কিলানী	১৫০
২৮.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী	–সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
২৯.	দোয়া কবুলের পূর্বশত	–মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩০.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র		৩৫০
৩১.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	– ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩২.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ		১৫০
৩৩.	ফাজায়েলে আমল		
৩৪.	কবিরা গুনাহ্		
৩৫.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান		১২০

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace rafiq@yahoo.com